আমি মুসোলিনি
(মুসোলিনির আত্মজীবনী)
ভাষান্তর : পরিতোষ মজুমদার
আমি মুসোলিনি
ভাষান্তর : পরিতোষ মজুমদার

আমি মুসোলিনি

আমি মুসোলিনি

[মুসোলিনির আত্মজীবনী]

ভাষান্তর ঃ পরিতোষ মজুমদার

দে'জ পাবলিশিং ।। কলকাতা ৭০০ ০৭৩

AAMI MUSOLINI
A Biography of Musolini Translated in Bengali By Paritosh Mazumdar
Published by Sudhangshu Sekhar Dey, Dey's Publishing
13 Bankim Chatterjee Street, Calcutta 700 073
Rs. 60.00

প্রথম প্রকাশ ঃ জানুয়ারি ২০০০, মাঘ ১৪০৬

প্রচ্ছদ ঃ গৌতম রায়

দাম : ৬০ টাকা

ISBN–81-7612-500-8

প্রকাশক ঃ সুধাংশুশেখর দে। দে'জ পাবলিশিং
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট। কলকাতা ৭০০ ০৭৩
বর্ণ-সংস্থাপন ঃ বীণাপাণি প্রেস
১২/১এ বলাই সিংহ লেন। কলকাতা ৭০০ ০০৯
মুদ্রক ঃ স্বপনকুমার দে। দে'জ অফসেট
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট। কলকাতা ৭০০ ০৭৩

ইতালির জনগণকে—

।। বেনিতো ।।

লেখকের অন্যান্য বই

গল্প সংকলন ঃ

জোনাকি মন
আলোর সন্ধানে
রঙের বিবি (বাংলাদেশ)
কুতুব মিনার

উপন্যাস ঃ

কাঁচের আয়না
রাইনের ঢেউ
শেষ বিকেলের আলো
দুই দিগন্ত (বাংলাদেশ)
সুদূরের বন্দর
সাঁজে লিজের ঘর-সংসার
সান্ পাঁউলির মেয়ে
সংসার সমুদ্রে
অগ্নিলতা
জীবনের স্বাদ
সায়াহ্ন আকাশ
কনসেনট্রেসন ক্যাম্প (দে'জ)

রম্য রচনা ঃ

বিখ্যাত মানুষের প্রেম
নরক, আউসভিৎজ (দে'জ)
বার্লিন বাংকারে হিটলার
ভিনসেন্ট মাফিয়া (দে'জ)
নীল বিদ্রোহের জার্মান পুরোহিত
ফিলাডেলফিয়া রহস্য ফমিল
পিরি রিয়াজের পৃথিবী

রহস্য রচনা ঃ

ইভ আর্সেনিক ও জালিয়াতি
বিচিত্র হত্যা কাহিনী।

ভাষান্তর ঃ

মাইন ক্যাম্প (দে'জ)
পিকাসোর সঙ্গে
হিটলারের ডায়েরী (দে'জ)
ক্রিসেন্ট পাহাড়ের নরখাদক (দে'জ)
কাফুর সিংহ (দে'জ)
কার্পেটি সাহেব (দে'জ)
আফ্রিকার বনে জঙ্গলে (দে'জ)
মাগ্‌দি হিলসের কালোচিতা (দে'জ)

আমি মুসোলিনি

।। নান্দীপাঠ ।।

১৯২১ সালের মে মাস থেকে ১৯২৪ সালের ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত ইতালিতে আমেরিকার রাজদুত হয়ে কাজ করার সময় রিচার্ড ওয়াসবর্ন চাইল্ডের বেনিতো মুসোলিনির ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসার সুযোগ হয়। মুসোলিনি সম্পর্কে আগে লোক পরম্পরায় অনেক কথা শুনলেও সামনা সামনি পরিচয় এবং ঘনিষ্ঠতার সুবাদে বলা বাহুল্য রিচার্ডের মুসোলিনি সম্পর্কে ধ্যান-ধারণা একেবারেই পাল্টে যায়। তাই একদিন রিচার্ড সোজাসুজি মুসোলিনির কাছে একটা অনুরোধ নিয়ে হাজির হয়। মুখোমুখি বসে মুসোলিনিকে বলে,—আমি আপনার জীবনের ওপরে অন্যান্য লেখকের লেখা জীবনী গ্রন্থ পড়েছি। বলাবাহুল্য ভালোও লেগেছে। তবে আপনি যদি নিজে আপনার জীবনী গ্রন্থ লেখেন, সেটা যে আরো অনেক বেশি আকর্ষণীয় হবে তা'তে সন্দেহ নেই।

—আমি? আমি লিখবো আমার জীবনী? ঝুঁকে পড়া মুসোলিনি এবার সোজা হয়ে চেয়ারে বসে। তারপর বিস্ময়ভরা গলায় তিন চার বার কথাটার পুনরাবৃত্তি করে।

পৃথিবীতে সবচেয়ে ব্যস্ত মানুষ মুসোলিনি মনে হয় কথাটা শুনে একটু ক্ষুণ্ণ-ই হয়। কারণ ওর ধারণাতে বন্ধু ওর সমস্যাটাকে ঠিক বুঝে উঠতে পারছে না।

—নিশ্চয়ই। জোর গলাতে কথাটা বলে রিচার্ড হাতে ধরা কাগজগুলো বেনিতোকে দেখায়। যেখানে বেশ কয়েকটা কাগজে মুসোলিনির জীবনী লেখার ব্যর্থ প্রচেষ্টার স্বাক্ষর রয়েছে।

—ঠিক আছে। ইংরেজীতেই উত্তর দেয় বেনিতো। আমি চেষ্টা করবো।

মুসোলিনির চরিত্রের এটাও একটা আশ্চর্যজনক দিক। যে কোন বিষয়ে অতি দ্রুত মনস্থির করার অদ্ভুত ক্ষমতা ছিল ওর।

প্রথমে বেনিতো হাতে লেখার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু কাটাকাটি আর লাল দাগের ফাঁদে পড়ে লেখাটাকে অত্যন্ত ঢিমেতালে এগোতে দেখে আমি ওকে ডিক্‌টেসান দিতে বলি। কপি এলে সেটাকে লাল পেন্‌সিল আর কালির আঁচড়ে যেখানে যেখানে প্রয়োজন বদলানো চলতে থাকে।

পাণ্ডুলিপিটা যখন রিচার্ডের কাছে আসে, রিচার্ড পড়ে আরেক বিপদে। ইতালি থেকে সোজাসুজি অনুবাদ করলে মুসোলিনির যে শৌর্যবীর্য—তাই লেখাটার মধ্যে থেকে মুছে যাবে।

—কি ধরনের সম্পাদনা করবো লেখাটার? আমি জিজ্ঞাসা করি বেনিতোকে।

—আপনার যেরকম ভালো মনে হয়। আপনি ইতালিকে চেনেন, ফ্যাসিবাদ বোঝেন এবং অন্য বন্ধুদের মতো আপনিও আমার অতি নিকটজন।

বলাবাহুল্য সম্পাদনা করার প্রয়োজন পড়ে নি বললেই হয়। কাহিনী সরাসরি বই-য়ে

চলে এসেছে। মুসোলিনির কলম থেকে। আমাদের সৌভাগ্য-ই বলতে হবে। কারণ এই বই-য়ের মাধ্যমে মুসোলিনি পাঠকের চোখে ধরা পড়বে যাদের ধ্যান ধারণা এখনো ওর সম্পর্কে কুয়াসাচ্ছন্ন—তারাও স্বচ্ছ দৃষ্টিতে ওকে দেখতে আর বুঝতে পারবে। অপ্রাসঙ্গিক হলেও বলে রাখা ভালো যে বেনিতো তার এই আত্মজীবনীমূলক বই-য়ে একটা বাক্যও চিন্তা ভাবনা না করে অসংলগ্নভাবে ব্যবহার করে নি। তবে নিজের আত্মজীবনী লিখতে গিয়ে অনেক ব্যাপারই পাঠকের সামনে তুলে ধরা যায় না ; সংকোচের দরুণ এবং ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে নিজের বিশাল অবয়বটাকে মেলে ধরতেও কুণ্ঠাবোধ হয়। তাই স্বচ্ছ দৃষ্টিতে দেখার সবচেয়ে ভালো উপায় হলো তার মতাদর্শ, উত্থান-পতন ইত্যাদিকে পাশে ঠেলে দিয়ে মানুষটার চারিত্রিক মহত্ত্বের দিকেই আলোকপাত করা উচিত। মানুষটার চিন্তাধারা কতোগুলো লোকের মনে কী গভীরভাবে আলোড়ন তুলেছে, তাদের চিন্তাধারায় কী ভীষণ পরিবর্তন এনেছে, বস্তুতান্ত্রিক জীবনে কতোখানি সুখ-স্বাচ্ছন্দ এনে দিয়েছে এবং সবচেয়ে মূল্যবান হলো অবশিষ্ট পৃথিবীর সঙ্গে নিবিড় সম্পর্ক গড়ে তুলতে কতোটা সাহায্য করেছে।

আমাদের বর্তমান সময়ে মুসোলিনির মতো এতো বড় মানুষের ওপরে এতো দীর্ঘ ছায়া সম্ভবত আর কেউ ফেলতে পারে নি।

মুসোলিনি প্রশংসার যোগ্য কিনা, ওর দর্শন, কাজকর্ম, অতি মানবত্ব ইত্যাদি এইসব গুণগুলোকে অস্বীকার করলেও ওর মহৎ মানবত্বের প্রতি আকর্ষণকে সম্ভবত মেনে নেওয়া ছাড়া উপায় নেই। ওর ধ্যান-ধারণা, নেতৃত্ব, পরিকল্পনা ইত্যাদি বোতলের ওপরের ছাপের চেয়ে ভেতরের জিনিস যে অনেক খাঁটি ছিল তাতে সন্দেহ নেই। নতুন ধ্যান-ধারণার ওপরে মুসোলিনি দেশটাকে গড়ে তুলেছিল। শুধু দৈনন্দিন জীবন ধারণের পদ্ধতিটাকেই ও বদলে দেয় নি, পরিবর্তন এনে দিয়েছিল দেশবাসীর মনে, হৃদয়ে এবং চিন্তাধারাতে। শুধু দেশ শাসন নয়, নতুন একটা দেশকেই যেন মুসোলিনি ওর পরিশ্রম এবং চিন্তাধারার দৌলতে গড়ে তুলেছিল।

দেশ শাসন করা হলো এক ব্যাপার। আর পুরনো সবকিছুকে সাফ সুতরো করে নতুন ভাবে একটা রাষ্ট্রকে গঠন করা সম্পূর্ণ আলাদা ব্যাপার। যারা সেটা পারে—তারাই হলো সুপার স্টেটম্যান। আর মুসোলিনি পড়ে এই দলে।

ইতালির গণ্ডী ছাড়িয়ে বর্হিবিশ্বে মুসোলিনির নাম প্রচার হওয়ার আগেই আমি ওকে চিনতাম। জানতাম। ঘোড়ায় জিন পড়িয়ে যখন ও একা হাতে ইতালির কোণে কোণে যে প্রভূত ময়লা দিনের পর দিন জমে গিয়েছিল তা পরিষ্কার করতে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল— সেই দিনগুলোতেও ওকে আমি দেখেছি। তবে একথাও ঠিক যে মুসোলিনিকে চিনে ওঠা খুব একটা সহজ ব্যাপার ছিল না।

স্থিরতা, দৃঢ়সংকল্প, পরিবেশ এবং পরিস্থিতি অনুযায়ী ভবিষ্যত পরিকল্পনা আর সেই মতো নেতৃত্বের পরিবর্তন ঘটাবার আশ্চর্য ক্ষমতা ছিল ওর মধ্যে।

যদি কোন ঘটনার ওপরে মুসোলিনি তার পরিকল্পনা ছঁকে, সেই ঘটনার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ও ওর কার্যকলাপকেও দ্রুত বদলে ফেলে। নদীর স্রোতের ওপরে আজ যে সেতু বাঁধা হলো, কয়েকদিন পরেই হয়তো বা দেখা যাবে যে নদীর স্রোত মুখের পরিবর্তনের জন্য সেতুটাই অকেজো হয়ে পড়ে। আমরা যেখানে সেতু তৈরি করে নিজেদের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি পেতে চাই, মুসোলিনি সেইখান থেকেই তার কাজ শুরু করে; পরিবর্তনশীল এই জগতে কোন কাজের ব্যাপারে সমাপ্তি রেখা টানা নেহাৎ-ই বোকামীর পরিচায়ক। হ্যাঁ, যে বোকামী ওর পক্ষে কিছুতেই সহ্য করা সম্ভব হ'তো না।

রাজনৈতিক নেতাদের ধারণায় পৃথিবীটা নিশ্চল; কিন্তু সেই নেতৃত্ব-ই সার্থক যাদের অভিব্যক্তিতে পৃথিবীটা চলমান। মুসোলিনি সেই সতত পরিবর্তনশীল পৃথিবীর স্বপ্ন দেখতো ; সেই স্বপ্ন নিয়ে এগিয়ে যেতে গিয়ে ওকে গতকালের তত্ত্ব, পরিকল্পনা ইত্যাদি সবকিছু পরিত্যাগ করতে হ'তো। পরের দিনের প্রভাত হয়তো বা বিষণ্ণতায় ভরে উঠতো।

মুসোলিনিকে যতোটা বুঝেছি তা'তে নিঃসন্দেহে বলতে পারি যে ব্যক্তি মুসোলিনি মানবজাতিকে কোন তত্ত্বের সামনে নিশ্চলভাবে দাঁড় করিয়ে না রেখে পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে তাদের খাপ খাইয়ে নেওয়ার জন্য বেশী আগ্রহশীল ছিল। কখনো দেখেছি নিশ্চুপে এক জায়গায় স্থির হয়ে বিশ্রাম নিতে; কিন্তু ভেতরে ভেতরে ব্যক্তিত্বের খেলা চলেছে তখন। ওর চাউনি, শারীরিক অভিব্যক্তি নিরীক্ষণ করলেই ব্যাপারটা ধরা পড়ে। পুরো ব্যাপারটাই যেন নিস্তরঙ্গ জলরাশির ওপরে বাতাসের খেলা করা।

ওর চলাফেরার ভঙ্গি ছিল এমন নিঃশব্দে যেন শিকার ধরতে বেরিয়েছে অনেকটা বেড়ালের পদচারণার মতো। মুসোলিনি কিন্তু বেড়াল খুব পছন্দ করতো। ওদের স্বাধীনতা প্রিয়তা, মুহূর্তে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা, ন্যায়বিচারের পারঙ্গমতা এবং সর্বোপরি কোন সৎ মানুষকে বেছে নেওয়ার ক্ষমতা। এমন কি পোষা সিংহ সিংহীদের সঙ্গে খেলাধূলা করতেও পছন্দ করতো, যতোক্ষণ পর্যন্ত ওর নিরাপত্তারক্ষীরা তা'তে বাধা না দিতো। মুসোলিনির প্রিয় পোষ্য ছিল একটা পারসীয়ান বেড়াল। এই পারসীয়ান বেড়ালদের চরিত্রের একটা দিক হলো নির্জনপ্রিয়তা। মুসোলিনিও বালক বয়েসে বা যৌবনে প্রেমিক, শ্রমিক ও চিন্তাবিদ হিসেবে নিঃসঙ্গ ছিল।

মুসোলিনিকে নীচে না নামিয়েও বলা যায় যে ওর জীবনের কক্ষপথে কোন পুরুষ, মেয়ে বা শিশু দাঁড়িয়ে ছিল না। মনে হয় ওর জীবনের কিছুটা অংশ জুড়ে ছিল ওর কন্যা এড্ডা। সত্যি বলতে কি মেয়েদের সঙ্গে সম্পর্ক ইত্যাদি জড়ানো কাহিনীগুলো নিছকই গল্প কথা। অর্থনৈতিক দিক থেকে অনেকেই নীচু গলায় বলে থাকে যে ইতালির শিল্পপতিরা ওর উত্থানের পেছনে প্রচুর টাকা-পয়সা ঢেলেছিল। যারা ওকে কাছ থেকে চিনতো, তাদের কাছে ব্যাপারটা নেহাৎ-ই হাস্যসম্পদ। ওর মাহিনা ছিল যৎকিঞ্চিৎ। স্ত্রী এবং ছেলেমেয়েরা দারিদ্রের মধ্যেই দিন যাপন করতো।

রাজনৈতিক মতবাদের ব্যাপারেও মুসোলিনি কারো কাছে ঋণী নয়। তবে অতীতের পাপগুলোর ঋণ ও আপ্রাণ চেষ্টা করেছে শোধ করতে। যার জন্যে মুসোলিনি জনতার সামনে দাঁড়িয়ে চোয়ালবদ্ধ অবস্থায় দৃঢ়তার সঙ্গে বলেছে, —সবকিছুর জন্য আমি-ই দায়ী। আবার গোপনে নিজের বন্ধুবান্ধবদের কাছে এই কথাগুলোই উচ্চারণ করতে গিয়ে ওর মন দুঃখে ভারাক্রান্ত হয়ে উঠেছে।

শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য যে ব্যবস্থাই গ্রহণ করা হয়ে থাকুক না কেন, তার পুরোপুরি দায়িত্ব ও নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছিল। হ্যাঁ, দেশের শাসন ব্যবস্থার যে কোন ত্রুটি স্বীকার করে নিতে এতোটুকু দ্বিধা করেনি। তার জন্য যে ধরনের মোহমুক্তি-ই ঘটুক না কেন, মুসোলিনি তা অবজ্ঞার হাসি হেসেই উড়িয়ে দিতো। ফ্যাসিবাদের মাধ্যমে দেশটাকে গড়ার কাজের ব্যাপারে মুসোলিনি কিন্তু নির্দিষ্ট ছক ধরে এগোয় নি। ফ্যাসিবাদকে প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে প্রয়োজন মাফিক অদল বদলও করেছে। আসলে অন্যান্য মতাদর্শের মতো প্রথমে বোতলে মদ ভর্তি করে তারপরে লেবেল আঁটে নি।

এখানে বলে রাখা ভালো যে মুসোলিনির মধ্যে অবিশ্রাম একটা কুসংস্কারের স্রোত ভেতরে ভেতরে বয়ে চলতো। তবে ব্যক্তিগত লাভের সঙ্গে সেই বিশ্বাসের কোন সম্পর্ক ছিল না। হঠাৎ কোন আততায়ীর গুলিতে বিদ্ধ হয়ে ও মারা যাবে আর পুরো পরিবার দারিদ্রের

অন্ধকারে ডুববে। এটাই নাকি ছিল ওর ভাগ্যের লিখন। তাই সেই শেষ অধ্যায়ের আগেই নতুনভাবে দেশকে গড়ে তুলতে হবে। হ্যাঁ, এমনভাবে যাতে আত্মিক শক্তির জোরে সেই দেশের শাসনব্যবস্থা নিজের থেকেই ভবিষ্যতের দিনগুলোতে এগিয়ে যেতে পারে।

শহর রোম দখল করার ঠিক আগে মুসোলিনি আমার বাড়িতে এসেছিল। তখনই আমি ওকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম ইতালি সম্পর্কে ওর কি ভবিষ্যত পরিকল্পনা? তৎক্ষণাৎ মুসোলিনি উত্তর দিয়েছিল,—শৃঙ্খলা বজায় রেখে কাজ করে যাওয়া।

স্বীকার করতে আপত্তি নেই, কথাটা আমার কাছে ধর্ম প্রচারকের মতো শুনিয়েছিল। কারণ কোন রাজনৈতিক নেতা জাতিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে এই পথ বেছে নেবে না। বরং উইলসনের শ্লোগান —অধিকার, শান্তি এবং স্বাধীনতা—জন সাধারণের মধ্যে জনপ্রিয়তার সুযোগ অনেক সত্বর এনে দেবে। কিন্তু উদারবাদী শকুনের দল যখন মুমূর্ষু প্রায় জাতিটার ওপরে চক্র কাটছে কবে মরবে সেই আশায় যাতে সুযোগ বুঝে ঝাঁপিয়ে পড়া যায়, ঠিক সেই সময় একটা জাতিকে নিজের মতাদর্শে অর্থাৎ শৃঙ্খলতার সঙ্গে কাজ করার আহ্বান জানিয়ে পেছনে এনে দাঁড় করানো যে খুবই কষ্টকর তা'তে সন্দেহ নেই।

নেতৃত্বের মাধ্যমে জনসাধারণকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া অত্যন্ত দুরূহ কাজ। যখন বিশেষ এক স্রোত-প্রবাহে বছরের পর বছর ধরে জনসাধারণ গা ভাসিয়ে বসে আছে। বিশেষ করে সেই জাতিকে নতুন ছাঁচে ফেলে তাদের মধ্যে নবজাগরণ আনা, নবীন উৎসাহে জাগিয়ে তোলা, স্থির নিশ্চল একটা জাতিকে কর্মোদ্যোগের স্রোতে ঠেলে নিয়ে যাওয়া অত্যন্ত দুঃসাধ্য ব্যাপার। সতত পরিবর্তনশীল এই পৃথিবীর সঙ্গে যাতে জাতি নিজেদের খাপ খাইয়ে নিতে পারে— সেই প্রচেষ্টা মুসোলিনির মধ্যে বরাবর ছিল।

যাইহোক আমার জিজ্ঞাসার উত্তরে মুসোলিনি ভ্রু কুঁচকে ওপরে তুলে অদ্ভুত ভাবে ঘাড় নাড়তে নাড়তে সোজাসুজি আমার দিকে তাকিয়েছিল। এবং বলাবাহুল্য মুসোলিনি শেষ পর্যন্ত ওর কথা রাখতে পেরেছিল। পৃথিবীতে খুব কম রাজনৈতিক নেতা শৃঙ্খলার সঙ্গে কাজ করার আহ্বান জানিয়ে জাতিকে তার পেছনে এনে দাঁড় করাতে সক্ষম হয়েছে। শূন্য বোতলে যদিও এটা একটা সুন্দর বিজ্ঞাপন। ছ' বছরের মধ্যেই যে সেই বোতলটা কানায় কানায় ভর্তি হয়ে উঠেছিল তা'তে সন্দেহ নেই। নিজের মতবাদকে মুসোলিনি সত্যে পরিণত করেছিল।

অনেকে এই সত্যটাকে স্বীকার করে না নিলেও বলতে বাধ্য যে তাদের চিন্তাধারা ছিল অসত্য। নেতা ছ'রকমের হয়। অন্তর্মুখী আর বহির্মুখী ; বহির্মুখি নেতাদের আকর্ষণ শক্তিও অন্তর্মুখী নেতাদের থেকে অনেক বেশি থাকে।

রুজভেল্টের মতো মুসোলিনির মধ্যেও অবিরত ধারায় উৎসাহ উদ্দীপনার স্রোত বয়ে চলতো। বরং বলা যায় টগবগ করে ফুটতো। যা বোতল বন্দী করা সম্ভব ছিল না; কারণ বোতলবন্দী করতে গেলে বুদ্‌বুদের মতো তা উপচে পড়তো। এই সময়গুলোতে সবাই দেখেছে ওকে একাগ্রচিত্তে বেহালা বাজাতে, দুষ্টুমী ভরা হাসি ঠাট্টা করতে, হিংস্র জানোয়ারদের সঙ্গে খেলা করতে, আনন্দে মার্চপাস্টের গান গেয়ে ঘুরে বেড়াতে। হ্যাঁ, ওর বীর্যবেত্তা এবং সাহসের তুলনা ছিল না। বলাবাহুল্য এইগুলোতে প্রমাণিত হয় যে মুসোলিনি নেতৃত্বটাকে রীতিমতো উপভোগ করতো; যুদ্ধকে এক ধরনের খেলা হিসেবেই নিয়েছিল। যে খেলায় হৈ হট্টোগোলের অংশও কম ছিল না। একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে ইতালির সমৃদ্ধি শৃঙ্খলার মাধ্যমেই এসেছিল। আর এখানেই মুসোলিনি জিতে গেছে।

মুসোলিনি চরিত্রগত ভাবে স্পারটার্ন ছিল । সম্ভবত আজকের এই পৃথিবীতে

স্পারটার্নদের প্রয়োজনই সবচেয়ে বেশি হয়ে পড়েছে। বিশেষ করে যাদের স্বার্থ হলো দেশ এবং জাতিকে শক্তিশালী করা; সুখ, সমৃদ্ধি এবং শান্তির পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া।

মুসোলিনির কাছ থেকে শেষবারের মতো আধঘণ্টা নিভৃতে আলোচনার পর যখন ঘর ছেড়ে বিদায় নিচ্ছি, মুসোলিনি ধীরে ধীরে ঘরের সামনে এগিয়ে আসে। সন্ধ্যার হাল্কা অন্ধকার তখন পৃথিবীর বুকে হাত রেখেছে; ওর মুখাবয়বের সেই টানা পোড়ানির চিহ্নটাও মুছে গেছে। আমার দিকে এগিয়ে এসে দেওয়ালে কাঁধ ঘেষে দাঁড়ায়। তখন যেন ওকে আগের চেয়ে অনেক শান্ত এবং মুক্ত পুরুষ বলে মনে হয়।

আমি জানি মুসোলিনি যখন প্রথম ক্ষমতায় আসে—লর্ড কার্জন ওর সম্পর্কে অধৈর্য হয়ে বলেছিল যে লোকটা বাজে। কিন্তু সময় প্রমাণ করেছে যে মুসোলিনি হিংস্র বা বাজে কোনটাই ছিল না। বরং বিজ্ঞ এবং মনুষ্যত্বের গুণে সমৃদ্ধ ছিল লোকটার মন আর হৃদয়। হয়তো বা পৃথিবীর পক্ষে মুসোলিনির এই গুণগুলো বুঝে উঠতে অনেক সময় কেটে যাবে।

বনিয়াদ এবং চিরস্থায়ী ভাবে যে আলো এই বিশাল সংখ্যক মানুষের ওপরে পড়েছে— পছন্দ করুক বা না করুক দুচে বর্তমান সময়ের যে একজন শ্রেষ্ঠ রাষ্ট্রনায়ক তা অস্বীকার করার উপায় নেই। প্রস্থানের সঙ্গে সঙ্গে লোকে মানুষটা সম্পর্কে ভাবতে শুরু করেছে। অধিকাংশ সময়েই তাকে ছোট করে ফেলা হয়েছে। যা রুজভেল্টের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

মুসোলিনি মানুষটাই রহস্যের আবরণে মোড়া। বাস্তবের আলোতে দেখতে গেলে মনে হয় মুসোলিনি সময়ের একটু আগেই প্রস্থান করেছে ; হ্যাঁ, নিঃসঙ্গ, স্থিরপ্রতিজ্ঞ, কল্পনাপ্রবণ, ধরাছোঁয়ার বাইরে— যেখানে কারোরই প্রবেশের অধিকার নেই।

রিচার্ড ওয়াজ্‌বর্ন চাইল্ড
ইতালির আমেরিকান রাজদূত
মে ১৯২১ সাল থেকে ফেব্রুয়ারী
১৯২৪ সাল পর্যন্ত।

।। যৌবন ।।

আমার মতে এইদিনগুলো হলো আমার জীবনের প্রথম ধাপ।

যতোগুলো বই আমার ওপরে লেখা হয়েছে, তারা জন্ম পত্রিকা হিসেবে প্রথম পাতাতেই তা ছেপে দিয়েছে। বলাবাহুল্য আমার ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা লেখা থেকেই সেইসব লেখকরা এই তারিখ টারিখ সংগ্রহ করেছিল।

যাইহোক আরেকবার পুনরাবৃত্তিতে দোষ নেই। আমার জন্ম হয়েছিল ২৯ শে জুলাই, ১৮৮৩ সালে। ভারানো ডি কোস্টাতে। ভারানো ডি কোস্টা ছোট্ট হলেও খুব প্রাচীন গ্রাম। টিলার ওপরে গ্রামটা। বাড়িগুলো ছিল পাথরের তৈরি ; রোদের আলোছায়ায় বাড়িগুলোর ছাদ এবং দেওয়ালের রঙ বিবর্ণ হয়ে অদ্ভুত রঙা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। হ্যাঁ, এখনো আমার তা স্পষ্ট মনে আছে। গ্রামটার জলহাওয়া ছিল নির্মল এবং আমাদের গ্রাম থেকে ডোভিয়া গ্রামটা স্পষ্ট নজরে আসতো। আর উত্তর-পূর্ব ইতালির প্রিডাপিয়ো অঞ্চলের একটা অংশেই এই ডোভিয়া গ্রাম।

রোববারের অপরাহ্ন, বেলা দু'টোর সময় আমি জন্মগ্রহণ করি। নেহাৎ যোগাযোগ বলতে হবে যে সেই দিনটায় আমাদের গ্রামের সুপ্রাচীন গীর্জাতে উৎসব ছিল। গীর্জার ভাঙা মিনারটা এমন উদ্ধত ভাবে দাঁড়িয়ে থাকতো যে মনে হতো চারদিকে যেন নজর রাখছে। ফোর্লির সমতলে মিনারটা কিন্তু নিঃসঙ্গ ছিল। সমতলভূমিটা ধীরে ধীরে অ্যাপেননিনেস্ থেকে ঢালু

হয়ে শীতে বরফ-ঢাকা চূড়া ছুঁয়ে র‍্যাভালডিনোর পাদদেশে এসে থেমেছে। গ্রীষ্মের রাতগুলোয় যেখানে চাঁদের হলদে জ্যোৎস্নার সঙ্গে রহস্যময় কুয়াশায় মাখামাখি হয়ে থাকে।

সুপ্রাচীন জেলা প্রিডাপিয়োর পরিবেশ সম্পর্কে কিছু বলা দরকার। বলাবাহুল্য প্রিডাপিয়োর পরিবেশ আমার অত্যন্ত প্রিয় ছিল, যা আজও আমার স্মরণে আছে। তেরোশ' শতাব্দীতে ইতালির এই অঞ্চলটা কিন্তু বিখ্যাত ছিল ; রেঁনেসার সময়ে অনেক কৃতি সন্তানের জন্ম দিয়েছিল এই প্রিডাপিয়ো অঞ্চল। মাটি ছিল গন্ধক মিশ্রিত। জমির এই উর্বরতার জন্য আঙুরক্ষেতের আঙুর থেকে সুভাষিত কড়া মদ তৈরি হ'তো। প্রচুর সংখ্যায় আয়োডিন মেশানো জলের প্রস্রবণও ছিল এই অঞ্চলকে ঘিরে। এবং এই সমতলভূমির তরঙ্গায়িত পাদদেশ আর পর্বতশ্রেণীর মধ্যে মধ্যযুগের প্রায় ভেঙে পড়া দুর্গ এবং গীর্জার মিনারগুলো ধূসর হলদে দেওয়াল পেরিয়ে ফ্যাকাসে নীল আকাশগুলোকে ভেদ করতো ; হ্যাঁ, যুগ যুগান্ত ধরে।

এই মাটিতেই আমার জন্ম। প্রিয় মাটি। যে জাতির মধ্যে মানুষ জন্মগ্রহণ করে, শৈশব কাটায় সেই জাতি এবং মাটি মানুষের ওপরে প্রচণ্ড প্রভাব যে বিস্তার করে তা'তে সন্দেহ নেই।

আমার বংশ পরম্পরা অনেকেই খুঁজেছে। তবে তা খুঁজে বের করা এমন কিছু কষ্টকর নয়। কারণ আমার উত্তর পুরুষেরা ছিলেন অত্যন্ত সৎ। জমি চাষ করে তাদের জীবিকা নির্বাহ হ'তো। এবং সেই জমি অতি উর্বরা হওয়ার দরুণ তাদের জীবনযাত্রা স্বচ্ছল-ই ছিল।

আরো পিছিয়ে গেলে দেখা যাবে তেরশো শতাব্দীতে মুসোলিনি পরিবার বোলোনিয়া শহরে যথেষ্ট সুখ্যাতির সঙ্গে বসবাস করতো। ১২৭০ সালে জিয়োভানি মুসোলিনি এই যুদ্ধপ্রিয় সম্প্রদায়ের নেতা ছিল। এই সম্প্রদায় কখনো মাথা নীচু করতো না। জিয়োভানির বন্ধু ফুলসিরি পাউলুসি দ্য কালবোলি একদল সশস্ত্র নাইট নিয়ে বোলোনিয়া শাসন করতো। এই পরিবারটিও প্রিডাপিয়ো অঞ্চল থেকে গিয়েছিল। আজও কিন্তু এই অভিজাত পরিবারটির আঞ্চলিক সুখ্যাতি বর্তমান।

হ্যাঁ, বোলোনিয়ার দুভার্গ্য এবং অবিরত রাজনৈতিক দলগুলোর ক্ষমতার লোভে নিরন্তর সংঘর্ষ শেষপর্যন্ত মুসোলিনি পরিবারকে বাধ্য করে বোলোনিয়া পরিত্যাগ করে আর্জেলেটোতে চলে আসতে। সেখান থেকে সমগ্র মুসোলিনি পরিবার ভেঙে টুক্‌রো টুক্‌রো হয়ে চারপাশের প্রদেশগুলোতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে। কঠোর পরিশ্রমে তারা তাদের দুভার্গ্যকে জয় করেছিল। আমার উত্তর পুরুষদের সতেরো শতাব্দী পর্যন্ত কোন সংবাদ-ই জোগাড় করতে পারি নি। আঠারো শতাব্দীতে লন্ডনে বসবাসকারী এক মুসোলিনি পরিবারের সন্ধান পাই। ইতালিয়ানরা কঠোর পরিশ্রম করতে পেছ-পা নয় বলে বিদেশ যাত্রা করতেও দ্বিধা করতো না। লন্ডনে বসবাসকারী মুসোলিনি সংগীত সুরকার হিসেবে খ্যাতি লাভ করেছিল। আর তার রক্ত আমার শিরায়-উপশিরায় প্রবাহিত বলেই বেহালা বাদনে এতো আসক্তি। যা আজও আমাকে কর্মময় জগতে বিশ্রাম এনে দেয়। দৈনন্দিন দিনগুলোতে বাস্তব দুঃখ বেদনার ঊর্ধে উঠতে সাহায্য করে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ থেকে মুসোলিনি পরিবারের পরিচিতি আরো স্পষ্ট হয়ে ওঠে; আমার নিজের ঠাকুরদা ছিলেন ন্যাশানাল গার্ডের লেফ্‌টেনান্ট।

বাবা ছিলেন কর্মকার। বাবার পেশাল, দীঘল হাত দু'টোয় প্রচুর শক্তি ধরতো। তাই প্রতিবেশীরা তাকে অ্যালেস্ সানড্রো বলে ডাকতো। সমাজবাদী চিন্তাধারায় তার দেহ মন সবসময় টই টম্বুর থাকতো। নিজস্ব মতবাদের সঙ্গে মিশিয়ে নিয়েছিল সহানুভূতি এবং ন্যায়পরায়ণতা। প্রতিদিন সন্ধ্যেবেলায় বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে একসঙ্গে বসে প্রত্যেকটি ব্যাপার

স্যাপার সহানুভূতির আলোয় চুলচেরা বিচার বিশ্লেষণ করতো। বলাবাহুল্য এইসব আলোচনার সময় জাতির উজ্জ্বল ভবিষ্যতের কথা ভেবে ওর চোখদুটো আশার আলোয় ভরে উঠতো। আন্তর্জাতিক আন্দোলনগুলো ওকে চৌম্বুকের মতো আকর্ষণ করতো ; এবং তৎকালে সামাজিক উন্নতির জন্য সচেষ্ট নেতাদের সঙ্গে তার অন্তরঙ্গ পরিচিতিও ছিল। যেমন আন্দ্রে কোস্টা, বালডুচে, আমিলকারে, সিপ্রিয়ানি। আর গ্রাম্য জীবনের উন্নতি কল্পে উৎসর্গীকৃত জিয়োভানি পাসকলির মতবাদের প্রতি প্রচণ্ড আকর্ষণ বোধ করতো বাবা। যাইহোক সামাজিক উন্নতির জন্য আশা-আকাঙ্খা নিয়ে এইরকম অনেকেই এসেছে এবং চলে গেছে। ওদের ধারণায় প্রতিটি আলোচনার মাধ্যমে ওরা পৃথিবীর ভাগ্যের ওপরে হাত রাখতে সক্ষম হ'তো। প্রতিটি রাজনৈতিক যাদুকরকে মনে হ'তো মুক্তির শপথ দিচ্ছে ; প্রতিটি তত্ত্ব যেন জাতিকে অমর হওয়ার পথে এগিয়ে নিয়ে চলেছে।

অতীতের মুসোলিনি পরিবারের সদস্যরা কিন্তু সমাজের বুকে চিরস্থায়ী দাগ কেটে গেছে। বোলোনিয়াতে মুসোলিনি পরিবারের নামে একটা রাস্তা এখনো বর্তমান। কিছুদিন আগেও একটা মিনার আর স্কোয়ারের নামও ছিল মুসোলিনিদের নামে। অতীতের রেকর্ড বই আঁতিপাতি করে খুঁজলে পাওয়া যাবে যে ওদের নামে এক ধরনের আগ্নেয় অস্ত্রের নামকরণও করা হয়েছিল। হল্‌দে জমির ওপরে ছ'টা কালো মূর্তি মুসোলিনদের শৌর্য, বীর্য আর আভিজাত্যের প্রতীক ছিল।

আমার ছেলেবেলা আজ ধূসর অতীত। রহস্যে মাখা। মাঝে মাঝে দমকা হাওয়ার মতো দু' এক টুক্‌রো হঠাৎ হঠাৎ উড়ে আসে বসন্তের সময় সোঁদা মাটিতে প্রথম বৃষ্টির ছোঁয়া লাগা গন্ধ অথবা বারান্দায় পদচারণায় হাল্‌কা শব্দের মতো। ছোট্ট যে শিশুটা পাথরের সিঁড়ির ওপরে খেলা করতো, আজও তা' মেঘের গুরু গুরু আওয়াজের মতো মনের ভেতরে ধ্বনি তোলে। কতো বিকেল সে পাথরের সিঁড়িতে পা রেখে রেখে কাটিয়েছে।

সেই সুদূর অতীতের কথাগুলো ভাবলে মনে হয় আমার চরিত্রে এমন কোন বৈশিষ্ট্য ছিল না যা বাবা মাকে ক্ষণিকের জন্য হলেও আনন্দিত করতে পেরেছিল। ছাত্র হিসেবেও আমি ভালো ছিলাম না। ক্লাসে প্রথমও হই নি যাতে আমার পরিবার বা ক্লাসের অন্যান্য পড়ুয়ারা গর্ব করতে পারে। আমি তখনো ছিলাম অস্থিরমতি, চঞ্চল। আজও তাই রয়ে গেছি।

তখন কিন্তু আমি কিছুতেই বুঝে উঠতে পারতাম না যে কোন কাজ করার জন্য আগুপিছু এতো চিন্তা ভাবনা করার কি দরকার। অবসররত লোকগুলোর আবার অবসরের কি প্রয়োজন তা' যেমন সেদিন বুঝতে পারতাম না, তেমনি আজও বুঝি না।

আমার বিশ্বাস বর্তমানের মতো সেদিনগুলোতেও আমার দিনের পর্ব শুরু হ'তো চিন্তাধারাগুলোকে কাজের মাধ্যমে রূপ দিয়ে।

বাল্যকালের দিকে পেছন ফিরে তাকালে প্রশংসার যোগ্য তেমন কিছু দেখতে পাই না; এমন কি কোন অস্বাভাবিকত্বও নজরে আসে না। হ্যাঁ, কোনদিক থেকেই। স্মরণে আসে বাবার চুলগুলো ছিল কালো, হাসিখুশী প্রকৃতির মানুষ প্রাণ খুলে হাসতো, সুঠাম চেহারা, স্থির দৃষ্টি। মনে আছে যে বাড়িতে আমি জন্মেছিলাম—সেই বাড়ির পাথর-ঘেরা দেওয়াল গুলোর ফাটলে সবুজ শ্যাওলা ভরা ছিল। নিকটেই ছিল তির তিরে একটা শীর্ণ জলের ধারা ; কিছুটা দূরে একটা ছোট্ট নদী। সংবৎসর সেই দু'টোর একটাতেও জল থাকতো না। একমাত্র জোরদার বর্ষা নামলে তির তিরে জলের ধারাটায় এবং ছোট্ট নদীতে প্লাবন আসতো। বুকভরা স্রোত পাড় দু'টোকে ভাসিয়ে নিয়ে যেতে চাইতো। মনে আছে এই দু'টো জায়গাই ছিল আমার প্রিয়। খেলার জন্য। আমার ভাই আর্নাল্ডোর সঙ্গে খেলা করতাম। বর্তমানে যে পপোলো দ্য ইতালিয়া দৈনিক পত্রিকার প্রকাশক। চেষ্টা করতাম বাঁধ বেধে সেই দু'কূলপ্লাবী জলের

ধারাকে নিয়ন্ত্রণ করতে। পাখিরা যখন দলে দলে উড়ে এসে গাছে, পাহাড়ের পাথরগুলোর ফাটলে বাসা বাঁধতো, সেইসব পাখিদের বাচ্চা আর ডিম সংগ্রহ করার জন্য সারাটা দিন ধরে অভিযান চালাতাম। এই ভাবেই সদা পরিবর্তনশীল এই জগতে উঁকি দিতাম। বলতে আপত্তি নেই পাগলের মতো ছোটবেলার সেই দিনগুলোকে আমি ভালোবাসতাম এবং আজকের মতো সেদিনও আপ্রাণ চেষ্টা করতাম দিনগুলোকে ধরে রাখার।

সবচেয়ে প্রিয় ছিল আমার মা। শান্ত, সহানুভূতিসম্পন্না। কিন্তু মনের জোর ছিল প্রবল। নাম ছিল রোজা। মা শুধু আমাদের লালন-পালন-ই করে নি, প্রাইমারী স্কুলের পড়াশোনাও মা'র কাছেই করতাম। এমন কি আমার মানুষকে ভালোবাসার প্রথম পাঠ ধীর, স্থির, স্থৈর্যময়ী মা'র কাছ থেকেই পেয়েছিলাম। তবে ভয় পেতাম যদি কোন কারণে মা রেগে যেতো। আমার দুষ্টুমী টুস্টুমী মা'র আড়ালে রাখতে দিদিমা, এমন কি প্রতিবেশীদেরও সাহায্য নিতাম। তারা মা'র সম্পর্কে আমার ভীতিটা বুঝতে পারতো।

বর্ণমালার সঙ্গে পরিচয়-ই বস্তুতান্ত্রিক জগতে আমার প্রথম কাজ। বলতে আপত্তি নেই অত্যন্ত উৎসাহের সঙ্গেই কাজটা করেছিলাম। স্কুলে যাওয়ার তীব্র একটা বাসনা আকুতির আকার নিয়ে মনের ভেতরে জেগে উঠেছিল। কেন জানি না। যাই হোক বাড়ি থেকে মাইল দু'য়েক দূরের প্রিডাপিয়োর একটা স্কুলে ভর্তি হয়েছিলাম। বাবার বন্ধু মারানি স্কুলটা চালাতো। এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াতাম ; প্রিডাপিয়োর ছেলেরা আপ্রাণ চেষ্টা করেছিল যাতে ভিন গাঁয়ের ছেলেটা স্কুলে না যেতে পারে। পাথর ছুঁড়ে আমাকে মারতো, বলাবাহুল্য আমিও ছেড়ে কথা বলতাম না। পাথরের উত্তর পাথর দিয়েই দিতাম। একলা রাস্তায় পেলে প্রায়ই ওরা দলবেঁধে আমাকে মারধোর করতো। তবে সাহস যতোই থাক, শরীরে তো আঘাতের দাগ পড়তোই। সেই আঘাতের চিহ্নগুলো মা'র কাছ থেকে লুকিয়ে রাখতাম। কারণ তখন যে জগতকে আমি সবেমাত্র চিনতে শুরু করেছি, মা'র অনুপ্রবেশ সেই পৃথিবীতে কখনো ঘটে নি। এমন কি সন্ধ্যের পর হাত বাড়িয়ে মা'র কাছ থেকে রুটি নিতে দ্বিধা করতাম, যাতে তার নজরে আমার মণিবন্ধের ওপরের ক্ষতটা না পড়ে।

অল্প কিছুদিনের মধ্যে ঝগড়াঝাঁটির পর্ব চুকে যায় ; যুদ্ধ শেষ। আমার বয়সী ছেলেদের সঙ্গে সহজেই মিশে যাই। পুরনো দিনের স্মৃতিগুলোকে কিছুতেই ভুলতে পারি না। শক্ত ভিতের ওপরে দাঁড়ানো সেই দিনগুলো। এটা আরো ভালোভাবে উপলব্ধী করি মাত্র কয়েক বছর আগে। যখন ভয়ংকর হিমবাহ প্রিডাপিয়োর বাসিন্দাদের জীবন সংকটময় করে তুলেছিল। এমন কি ওদের অস্তিত্ব-ই তখন বিলুপ্ত হওয়ার সম্ভাবনা। হিমবাহের দরুণ ধ্বংসাবশেষের থেকে কিছুটা দূরে নতুন প্রিডাপিয়ো নির্মাণ করি। প্রিডাপিয়ো নিয়োভা। পুরনো দিনের স্মৃতিগুলো আমাকে উন্মনা করে দেয়। মনে পড়ে ছেলেবেলায় সমতলভূমির দিকে তাকিয়ে থাকতাম। যেখানে রাবি নদী রাস্তাটাকে ভাগ করে মেনডোলার দিকে চলে গেছে। স্বপ্ন দেখতাম যে সেখানে সমৃদ্ধশালী একটা শহর ভবিষ্যত গড়ে উঠবে। আজকে প্রিডাপিয়ো নিয়োভা শহরটার নির্মাণ কাজ দ্রুত শেষ হ'তে চলেছে। সিমেন্টের দরজার ওপরে ফ্যাসিবাদের প্রতীকটা বাঁকা ভাবে খোদাই করা। আমার ইচ্ছেটাকেও পাশে খোদাই করে দিয়েছি। হ্যাঁ, পরিস্কার এবং সহজ সরল ভাষায়।

লোয়ার স্কুলে স্নাতক হওয়ার পরে আমাকে বোর্ডিং স্কুলে পাঠানো হয়। ফাহেনজ্ঞা শহরে। পনেরো শতাব্দীতে শহর ফাহেনজ্ঞা পটারী শিল্পের জন্য বিখ্যাত ছিল। সালেসিনি পাদ্রীরা স্কুলটা পরিচালনা করতো। এখানেই জীবনের বাঁধা ধরা ছকটার মুখোমুখি হই আমি। শৃঙ্খলা-বদ্ধ মানুষ তৈরির কারখানা বলা যেতে পারে স্কুলটাকে। পড়াশোনা করে আর ঘুমিয়ে বড়

হ'তে থাকি। সকালের আকাশে দিনের আলো ফোটার সঙ্গে সঙ্গে বিছানা ছেড়ে উঠে পড়তাম। আর বিছানাতে যেতাম রাত গভীর হলে, যখন বাদুড়ের দল ওড়াওড়ি শুরু করতো।

আমাদের ছোট্ট শহর থেকে শহর ফাহেনঞ্জার জীবনযাত্রা ছিল সম্পূর্ণ আলাদা। আমি ভ্রমণ করতে শুরু করি। একটু একটু করে নিয়মিত ভ্রমণের পরিধি বাড়িতে থাকি। যাতে অন্যান্য জনপদ এবং গ্রামগুলোর জীবনযাত্রাও বুঝতে পারি।

ফোর্লি শহরটা মোটামুটি গোছের হলেও আমাকে দুখী করতে পারে নি। কিন্তু রাভেনা! আমার মা'র কয়েকজন আত্মীয় রাভেনার সমতলভূমিতে বসবাস করতো। এবং এক গ্রীষ্মে আমরা পরিবারের সবাই রাভেনা যাত্রা করি। যদিও তেমন একটা কিছু দূরে ছিল না, কিন্তু আমার সেই কিশোর মনে ব্যাপারটা এমন আলোড়ন তুলেছিল যেন মার্কোপোলো পাহাড় পর্বত ডিঙিয়ে আড্রিয়াটিক সমুদ্রের ধার ঘেঁষে এগিয়ে চলেছে। অজানার উদ্দেশ্য।

মা'র সঙ্গে রাভেনাতে বেড়াতে গিয়ে শহরটার আনাচে কানাচে ঘুরে বেড়াই। শহরটার সব জায়গায় যেন প্রাচীনত্বের গন্ধ মাখা। রাভেনার শিল্প সুষমা আমাকে রীতিমতো শিল্পীপ্রেমী করে তোলে। পুরনো শতাব্দী বেয়ে আসা রাভেনার মুগ্ধ করা ইতিহাস আমাকে আজও আনমনা করে দেয়। জীবন সম্পর্কে, সৌন্দর্য এবং সভ্যতার পুন জাগরণের ব্যাপারে আমি প্রথম পাঠ রাভেনাতেই নিয়েছিলাম।

দুপুরবেলার নির্জন প্রহরগুলোতে দান্তের সমাধি ভূমি আমাকে যেমন উৎসাহ দিতো, তেমনি ব্যাসেলিকা অফ সেন্ট আপোলিনীয়ারে, ক্যানডিয়ানো ক্যানেলের মুখে দাঁড়ানো সূচালো মাস্তুলের মেছো ডিঙিগুলো আর অড্রিয়াটিক সমুদ্রের সৌন্দর্য আমাকে কম মুগ্ধ করে নি। হৃদয়ের নরম স্থলটাকে স্পর্শ করেছিল।

নতুনত্বের অমর স্পর্শ নিয়ে আমি ফিরে আসি। দেহমন তখন যেন নতুন করে জেগে উঠেছে। বলাবাহুল্য আমার আত্মীয়রা আমাকে যে উপহার দিয়েছিল সেটাও সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিলাম। উপহারটা ছিল সজোরে উড়তে সক্ষম একটা বুনো হাঁস। আমি এবং আমার ভাই আর্নাল্ডো বাড়ির সামনের ছোট্ট নদীটায় হাঁসটাকে বেঁধে রেখে আপ্রাণ চেষ্টা করেছি পোষ মানাতে।

বাবা আমার বেড়ে ওঠার ব্যাপারে যে যথেষ্ট যত্ন নিয়েছিল তা'তে সন্দেহ নেই। বলতে আপত্তি নেই বাবার দিক থেকে যতোটা ভেবেছিলাম, তার চেয়ে বাবা আমার প্রতি অনেক বেশি যত্ন নিতো। দেহ এবং মনের দিক থেকে বেড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে বাবার সঙ্গে বন্ধনটাও যেন অনেক দৃঢ় হয়ে দাঁড়ায়। বিশেষ করে ষ্টীম থ্রেসিং মেসিনটা যা সবেমাত্র আমাদের কৃষিকাজের সাহায্যের জন্য কেনা হয়েছে, সেই যন্ত্রটার প্রতি তীব্র আকর্ষণ বোধ করি। বাবার সঙ্গে চাষবাস করতে গিয়ে চাষের যন্ত্রপাতি সম্পর্কে আরো বেশি আগ্রহী হয়ে পড়ি। আসলে তখন থেকেই সৃষ্টির উন্মাদনা আমাকে পেয়ে বসে। যন্ত্রের নেশা যেন আমার রক্তে রক্তে নেশা ধরিয়ে দেয়। বুঝতে পারি একজন ইঞ্জিনীয়ার জাহাজের যন্ত্রপাতিগুলোর প্রতি কী ভীষণ মমতা পোষণ করে। কখনো রেগে যায়, কখনো বা বন্ধুত্বের মায়ায় মেসিনগুলোর গায়ে হাত বুলোয়।

বাবার কামারশালায় কর্মরত শ্রমিকদের স্বার্থের সঙ্গে আমাদের স্বার্থেও এক সূতোয় বাঁধা ছিল। তবে প্রতিবেশীদের আলোচিত রাজনৈতিক এবং সামাজিক প্রশ্নগুলোর অর্থ বেশির ভাগ সময়েই আমার কাছে পরিষ্কার হ'তো না। বরং সেগুলোকে আমার বোকামীতে ভর্তি নিরর্থক কচকচানি বলেই মনে হ'তো। সেই কিশোর বয়েসে টেবিল ঘিরে জমে ওঠা বিস্তারিত তর্কগুলোর ব্যাখ্যা বা পুলিশদের কার্যকলাপও ঠিক বুঝে উঠতে পারতাম না। তবে বর্তমানে

মনে হয় সমাজের ধনী লোকগুলোকে কেন্দ্র করেই সবকিছু ঘটে চলতো ; যারা তাদের চেয়ে দুর্বল লোকগুলোকেও সেই ছকে ফেলে দমন পীড়ন এবং শোষণ করতো। ধীরে ধীরে আমার ভেতরের আত্মশক্তি জেগে ওঠে এবং মনও নতুন রাজনৈতিক ধ্যান-ধারণার দিকে এগিয়ে চলে।

আমাকে ঘেরা ছোট্ট পৃথিবীটাকে আমি নতুন চোখে দেখতে শুরু করি। প্রয়োজনের তুলনায় ওদের প্রাপ্তি সবকিছুতেই অত্যন্ত কম। নিজের ভেতরেই একটা অস্বস্তির কাঁটা সর্বদা খোঁচা দিয়ে আমার হৃদয়টাকে রক্তাক্ত করে তোলে। সাধারণ মানুষের হৃদয় তখন অসংখ্য অভিযোগে ভর্তি হয়ে গেছে। যথেচ্ছ ব্যবহারে অর্থনীতি রুগ্ন ; বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশ হওয়া দূরে থাক, রীতিমতো বন্ধ্যা অবস্থা চলেছে। সমাজের মুষ্টিমেয় কয়েকজন পুরোপুরি ভোগ করে চলেছে প্রায় সব সুবিধাগুলো। দুঃখে ভারাক্রান্ত এই বছরগুলো শুধু আমার প্রদেশকেই জড়িয়ে ধরে নি, সারা ইতালিকেই ঘিরে রেখেছিল। বাবার কাছে এসে যারা সেদিনকার সমাজ ব্যবস্থার প্রতিবাদ জানাতো, আমার স্মৃতি থেকে সেগুলো কিন্তু মুছে যায় নি। কিছু প্রতিবাদ এবং তিক্ত অভিজ্ঞতা আর কিছু নতুন পথের সংস্কার চিন্তা অবিরত আমার স্মৃতিকে দোলা দিয়ে গিয়েছিল।

তখন আর আমার বয়েস কতো? কৈশোরও পার হই নি। মা বাবা এবং পরিবারের বড়োরা সবাই আলোচনার মাধ্যমে ঠিক করে যে আমার ভবিষ্যত বর্তমানের পথে নয়, নতুন কোন পথ ভবিষ্যতের জন্য ঠিক করা প্রয়োজন।

আমার শারীরিক পরিশ্রমের কাজগুলো ঠিক ওদের আমার সম্পর্কে আশা-আকাঙ্খায় খাপ খাচ্ছে না। তা' ওদের সাহায্য বা আমার কর্মকুশলতা— কোনটাতেই এই কাজ ওদের না-পসন্দ। আজও আমার মনে আছে মা'র বলা সেই প্রবাদ বাক্যটা—ও কিছু করে দেখাতে চায়।

অবশ্য আমার দিক থেকে তেমন কিছু করে দেখানোর তাগিদ যে ছিল না তা' বলাবাহুল্য। পড়াশোনা করার তেমন স্পৃহা যেমন ছিল না, তেমনি সাধারণ স্কুলে শিক্ষিত হয়ে শিক্ষক হওয়ার ইচ্ছেও হয় নি। তবে আমাদের পরিবারের ধ্যান-ধারণা কিন্তু সঠিক ছিল। ছাত্র হিসেবে অন্যান্যদের থেকে কিছু বেশি ক্ষমতা ছিল আমার মধ্যে এবং দিনে দিনে সেগুলোকে আরো বিকশিত করার সুযোগও ছিল।

ফরলিমপোপোলিতে যাই মাধ্যমিক স্কুলে পড়তে ; এখনো সেই ছোট্ট শহরে উপস্থিত হওয়ার ঘটনা স্পষ্ট মনে আছে। সেই শহরের বাসিন্দারা হাসিখুশী এবং পরিশ্রমী ছিল। ব্যবসায়ী আর দালালের খামতিও ছিল না সেই শহরে। তাই যে কোন জিনিষ কিনতে গেলেই প্রচণ্ড রকমের দরাদরি করতে হ'তো। স্কুলটা চালাতো ইতালিয়ান লেখক জিয়োসু কারডুচ্চির ভাই ভেলফ্রেডো কারডুচ্চি। এই জিয়োসু কারডুচ্চি তার কবিতার জন্য বিখ্যাত ছিল। এই কবিতাগুলোর অনুপ্রেরণা পেতো জিয়োসু রোমান ক্লাসিকগুলো থেকে।

আমার সামনে তখন পড়াশোনার দীর্ঘ পথ পড়ে রয়েছে। শিক্ষক হ'তে গেলে যে ডিপ্লোমা পেতে হবে তারজন্য দীর্ঘ ছ'বছর ধরে বই, খাতা, পেনসিল এবং কালির সঙ্গে রীতিমতো ধস্তাধস্তি করতে হবে। তবে শিক্ষক হ'তে চাওয়ার সেই ছ'টা বছরের উজ্জ্বল দিকও একটা আছে বৈকি। শিক্ষা ব্যবস্থায় সংস্কার আনতেও আমার যেমন আগ্রহ ছিল, তেমনি জনতার চরিত্র বোঝাও সম্ভব হবে।

আমার ধারণায় সেই দিনগুলোতে আমি কিছুটা অবাধ্য ছিলাম। কখনো কখনো অবিবেচকের মতো কাজও করতাম। যৌবন তো চঞ্চলতা আর নির্বুদ্ধিতায় ভরা। যাইহোক সেগুলোকে আমি কিছুটা হলেও পাশ কাটিয়ে আসতে পেরেছি। আমার শিক্ষকরা

ব্যাপারগুলোকে যে বুঝতো তা'তে সন্দেহ নেই। এবং সেইজন্য তাদের সহযোগীতাও যথেষ্ট পেয়েছি। তবে এই সহযোগিতা কতোটা আমার ওপরে সেই শিক্ষকদের বিশ্বাস রাখার জন্য আর কতোটাই বা বাবার সামাজিক এবং রাজনৈতিক ক্ষমতার দরুণ সেটা বলা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

যাইহোক শেষমেষ ভাগ্যে ডিপ্লোমা জোটে। শিক্ষক হই। তবে অনেক রাজনৈতিক নেতা-ই জীবন শুরু করেছিল শিক্ষক হিসেবে। ডিপ্লোমা পেয়ে শুরু হয় চাকরীর খোঁজ, উমেদারীর চিঠি হাতে। তার ওপর ক্ষমতাশালী লোকেদের কাছ থেকে এতোটুকু দাক্ষিণ্যের জন্য তাদের পেছু পেছু ঘোরা তো ছিলই।

রেগজিয়ো ইমিলিয়া প্রদেশের জিয়ালটিয়েরী শহরের স্কুলে শিক্ষক নেওয়ার প্রতিযোগীতায় অবতীর্ণ হয়ে শেষ পর্যন্ত সফল হই। এবং বলতে আপত্তি নেই মাষ্টারীটা ভালোই লাগে। প্রায় বছরখানেক পড়ানোর পর স্কুলের ছুটির শেষের দিন একটা প্রবন্ধ ছাত্রদের জন্য মুখে মুখে বলে যাই। যাতে ওরা লিখে নিতে পারে। প্রবন্ধের বিষয় বস্তুটা এখনো স্পষ্ট মনে আছে—অধ্যবসায় দ্বারাই পথের শেষে পৌঁছনো সম্ভব। এই প্রবন্ধটার জন্য কিন্তু আমার ওপরের শিক্ষকরা যথেষ্ট প্রশংসা করেছিল।

যাইহোক স্কুল বন্ধ হয়। কিন্তু পরিবারের কাছে ফিরে যাওয়ার ইচ্ছে আমার ছিল না। আমার পৃথিবীটাও যেন তখন অনেক সংকীর্ণ হয়ে এসেছে। প্রিডাপিয়োর মতো। যেখানে দাঁড়িয়ে নড়াচড়া বা চিন্তা করা অসম্ভব। একমাত্র দড়ির শেষ প্রান্তটা ছাড়া। ততোদিনে কিন্তু আমি নিজের ভবিষ্যত সম্পর্কে ভাবতে শিখেছি। মুক্তির দিশা খুঁজে পেতে ভেতর থেকে তাগিদ অনুভব করতে শুরু করেছি।

টাকা পয়সা বলতে যা বোঝায় তা' আমার ছিল না। থাকলেও সামান্য। সাহস এবং মনের জোর-ই ছিল আমার সবচেয়ে বড় সম্পদ। তৎকালীন আমার জীবনযাত্রা নির্বাসিতের মতো কাটতো। সীমান্ত পেরিয়ে সুইজারল্যাণ্ডে ঢুকি।

সেই যাযাবর বৃত্তির দিনগুলো কঠিন, প্রস্তরময়, অস্থির চিত্ততার মধ্যে কেটেছে। তবে এই প্রতিবন্ধকতা, কষ্ট ইত্যাদি আমাকে মানসিকভাবে যে প্রাপ্তমনস্ক করে তুলেছিল তা'তে সন্দেহ নেই। মানুষ এবং রাজনীতিবিদ হিসেবে তখনই এক নতুন দিগন্তে পা রাখি। আমার ভেতরের আত্মবিশ্বাস যেন আমাকে ভবিষ্যতের পথে ঠেলে দেয়। আজ স্বীকার করতে আপত্তি নেই যে তখন থেকেই জননেতা হওয়ার চেষ্টা করেছি। নিজেকে যতোটা সম্ভব বিনয়ের চাদরে ঢেকে রেখে ভেতরের গর্বটাকে কিন্তু প্রজ্বলিত রেখে গেছি। নিজের মানসিক পরিচ্ছদে নিজেকে ঢেকে রেখেছি।

আজকে সেদিনের দুঃখ কষ্টগুলোকে ধন্যবাদ জানাই। স্কুলের প্রহরের চেয়ে দুঃখের প্রহর গুলো ছিল অনেক বেশি দীর্ঘ। তবে এখানে বলে রাখা ভালো যে সুখের প্রহরগুলো আমাকে জীবনে কিছু দেয় নি। বরং দুঃখ কষ্টের দিনগুলোই আত্মিক দিক থেকে আমাকে শক্ত করে তুলেছে। কি করে আগামী দিনগুলোয় বেঁচে থাকতে হবে সেই শিক্ষাও দিয়েছে।

সেইদিনগুলোতে যদি বিলাসপূর্ণ আমলার একটা চাকরী জুটে যেতো, তবে পেরিয়ে আসা বছরগুলোয় যে দুঃখ কষ্টের অবধি থাকতো না, তা'তে সন্দেহ নেই। এই স্বার্থান্বেষী পৃথিবীতে তা'হলে কিছুতেই নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে পারতাম না। আর বর্তমানের দিগন্তও দূরে সরে যেতো। আমার পক্ষে দীর্ঘদিনের বিরতির পর চাকরীতে প্রমোশান আর সুদীর্ঘ ক্লান্তিকর রাস্তার শেষে বৃদ্ধ বয়েসের খোরাকি অর্থাৎ পেনসন—ইত্যাদি চিন্তা ভাবনাগুলো সহ্য করে নেওয়াই অসহ্য। সেই বিলাসপূর্ণ জীবনের ফাটল দিয়ে আমার শক্তি গড়িয়ে পড়ে নিঃশেষ হয়ে যেতো। জীবনের বাধা এবং দুঃখ কষ্টগুলোই আজও আমাকে শক্তি জুগিয়ে যাচ্ছে।

সংগ্রামের মাধ্যমেই এই শক্তি আমি আহরণ করেছি ; আনন্দপূর্ণ রাস্তা দিয়ে হাঁটার দৌলতে নয়।

সুইজারল্যাণ্ডে আমার দিনগুলো চরম দুর্দশার মধ্যে দিয়ে কেটেছে। দীর্ঘদিন না হলেও অত্যন্ত কষ্টকর ছিল সেই প্রবাসের দিনগুলো। সুইজারল্যাণ্ডে আমি দক্ষ শ্রমিক হিসেবে কাজ করতাম। সাধারণত রাজমিস্ত্রীর কাজ। এবং বলতে আপত্তি নেই কনস্ট্রাকশানের কাজের ব্যাপারে যে তিক্ত অভিজ্ঞতা তখন লাভ করেছি, তা' আজও ভুলতে পারি নি। অনুবাদকের কাজও কমবেশি করতে হয়েছে। ইতালিয়ান ভাষা থেকে ফরাসীতে এবং ফরাসী থেকে ইতালিয়ান ভাষায়। বেঁচে থাকার তাড়নায় হাতের কাছে যে কাজ পেয়েছি, তা-ই করেছি। সেই দিনগুলোতে আমার যেসব বন্ধুরা আমাকে ঘিরে ছিল, তাদের আমি আনন্দ এবং সুখের সঙ্গেই সঙ্গ দিয়েছি। তদুপরি যেসব উদ্বাস্তু বা অভিবাসী সুইজারল্যাণ্ডে গিয়ে ঠাঁই নিয়েছিল, তাদের সবরকম সাহায্যের ব্যাপারে আমার হাত সর্বদা প্রসারিত ছিল।

রাজনীতি থেকে একটা পয়সাও আমি লাভ করি নি। বলাবাহুল্য পরগাছার মতো সামাজিক সংঘর্ষ থেকে যারা ফয়দা লোটে এবং রাজনীতির মাধ্যমে যারা ধনী হয় তাদের আমি সর্বান্তকরণে ঘৃণা করি।

ক্ষুধার সঙ্গে আমার পরিচয় ছিল। ক্ষুধার নগ্ন রূপের মুখোমুখি আমাকে প্রায়ই হ'তে হয়েছে। তবে সেই ভয়ংকর ক্ষুধা মেটাতেও কারোর কছে ধারকর্জের জন্য হাত পাতি নি। এমন কি বাইরের লোক দূরে থাক, রাজনৈতিক সঙ্গীদের ভেতরে দয়ার উদ্রেক করে সাহায্যের জন্য কোনদিন কিছু চাই নি। বরং নিজের প্রয়োজনটাকে একেবারে কমিয়ে এনেছিলাম। হ্যাঁ, কখনো কখনো নিতান্ত প্রয়োজনের থেকেও নীচে। অর্থাৎ বাড়ি থেকে যে ক'টা টাকা পেতাম, নিজের প্রয়োজনটাকে ঠিক তার মধ্যেই সীমাবদ্ধ রেখেছিলাম। প্রবল ভাবাবেগের জোয়ারে ভেসে আমি স্পেশ্যাল সাইন্সের বিষয়গুলো পড়তে শুরু করি।

পেরেটো তখন লাউঝেনে পলিটিক্যাল ইকোনমির ওপরে বক্তৃতা দিচ্ছে। আমি ওর প্রতিটি বক্তৃতা মনোযোগ দিয়ে শুনি। অনুধাবন করি। দৈহিক পরিশ্রমের বদলে মানসিক পরিশ্রম করা শুরু হয়। কারণ এই সেই শিক্ষক যে ভবিষ্যতের ভিত্তিমূল যে অর্থনীতি হবে— তার গোড়া ধরে টান দিয়েছে।

পেরেটোর দু'টো বক্তৃতার ফাঁকে যে সময়টুকু পেতাম, তা'তে বিভিন্ন রাজনৈতিক জমায়েতে অংশ নিতাম। বক্তৃতা দিতাম। আমার বক্তৃতার কোন কোন অংশ সুইস কর্তৃপক্ষের পছন্দ মতো না হওয়ায় আমার ওপরে বহিষ্কারের আদেশ আসে। জেনেভা এবং লাউঝেন থেকে আমাকে বার করে দেয়। ততোদিনে অবশ্য বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়াশোনা শেষ হয়ে গেছে। ১৯২২ সালে আবার যখন লাউঝেন কনফারেন্সে যোগ দিতে যাই, তখন আমি ইতালির প্রধানমন্ত্রী। পুরনো বন্ধুবান্ধব এবং অতীতের রঙীন স্মৃতি যেন আমাকে কুরে কুরে খেতে থাকে।

যাইহোক বিভিন্ন কারণে সুইজারল্যাণ্ডে থাকাটা অসম্ভব হয়ে পড়ে। আর প্রবাসী প্রতিটি ইতালিয়ানের হৃদয়ে ঘরে ফিরে আসার ইচ্ছা সবসময়েই প্রচণ্ড রকমের হয়ে থাকে। উপরন্তু প্রতিটি ইতালিয়ান যুবক সৈন্যদলে নাম লেখাতে বাধ্য। সেই বাধ্যবাধকতার জন্যও দেশে ফেরার তাগিদ ছিল। সুতরাং ইতালিতে ফিরে আসি। চারদিক থেকে স্বতস্ফূর্ত অভিনন্দন, প্রশ্ন ইত্যাদির জোয়ার বয়ে যায়। তারপরে সৈন্যদলে নাম লেখাই। ঐতিহাসিক শহর ভেরোনাতে বারসাগ্লিয়ারী রেজিমেন্ট। বারসাগ্লিয়ারী রেজিমেন্টের সৈন্যরা মাথার টুপিতে সবুজ পালক গুঁজতো। এই রেজিমেন্টটা বিখ্যাত ছিল শিকারী কুকুরের মতো শত্রুসৈন্য খুঁজে বার করার ব্যাপারে আর শৃঙ্খলা এবং আত্মবিশ্বাসের জন্য। বলাবাহুল্য সৈনিক-জীবনকে আমি অত্যন্ত ভালবাসতাম।

চরিত্রগতভাবে আমি কিন্তু আদেশ মেনে চলার স্বপক্ষে ছিলাম। যদিও অনেকের ধারণায় আমি নাকি অস্থিরমতি, আগুন-খেকো, চরমপন্থী এবং বিদ্রোহী ধরনের মানুষ ছিলাম। আমার আচার-ব্যবহারে ক্যাপ্টেন, মেজর এবং কর্ণেল কিছুটা অবাক হয়ে গিয়েছিল বৈ কি। সত্যি বলতে কি এই সময়েই আমি আমার আত্মিক শক্তি এবং চরিত্রের সরলতা প্রদর্শনের সুযোগ পাই।

ভেরোনা—যে শহরে আমার সৈন্যদল ঘাটি গেড়েছিল, আমার স্মৃতিতে একটা অতি সুন্দর ভেনিসিয়ান শহর হিসেবে জেগে থাকবে। এতো চমৎকার শহর আমার জীবনে আমি কম-ই দেখেছি, যার জন্য ভেরোনা প্রতিনিয়ত আমার স্মৃতিতে যেন হাতছানি দিয়ে চলেছে। মানুষ হিসেবে শহরের গন্ধ যেমন আমাকে মোহিত করতো, তেমনি আত্মরক্ষা বা আক্রমণের জন্য স্থানীয় মানুষগুলোর কুশলতা এবং পরিশ্রম যে আমাকে মুগ্ধ করেছিল তা'তে সন্দেহ নেই।

আমি ছিলাম সাধারণ একজন সৈনিক ; তবে আমাকে যারা আদেশ দিতো সেইসব অফিসারদের চারিত্রিক মূল্যবোধ, কর্মকুশলতা, দক্ষতা এবং ব্যক্তিত্ব ইত্যাদি পর্যবেক্ষণ করতাম। সব ইতালিয়ান সৈন্যরাই সাধারণত এটা করে থাকে। এইভাবেই আমি শিখি যে সেনাবাহিনীর উঁচু পদের অফিসারদের পক্ষে সামরিক ব্যাপারে কতো গভীর জ্ঞান, নিজের পদমর্যাদা সম্পর্কে ধ্যান-ধারণা এবং বাহিনীর প্রতি মমত্ববোধ কতোখানি প্রয়োজনীয়। শৃঙ্খলাবোধ-ই সম্ভবত সেনাবাহিনীতে প্রথম এবং শেষ কথা।

তবে একথা বলতে দ্বিধা নেই যে আমি সবদিক থেকেই চমৎকার সৈনিক ছিলাম। নন্-কমিশনড্ সৈনিক হিসেবে পড়াশোনা চালিয়ে যেতে পারতাম। কিন্তু নিয়তি আমাকে বাবার কামারশালা থেকে নিয়ে আসে শিক্ষকতায়, আবার সেখান থেকে নির্বাসনে পাঠায় সুইজারল্যাণ্ডে। নির্বাসিত জীবন থেকে ফিরে এসেছিলাম শৃঙ্খলাবদ্ধ সৈনিক জীবনে ; কিন্তু নিয়তি এখানেও বাধ সাধে। পেশাদারী সৈনিক হ'তে দেয় না। একরকম বাধ্য হয়েই আমাকে সেনাবাহিনীর কাজ থেকে ছুটির দরখাস্ত করতে হয়। আর ঠিক এই সময়েই জীবনের সবচেয়ে বড় দুঃখ পাই। মা মারা যান।

একদিন ক্যাপ্টেন আমাকে তার পাশে ডাকে। বুঝি কিছু একটা ঘটেছে। কিন্তু ব্যাপারটা যে ঠিক কি তা' বুঝতে পারি না। সে আমাকে একটা টেলিগ্রাম পড়তে বলে। বাবার কাছ থেকে আসা। মা মৃত্যুশয্যায়। আমাকে যতো সত্বর সম্ভব ফিরে যেতে বলেছেন বাবা। প্রথম ট্রেনটা ধরার জন্য তক্ষুণি ষ্টেশনের দিকে ছুটি। কিন্তু বাড়ি পৌঁছতে পৌঁছতে অনেক দেরী হয়ে যায়। মা মৃত্যু-প্রতীক্ষায়। তবে তার মাথা নাড়ার ভঙ্গীতে বুঝতে পারি যে মা'র শেষ মুহূর্ত উপস্থিত হলেও আমাকে চিনতে পেরেছে। আপ্রাণ হাসার চেষ্টা করে মা। তারপরেই মাথাটা ধীরে ধীরে নীচের দিকে নামে। মা শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

আমার সমস্ত আত্মিকশক্তি, বুদ্ধিমত্তা বা দার্শনিক উপলব্ধী, এমন কি গভীর ধর্মীয় অনুরাগ মা'কে মৃত্যুর করাল হাত থেকে বাঁচাতে পারে না। এই ঘটনার পর অনেক দিন শোকস্তব্ধ আমি দলছাড়া মেষের মতো একা একা ঘুরে বেড়িয়েছি।

আমার সবচেয়ে কাছের মানুষটাকেই ঈশ্বর ছিনিয়ে নিয়ে গেছে। বন্ধুবান্ধব, আত্মীয় স্বজনের কাছ থেকে পাওয়া সান্ত্বনা বাক্য, চিঠিপত্রগুলো ইত্যাদি কোন কিছুই সেই পাথর জমাট শোকের দরজা এতোটুকু ফাঁক করতে পারে না।,

মা আমার জন্য অনেক উদ্বেগ-ভরা বিনিদ্র রাত কাটিয়েছেন। আমার যাযাবরী জীবন এবং যুদ্ধপ্রিয়তার জন্য, সুদীর্ঘ সময় তিনি চরম উৎকণ্ঠার মধ্যে পার করেছেন। আমি যে জীবনের ওপরের ধাপে উঠবো, সেটা মা আগেই ভবিষ্যতবাণী করেছিলেন অনেক কিছু

আশা করলেও মাত্র আটচল্লিশ বছর বয়েসে মারা যাওয়াতে আমার আরোহণের কোন পর্ব-ই তিনি দেখে যেতে পারেন নি। তবে শান্ত দৃঢ় চিত্তে এই আটচল্লিশ বছরের জীবনে তিনি চরম পরিশ্রম করে গেছেন। মা বেঁচে থাকলে আমার রাজনৈতিক উত্থান দেখে নিশ্চয়ই আনন্দ পেতেন। কিন্তু তা'তো হবার নয়। তবে আমার পক্ষে এই চিন্তা করাটা অত্যন্ত আনন্দদায়ক যে তিনি ওপর থেকে নিশ্চয়ই দেখতে পাচ্ছেন এবং এই অমানুষিক পরিশ্রম—সফল জীবনে স্নেহের বারি অবিরাম বর্ষণ করে চলেছেন।

একা একা রেজিমেন্টে ফিরে এসে মিলিটারী সার্ভিসের বাকী মাসগুলো শেষ করি। তারপরেই আবার আমার জীবন অনিশ্চিতের ঘূর্ণি ঝড়ের মধ্যে পড়ে।

শিক্ষক হিসেবে আবার আমি ওপেগলিয়াতে যাই। যদিও জানতাম যে শিক্ষকতা আমার ধাতে পোযায় না। এবারে আমি একটা মাধ্যমিক স্কুলে শিক্ষকতা নিয়েছিলাম। স্কুলের পড়ানোর সময় এক ঘণ্টা ছুটি পেয়ে আমি যাই পোপোলো সংবাদপত্রের প্রধান সম্পাদক সিজারে বাটিসস্তির সঙ্গে দেখা করতে। পরবর্তীকালে যে ইতালির জাতীয় বীরদের মধ্যে অন্যতম হিসেবে পরিগণিত হয়। ট্রেনটো প্রদেশটাকে অষ্ট্রিয়ানদের হাত থেকে স্বাধীন করতে গিয়ে শত্রুপক্ষের হাতে ধরা পড়ে তাকে ফাঁসিতে ঝোলানো হয়। ওর মহৎ এবং গর্বভরা জীবনের স্মৃতি আমি কখনো বিস্মৃত হই নি। সোশ্যালিষ্ট দেশপ্রেমিক হিসেবে তার আশা-আকাঙ্খা সব সময় আমাকে হাতছানি দিয়ে গেছে।

একদিন আমি একটা পত্রিকাতে প্রবন্ধ লিখি যে ইতালি-অষ্ট্রিয়ার সীমান্ত ছোট্ট আলা শহর নয়। শহর আলাকে আমাদের দেশের এবং পুরনো অষ্ট্রিয়ার সীমান্ত বলে তৎকালে ধরা হ'তো। এই প্রবন্ধ প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ভিয়েনার রয়াল গর্ভমেন্ট আমাকে সেদেশ থেকে বহিষ্কার করে। তবে বহিষ্কারের ব্যাপারটা তখন আমার কাছে সড়গড় হয়ে গেছে। আবার আমার যাযাবর—জীবনের শুরু হয়। ফোরর্লি শহরে ফিরে আসি।

সাংবাদিকতা ছিল আমার রক্তে রক্তে। স্থানীয় সোশ্যালিষ্ট একটা সংবাদপত্রে সম্পাদক হিসেবে কাজের সুযোগ জুটে যায়। বুঝতে পারি যে ইতালিয়ান রাজনীতিতে সবচেয়ে কঠিন গেড়ো খুলবার একমাত্র উপায় হলো সন্ত্রাসবাদ।

সুতরাং জনগণের মধ্যে পাতিজান যুদ্ধ পদ্ধতি নিয়ে চিৎকার হৈ হল্লা শুরু করে দেই। কারণ প্রতিটি মানুষের চিন্তাধারায় এবং কর্মে আগুন জ্বালানোর সময় এসেছে। এই সময়েই আমি রেভ্যুলিউসান সোশ্যালিষ্ট পার্টি গঠন করার তোড়জোড় শুরু করি। মাত্র ঊনত্রিশ বছর বয়সে ১৯১২ সালে রেগজিয়ো ইমিলিয়াতে যে কংগ্রেস বসে, তা'তে যোগদান করি। এই ঘটনার দু' বছর পরে প্রথম মহাযুদ্ধ শুরু হয়। ইতিমধ্যে আবন্তি দৈনিক পত্রিকার বোর্ড অফ ডাইরেকটারসে কর্তৃপক্ষ আমাকে নির্বাচিত করে। মিলান থেকে প্রকাশিত ইতালির একমাত্র সমাজতন্ত্রবাদী দৈনিক ছিল এই আবন্তি।

নতুন অফিসে যোগদানের ঠিক আগে বাবা মারা যান। বয়েস তেমন কিছু বেশী হয়েছিল না। মাত্র সাতান্ন। তার মধ্যে চল্লিশটা বছর রাজনীতি করে কাটিয়েছেন। বাবার মনটা ছিল আয়তাকার। তেজস্বী। কিন্তু হৃদয় ছিল উদারতায় পরিপূর্ণ। প্রথম আন্তর্জাতিক বিদ্রোহী এবং দার্শনিকদের বাবা চোখের ওপরেই দেখেছিলেন। কারণ তার চিন্তাধারার জন্য তাকে জেল পর্যন্ত খাটতে হয়েছে।

রোমাজনা—ইতালির যে অংশ থেকে আমরা এসেছি, বংশ পরম্পরায় তারা বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা সংগ্রাম করে এসেছে। সেই প্রদেশের লোকেরা কিন্তু আমার বাবার এই সংগ্রামময় জীবনের খবর জানতো। বছরের পর বছর এই রাজনীতিতে জড়িয়ে থাকার দরুণ তাকে সংগ্রাম করতে হয়েছে। আর এই রাজনৈতিক সংগ্রামে জড়িত বন্ধুবান্ধবদের

ক্ষমতার বাইরে সাহায্য করতে গিয়ে ছোট্ট পরিবারটা অর্থনৈতিকতা ক্ষমতাও হারিয়ে ফেলেছে।

যারা বাবার সংস্পর্শে আসতো, বাধ্য হ'তো তাকে সম্মান করতে। এমন কি সেদিনের সর্বোচ্চ রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বও বাবাকে পছন্দ এবং সম্মান করতো। যদিও বাবা অতি দারিদ্রতার মধ্যেই মারা গেছেন। কিন্তু তার ইচ্ছে ছিল যে ছেলেকে জনসাধারণ যেন রাজনৈতিক দিক থেকে সঠিকভাবে পরিমাপ করে।

জীবনের শেষপ্রান্তে এসে বাবা বুঝেছিলেন যে পুরনো বংশ পরম্পরায় সঞ্চিত শক্তি দিয়ে ধনতন্ত্রবাদ উৎখাত করা সম্ভব নয়। এমন কি রাজনৈতিক কোন বিদ্রোহও এই ক্ষমতা রাখে না। তাই শেষের দিকে বাবা মানুষের ভেতরের আত্মিক শক্তিকে জাগানোর চেষ্টা করেছেন। মানবত্ব এবং মানুষের প্রতি অনুভূতিকে জাগাতে চেয়ে কাজ করে গেছেন। তার মৃত্যুর পরে এই বিষয়ে অনেক প্রবন্ধ দেখেছি, বক্তৃতাও শুনেছি। প্রায় হাজার তিনেক পুরুষ এবং মহিলা তার শবযাত্রায় সঙ্গী হয়েছিল। কবর দেওয়ার উদ্দেশ্যে।

যাইহোক বাবার মৃত্যুর পরে আমাদের পরিবার ভেঙে টুক্‌রো টুক্‌রো হয়ে যায়।

আবন্তি দৈনিক পত্রিকার পরিচালনার ভার নেওয়ার পরে আমি মিলানে স্থির হয়ে বসে বৃহত্তর রাজনীতির জগতে ঝাঁপিয়ে পড়ি। সহোদর ভাই আরনালডো তখন টেকনিক্যাল বিষয় নিয়ে পড়াশোনায় ব্যস্ত। বোন এডভিজে চমৎকার একটা ছেলেকে বিয়ে করে তখন রোমাজনা প্রদেশের ছোট্ট একটা অঞ্চল প্রিমিলকিওরে সুখে বসবাস করছে। মোদ্দা কথা পরিবারের ছিঁড়ে যাওয়া সূতোর টুক্‌রোগুলো যে যার হাতে নিয়ে নেয়। ভাই বোন আলাদা আলাদা হয়ে গেলেও পরস্পরের সঙ্গে যোগসূত্রটা কিন্তু হারায় নি। আমরা আর একত্র হই নি। তবে ১৯১৪ সালের আগস্ট মাসে ভাইবোন সবাই একজায়গায় রাজনীতি এবং যুদ্ধ সম্পর্কে আলোচনায় বসি। যুদ্ধ তখন আর ঘাড়ের ওপরে নিঃশ্বাস ফেলছে না। উঠানের মাঝখানে এসে দাঁড়িয়েছে। যুদ্ধ—ভয়ংকর এবং মোহময়ী।

এতোদিন পর্যন্ত আবন্তি পত্রিকাটাকে দাঁড় করানোর জন্য আপ্রাণ পরিশ্রম করেছি। প্রচার সংখ্যা যাতে বাড়ে, পাঠক-পাঠিকাদের কাছে পত্রিকাটা যাতে সমাদৃত হয় এবং সমাজে সম্মানের সঙ্গে সঙ্গে জনপ্রিয়তাও পায়---তার জন্য সব রকম চেষ্টা তখন করে চলেছি। কয়েক মাস পরে আবন্তির প্রচার সংখ্যা এক লাখ ছাড়িয়ে যায়।

পার্টির মধ্যে তখন কিন্তু আমার বেশ ভালো জায়গা হয়ে গেছে। তবে এটুকু বলতে পারি যে এক ইঞ্চি প্রতিষ্ঠাও আমি জনসাধারণের কাছে ফাঁকা রাজনৈতিক বক্তৃতার মাধ্যমে অর্জন করি নি। আমি যেমন রাজনীতির ক্ষেত্রে এই প্রতিষ্ঠা অর্জন করতে গিয়ে কাউকে তোয়াজ করি নি, তেমনি নরম কথার প্রলোভনেও কাউকে ধরার জন্য ফাঁদ পাতি নি। আমি শুধু জেতার পেছনের কারণগুলো বলে গেছি। নিজেকে উৎসর্গ করা, ঘাম এবং রক্ত ঝরানো।

পরিবারের সঙ্গে আমি সাধারণ জীবন-ই যাপন করতাম। স্ত্রী রাচেলে ছিল চমৎকার মহিলা। বুদ্ধিমতী। আমরা জীবনের উত্থান পতনকে ও ধৈর্যের সঙ্গেই মেনে নিয়েছে। নিয়তি বলে। মেয়ে এড্ডা তো বাড়িটাকে মাতিয়ে রাখতো। চাওয়ার মতো কিছু আমাদের সংসারে ছিল না। যদিও নিজেকে সেই দিনগুলোর তীব্র সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে নিয়ে যেতে হয়েছে, তবে পারিবারিক জীবন ছিল নিরাপত্তা এবং শান্তির মরুদ্যান। বলাবাহুল্য সেই দিনগুলোয় এর প্রয়োজনীয়তা ছিল ভীষণ রকমের।

মহাযুদ্ধের আগের বছরগুলো ছিল রাজনৈতিক টানাপোড়ানির। ইতালির জীবনধারাও খুব সহজ গতিতে প্রবাহিত হচ্ছিলো না। জনসাধারণের কষ্টের সীমা পরিসীমা ছিল না। ত্রিপোলিটানিয়া বিজয় এতো মানুষের জীবন এবং অর্থের বিনিময়ে সম্ভব হয়েছিল যে

ব্যাপারটা আমরা চিন্তার মধ্যেও আগে আনতে পারি নি। রাজনৈতিক বোঝাপড়ার ঘাটতির জন্য প্রতি সপ্তাহে দাঙ্গা লেগে থাকতো। আমার স্পষ্ট মনে আছে জিয়োলিটির মন্ত্রীত্বের সময় তেত্রিশবার দাঙ্গা হয়েছিল। অসংখ্য মানুষ মারা গিয়েছিল ; তার চেয়েও অনেক বেশি মারাত্মক ভাবে আহত হয়েছিল। চরম তিক্ততা সমস্ত পরিবেশটাকেই ঘুলিয়ে তুলেছিল। শ্রমিক এবং পো উপত্যকার চাষীদের মধ্যে দাঙ্গা-হাঙ্গামা এবং রাজনৈতিক আন্দোলন লেগেই থাকতো। এমন কি আমাদের এই দ্বীপপুঞ্জে সাম্প্রদায়িক বিচ্ছিন্নতাবাদও প্রচণ্ডভাবে মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছিল। সাধারণ জীবনযাত্রা যেমন একদিকে অপুষ্টিজনিত রোগে ভুগছিল, অপরদিকে তেমনি রাজনৈতিক দলগুলো ক্ষমতার লোভে খেয়োখেয়ি প্রতিদ্বন্দ্বীতায় মেতে উঠেছিল।

তখন যে ধারণা ছিল, আজও আমার তাই আছে যে সাধারণ মানুষের জীবন উৎসর্গের মাধ্যমেই ইতালিয়ান জাতি তাদের অধিকার যেমন ফিরে পেতো, তেমনি কর্তব্য কর্মগুলোও করতে পারতো।

বিদ্রোহের চেষ্টা, যাকে 'লাল সপ্তাহ' বলে আখ্যা দেওয়া হয়েছিল, তা'তে বিদ্রোহের চেয়ে হৈ-হট্টগোল-ই বেশি ছিল। জনতার সেই অসন্তোষকে যথাযথ বিদ্রোহের রূপ দেওয়ার জন্য যে নেতৃত্বের প্রয়োজন, সেইরকম নেতাও ছিল না। মধ্যবিত্ত এবং বুর্জোয়া শ্রেণী আমাদের নিস্প্রভ আন্দোলনের ছবি-ই তুলে ধরেছিল।

জুন মাসে প্রতিটি ঘটনাকে নিয়ে আমরা তখন চুলচেরা বিচার করে চলেছি। সারাইবোর হত্যার ঘটনাটা যেন হঠাৎ বিনামেঘে বজ্রপাতের মতো পৃথিবীতে নেমে আসে। জুলাই মাসে যুদ্ধ শুরু হয়।

ততোদিন পর্যন্ত আমার উন্নতির পথটা বিভিন্নমুখী ছিল ; যার জন্য বেড়ে ওঠার ক্ষমতাও ছিল সীমাবদ্ধ। পেছন ফিরে তাকালে প্রত্যেকেই বুঝতে পারবে যে কিছু ঘটনাক্রমই মানুষকে ক্ষমতাশালী করে তোলে।

সাধারণ ধারণা হলো ভালো বা খারাপ বন্ধুরা মানুষের ব্যক্তিত্বের বিকাশের ধারা বদলে দিতে পারে। তবে ব্যক্তিত্বের দিক থেকে যারা দুর্বল, তাদের ক্ষেত্রে এটা সত্যি হলেও হ'তে পারে। কারণ সেইসব ক্ষেত্রে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ষ্টিয়ারিং অন্যের হাতে থাকে। আমার জীবনে আমি আমার স্কুলের বন্ধু, যুদ্ধক্ষেত্র বা রাজনৈতিক সহকর্মী কাউকেই বিশ্বাস করি নি। যার জন্য তাদের মতামত আমার ওপরে বিন্দুমাত্র প্রভাব বিস্তার করতে পারে নি। আমি ওদের কথাবার্তা, প্রস্তাব কিংবা উপদেশ শুনলেও আমার মনের ভেতর থেকে যে ইচ্ছা বা তাগিদা এসেছে, তার বাইরে কোন কাজ করি নি।

আমার মনের ওপরেও কোন বই প্রভাব ফেলে নি। অন্য মানুষের জীবন থেকে, চরিত্র থেকে আহরিত জ্ঞান বইয়ের মাধ্যমে কেন প্রভাব ফেলবে। কারণ একটা বিশাল বই যা আমি সর্বদা চলার পথের দিশা খুঁজতে ব্যবহার করেছি, তা' আমার জীবন। সেই জীবনকেই সবচেয়ে বড় শিক্ষক বলে মেনে নিয়েছি। অর্থাৎ এটা সেই জীবন—যা আমি পেরিয়ে এসেছি। দৈনন্দিন অভিজ্ঞতাই আমার জীবনের সবচেয়ে বড় শিক্ষক। রূঢ় বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতা আমার জীবনের সবচেয়ে বড় শিক্ষক। রূঢ় বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতা লাইব্রেরীর সমস্ত বইয়ের সম্মিলিত দর্শন বা তত্ত্বের চেয়ে মানুষকে অনেক বেশি শিক্ষা দেয়। সাধারণ বা অসাধারণ কোন ঘটনার ক্ষেত্র বিশ্লেষণেই আমি চোখ বুঁজে অপরের কথা মেনে নেই নি। আমাদের দেশের অতীত এবং বর্তমানের ইতিহাসের মধ্যে আমি চেষ্টা করেছি সেই সমস্যার সমাধান খুঁজে বার করার। দেশের মানুষের জীবনধারা এবং চরিত্র বিশ্লেষণের ব্যাপারে

ইতিহাসের গভীরে ডুব দিয়েছি। যাতে আমাদের ক্ষমতার সঙ্গে অন্যদের তুলনামূলক বিচার বিবেচনা করতে পারি।

জনতার কাছে পৌঁছনোর প্রচেষ্টাই ছিল আমার জীবনের চরম লক্ষ্য। আমি যখন জনতার সামনে জীবন সম্পর্কে আমার বক্তব্য রেখেছি, তখন কিন্তু আমার বা আমার পরিবারের অথবা বন্ধুদের জীবনধারা সম্পর্কে কোন বক্তব্যকে তুলে ধরি নি। সামগ্রিক ভাবে ইতালিয়ান জীবন ধারাকেই বক্তব্যে ঠাঁই দিয়েছি।

বন্ধুত্বের ব্যাপারে আমি চাই না কেউ আমাকে ভুল বুঝুক। কারণ বন্ধুত্বকে আমি যথেষ্ট মূল্য দিয়ে থাকি। তবে রাজনীতিতে সেই ভাবালুতাকে প্রশ্রয় দিতে রাজী নেই। সাধারণ মানুষের থেকে আমি অনেক বেশি স্মরণে রেখেছি আমার স্কুলের বন্ধুদের। তাদের ভবিষ্যত কর্মধারাকেও নজরে রাখতে কার্পণ্য করি নি। যুদ্ধের সময়ের সহকর্মীদের যেমন ভুলি নি, তেমনি মনে রেখেছি আমার শিক্ষক, ওপরের এবং অধঃস্তন কর্মীদেরও। আর এই ব্যাপারে আমাকে আদেশ দেওয়ার ক্ষমতাসম্পন্ন অফিসার অথবা জমির চাষীদের মধ্যে কোন পার্থক্য করি নি।

যুদ্ধের সময় ট্রেঞ্চে বসে একসঙ্গে যুদ্ধ করা যেমন রোমহর্ষক, তেমনি কষ্টকরও বটে। সেই প্রহরগুলো কিন্তু আমার ওপরে গভীরভাবে দাগ কেটে গেছে। সুগভীর বন্ধুত্ব কিন্তু স্কুলের বেঞ্চে বসে বা রাজনৈতিক সম্মেলনের মধ্যে গড়ে ওঠে না। একমাত্র তা গড়ে ওঠে মানুষ যখন চরম বিপদের মুখোমুখি হয় ; যুদ্ধের উদ্বিগ্নতা এবং অনিশ্চয়তাই সেই বন্ধুত্বের পরিমাপ করতে পারে। এবং মানুষের পক্ষেও বোঝা সম্ভব হয়ে ওঠে সেই বন্ধুত্বের গভীরতা বা স্থায়িত্ব।

রাজনীতির ক্ষেত্রে ইতালির দিগন্ত খুব বেশি বিস্তৃত নয়। যার জন্য পরস্পর পরস্পরকে চেনে। যারা সেই দিনগুলোতে আমার সঙ্গে দাঁড়িয়ে সামাজিক ন্যায়ের জন্য সংগ্রাম করেছিল, তাদের আমি ভুলি নি। যদি তারা তাদের ভুলগুলোকে স্বীকার করে নিয়ে আমার রাজনৈতিক বিকাশটাকে বুঝতে পারে, তবে তাদের বন্ধুত্বকে আজও আমি স্বীকার করে নেবো। বাস্তব জীবনকে ধ্রুবতারার মতো লক্ষ্য রেখে আমি প্রতিনিয়ত রাজনৈতিক জগতে এগিয়ে চলেছি এবং অবাস্তব সোস্যালিজিমের তত্ত্বগুলো থেকে যতোটা পারি দূরে সরে থেকেছি।

ফ্যাসিষ্ট বন্ধুরা সব সময় আমার স্মরণে আছে। বিশেষ করে যুবকবৃন্দ। ফ্যাসিস্মো সংস্থাটাই তরুণদের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছিল। যুবকদের আত্মিক উন্মাদনায় ভরা এই ফ্যাসিস্মো। এটা যেন নতুন বসানো ঘেরাটোপের মধ্যে একটা সুন্দর ফলের বাগান। যা আগামী বহু বছর ধরে সুস্বাদু ফল দিয়ে যাওয়ার প্রতিশ্রুতি দেয়।

ওদের প্রতি আমার দায়িত্ব দিনের পর দিন বেড়েই চলেছে ; যারা আমার সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দলটাকে গড়ে তুলেছে, স্বার্থহীন এবং বিশ্বাসী সেই সব প্রাণঢালা সৈনিকদের দল যারা নতুন ফ্যাসিস্ত ইতালি গড়ে তুলতে সাহায্য করেছে—তাদের আমি কখনো ভুলি নি। ওদের ব্যক্তিগত এবং সমষ্টিগত উন্নতির জন্য ধাপে ধাপে যা করার প্রয়োজন, সবই আমি করেছি।

অনেকেই কৌতূহল বসে জানতে চায় আমি ঠিক কি কি বিষয়ের ওপরে পড়াশোনা করেছি। তাদের আমি বলতে চাই যে বিশেষ কোন পড়াশোনার জালে আমার মনকে আমি বেঁধে রাখি নি। কারণ আমি বিশ্বাস করি না বইয়ের মাধ্যমে কোন বিশেষ জীবন দর্শনকে খুঁজে পাওয়া যায়।

আমি ইতালিয়ান নতুন এবং প্রাচীন লেখক, চিন্তাবিদ, রাজনীতিবিদ এবং শিল্পীদের লেখা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়েছি। বিশেষ করে আমাদের রেঁনেসার সবদিকগুলোই আমাকে প্রচণ্ডভাবে

আকর্ষণ করতো। ঊনবিংশ শতাব্দীর শৈল্পিক দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে আধ্যাত্মিক ধ্যান-ধারণা, ক্লাসিজিমের সঙ্গে রোমান্টিজিমের বিরোধ ইত্যাদি ব্যাপারগুলো সব সময় আমার মনটাকে টান টান করে রেখেছে। বিশেষ করে আমাদের ইতিহাসে যে সময়টাকে রিসোর গিমেন্টো বলা হয়ে থাকে— সেই সময়ের নৈতিক এবং রাজনৈতিক দিকটা অত্যন্ত মনযোগের সঙ্গেই অনুধাবন করেছি আমি।

১৮৭০ সাল থেকে আন্দোলন পর্যন্ত আমাদের যে বুদ্ধিবৃত্তির উৎকর্ষতা হয়েছে, তা' আমি খুব যত্ন সহকারেই বিশ্লেষণ করেছি। দিনের শান্ত প্রহরগুলো এই কাজেই বে-হিসেবী খরচা করে ফেলেছি।

বিদেশী লেখকদের মধ্যে জার্মান চিন্তাবিদদের লেখা পড়তে আমি বহু সময় ব্যয় করেছি; ফরাসী চিন্তানায়কদের লেখাও কম পড়ি নি। গুস্তোভ লেবনের লেখা দ্য ফিজিওলজি অফ দ্য ক্রাউড বইটা কিন্তু আমাকে প্রচণ্ডভাবে আকর্ষণ করেছিল। অ্যাংলো সাক্‌সানদের বুদ্ধিমত্তার দিকটাও আমাকে কম আকর্ষণ করে নি। বিশেষ করে ওদের জীবনের চরিত্রগত ভাবে সুসংবদ্ধ সংস্কৃতি এবং কৃষ্টির স্বাদ যে যথেষ্ট উপভোগ করেছি তা'তে সন্দেহ নেই।

কিন্তু বলে রাখা ভালো যে যেসব বই আমি অতীতে পড়েছি বা বর্তমানে পড়ছি, সেগুলো শুধু দৃষ্টির ওপরে ছবি ভাসিয়ে রাখার জন্য। কোন বই-ই আমার মনের ভেতরে দাগ কেটে বসে নি। এইগুলো শুধু বিভিন্ন জাতির মধ্যের পার্থক্যটা আমাকে দেখিয়ে দিতে সাহায্য করেছে। তবে একথা বারে বারে স্বীকার করি যে আমি একশো ভাগ ইতালিয়ান এবং ল্যাতিন লিখন ভঙ্গীর বিশুদ্ধতায় বিশ্বাস করি।

জার্মান, অ্যাংলো স্যাক্‌সান এবং স্লোভেনিয়ান আর বাকী পৃথিবীর ইতিহাস পুঙ্খনানুপুঙ্খরূপে পড়েই আমি আমার বর্তমান চিন্তাধারা বেছে নিয়েছি। তবে কোন মহাদেশের ইতিহাসকেই আমি তাচ্ছিল্যের চোখে দেখি নি।

আমেরিকান জনসাধারণ তাদের গঠন মূলক কাজের মাধ্যমে আমার হৃদয়কে স্পর্শ করতে পেরেছে। কারণ আমাকে যেমন একধারে সরকার চালাতে হয়, অপরদিকে পার্টিকেও এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার দায়িত্ব আমার ওপরেই ন্যস্ত। যারা জীবনের গঠনমূলক কাজকর্মটাকে আইন বলে মেনে নিয়েছে—তাদের প্রতি আমার অনুরাগে কোন খামতি নেই। কিন্তু যারা শুধু প্রতিভার জোরে জীবনের পথে এগিয়ে চলতে চায়, তাদের সম্পর্কে আমি নীরব থাকাটাই বাঞ্ছনীয় বলে মনে করি। যারা তাদের কাজকর্মের দ্বারা ভবিষ্যত বংশধরদের শক্ত মাটিতে পা রাখতে সাহায্য করে, তাদের স্বপক্ষে আমি চিরদিন ওকালতি করে যাবো। অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে এটাও পরিষ্কার করে বলা উচিত যে যারা অপরের পরিশ্রমের পয়সা উকুনের রক্তচোষার মতো আত্মসাৎ করে নিয়ে ধনী হয়, তাদের আমি ঘৃণা করি।

আমেরিকানদের চিন্তাধারা শুধু গঠন মূলক-ই নয়, সোজা পথেও ওরা চালনা করে ওদের চিন্তা। যার জন্য কোন আমেরিকানের সঙ্গে যখন আমি কথা বলি, সেই কথাবার্তার মধ্যে কূটনীতি মেশাই না। কারণ সোজাসুজি এবং স্পষ্ট কথাতেই ওদের সন্তুষ্ট করা যায়। বলাবাহুল্য আমেরিকান জীবন-চেতনা কাঁচের মতো স্বচ্ছ। পরিষ্কার। তাই ধূর্ততা বাদ দিয়ে সোজাসুজি আগ্রহ সৃষ্টি করে কিভাবে জেতা যায়—সেই কৌশল রপ্ত করার প্রয়োজন। যেহেতু ইউরোপ মহাদেশ থেকে প্রচুর ধন সম্পদ ইতিমধ্যেই নর্থ আমেরিকায় চলে গেছে, তাই আজ সমস্ত পৃথিবীর নজর এই মহাদেশের কাজকর্মকে ঘিরে। লোকেরা জীবনের মূল্য বোঝে, অর্থনীতিবিদরা অর্থনীতিটাকে পুরোপুরি এবং ভালোভাবে রপ্ত করেছে। পণ্ডিতরা নতুন সংস্কৃতি এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাধনায় সদাই তৎপর। বিশেষ করে ওদের সংঘবদ্ধ হওয়ার ক্ষমতা এবং শৃঙ্খলার সঙ্গে কাজ করার অভ্যাসকে তো আমি রীতিমতো প্রশংসা

করি। তবে প্রতিটি জাতির জীবনেই একটা সময় আসে। বর্তমানে আমেরিকা তার স্বর্ণ সময়ের মধ্যে রয়েছে। সুতরাং সারা পৃথিবীর স্বার্থে ওদের পড়াশোনার বিষয় এবং পদ্ধতি আর তার ফলাফল অনুধাবন করা উচিত।

আমেরিকা এতো অভিবাসীদের জায়গা দেওয়া সত্ত্বেও এখনো যৌবনের প্রতি হাতছানি দিয়ে চলেছে।

আমি যেমন ফ্যাসিষ্ট রাষ্ট্র হিসেবে ইতালির উন্নতি কামনা করি, তেমনি ওদের সমৃদ্ধিও আমার কাম্য।

যৌবনের প্রয়োজনীয়তা, উদ্দীপনা সব সময় স্মরণে রেখে এগিয়ে চলা খুব সহজ নয়।

যাইহোক কারসোর ট্রেঞ্চে যে মুহূর্ত বেঁচে থাকার জন্য যুঝতে হয়েছে—সেখানেও যুবকদের পেছনে ফেলে রেখে আমি পালিয়ে যাই নি।

।। জন-জীবনে যুদ্ধের প্রতিক্রিয়া।।

যুদ্ধ সম্পর্কে আমার কিছু অভিজ্ঞতা বলতে চাই। যাতে যুদ্ধের ব্যাপারে বেশির ভাগ মানুষের ধ্যান-ধারণাই বদলে যাবে। যুদ্ধ সম্পর্কে আমার মতামত দু' ধারায় বিভক্ত। তৎকালীন পৃথিবীর রাজনৈতিক পরিস্থিতি এবং ট্রেঞ্চের মধ্যের বিভীষিকাময় দিনগুলো, যা আমাকে ভবিষ্যতে অনেক কঠোর পরিস্থিতির মোকাবিলা করার ক্ষমতা জুগিয়েছে।

ইচ্ছের বিরুদ্ধে কিভাবে ইতালি যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েছিল অথবা বলা যেতে পারে ইতালিকে যুদ্ধে জড়ানো হয়েছিল তা' না বলে আমার এগিয়ে যাওয়া বা যুদ্ধ সম্পর্কে অনুভূতিগুলো ব্যক্ত করা সম্ভব নয়। আমার শরীর বেড়ে উঠেছে ইতালির জল হাওয়ায় আমি তার মধ্যেই বাস করেছি, বেড়ে উঠেছি। সুতরাং সেই দেশ এবং জাতিকে তো অস্বীকার করতে পারি না।

এটা ভুল ধারণা যে যুদ্ধ চুপি চুপি নতুন অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের জন্য ইতালিতে এসে হাজির হয়েছিল।

অর্থনৈতিক এবং নৈতিক শান্তির সময়ে ১৯১৪ সালে হঠাৎ যে ইউরোপে যুদ্ধ লেগেছিল, সোশ্যালিস্ট এবং ডেমোক্র্যাট্‌রা যতোই বোঝাক না কেন যে নৃশংসতার কারণেই এই যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল—তা' কিন্তু ঠিক নয়।

১৯০৫ সালে রাশিয়া যে জাপানের সঙ্গে দীর্ঘ সময়ব্যাপি ভয়াবহ যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছিল তা' কারোর ভুলে যাওয়া উচিত নয় । লিবিয়ার যুদ্ধ বাধে ১৯১১ সালে। ১৯১২ এবং ১৯১৩ সালের বলকানদের যুদ্ধ কিন্তু ইউরোপকে বুঝিয়ে দিয়েছিল যে তাদের ভাগ্যে কি আছে। এই যুদ্ধগুলোর জন্য সামগ্রিক পরিস্থিতি এমন মোড় নেয় যে লুলে বুগার্মের ঘটনাগুলো শুধু ঘটে না, আদ্রিয়ানোপোলেও দখল করে।

সত্যিকারের ব্যাপারটা হলো যুদ্ধের উন্মাদনা তখন সারা ইউরোপকেই ছেয়ে ফেলেছিল। বাতাসে নিঃশ্বাস নেওয়া যেন কষ্টকর হয়ে উঠেছিল। এতোই ভারহীন হয়ে পড়েছিল সেই বাতাস। মানবত্বের ইতিহাসের অপমানিত, লাঞ্ছিত এক পর্বে যেন আমাদের জোর করে টেনে এনে দাঁড় করানো হয়েছিল। কঠিন সেই ইতিহাসের অধ্যায় মহাযুদ্ধের রূপ ধরে তখন এসে হাজির হয়েছে। এই অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতি মহাদেশ এবং মানুষগুলোকে গর্ভে টেনে নেয়। লক্ষ লক্ষ মানুষকে বাধ্য করে পীড়াদায়ক ট্রেঞ্চে বসে প্রতি ইঞ্চি জমির জন্য রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম

করতে। হাজার হাজার মানুষ সেই সংগ্রামে আহত এবং নিহত হয়। কেউ বা জেতে আর কেউ হারে। জটিল স্বার্থ, নৈতিক—অনৈতিক, ঘৃণা, বন্ধুত্ব বা বন্ধুত্বের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা— সবই এই মহাযুদ্ধের দৌলতে আত্মপ্রকাশ করে। যা বিস্তারিতভাবে আমার এই ছোট পরিসরের আত্মজীবনীতে বলা সম্ভব নয়।

যুদ্ধ শুরু হওয়ার আগেই জার্মানী সম্ভাব্য যুদ্ধের ওপরে ষাটটা বই প্রকাশ করেছিল। অবশ্য অন্যান্য জাতিরাও এই ব্যাপারে পিছিয়ে ছিল না। একক ব্যক্তিত্ব তো এই বিশাল চিন্তার অরণ্যে নিজেকে যে হারিয়ে ফেলেছে তা'তে আর আশ্চর্যের কি আছে। পরাজিত জাতিদের মধ্যে এই চিন্তার সমুদ্র এমন ঝড় তোলে যে বুদ্ধিজীবি সম্প্রদায় তার থেকে পালিয়ে বাঁচে। আসলে বাস্তব দর্শন তো এই চিন্তার রাশি থেকেই খুঁজে বার করা উচিত ছিল।

যাইহোক উপরোক্ত ব্যাপারগুলো বিশ্লেষণ করে আমি আমার চিন্তাধারাকে বাস্তবে রূপ দিতে সচেষ্ট হই। সেই ঘটনা পরম্পরায় লাঞ্ছিত বছরগুলো ইতিহাসে যে লক্ষ্য রেখে গেছে, মানুষের ইতিহাসে তার তুলনা মেলা ভার। সেই জড়ানো ঘটনাগুলোকে আমি খুব ভালোভাবেই বুঝতে পেরেছিলাম।

অষ্ট্রিয়া—হাঙ্গেরীর সিংহাসনের উত্তরাধিকারী আর্চ ডিউক ফ্রানসিস্ ফার্দিনান্দের পত্নীসহ সার্বিয়াতে মর্মান্তিক হত্যা—সারা ইউরোপের জনসাধারণের মধ্যে আতংক জাগিয়ে তোলে। মনে রাখা প্রয়োজন এই সময় আমি আন্তর্জাতিক সোশ্যালিষ্ট একটা দৈনিক পত্রিকার সম্পাদক ছিলাম। ঘটনাটা কিন্তু ইউরোপের সমস্ত জাতির অনুভূতিপ্রবণ মানুষগুলোর হৃদয়কে আহত করেছিল। এই আগুনের স্ফুলিঙ্গ যে কারণে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। অষ্ট্রিয়া-হাঙ্গেরীর সতর্ক পুলিশি বন্দোবস্তের মধ্যেও যেভাবে আততায়ীরা আর্চ ডিউককে হত্যা করে, তা'তে সংঘবদ্ধতার নিপুণতাই প্রকাশ পায়। বুঝতে পারি পুরনো হাপ্‌সবার্গ রাজতন্ত্রের চেয়ে ইউরোপের সহানুভূতি অনেক বেশি ছিল সার্বিয়ার প্রতি। বোসনিয়া—এরযে— গোবেনিয়া অষ্ট্রিয়ার অধীনে আসার পর থেকে সেই অঞ্চলে এতোটুকু স্থিরতা ছিল না। সার্বিয়ানদের মানসিকতা অতীতেও যেমন ছিল এবং বর্তমানে যা আছে তা হলো গোপনে গুপ্ত কাজকর্মের জন্য অঞ্চলব্যাপি সুড়ঙ্গ কাটা। যা সময়ে সময়ে অষ্ট্রিয়া-হাঙ্গেরীর বিশাল সাম্রাজ্যে অশান্তি ডেকে আনতো। তবে তা' মাছির উপদ্রবের চেয়ে বেশি কিছু ছিল না।

সার্বিয়ার মর্মন্তুদ ঘটনা যে খড়ের মতোই শেষ অবলম্বন তা' কিন্তু আমার বুঝতে এতোটুকু অসুবিধা হয় নি। সবাই ততোক্ষণে বুঝে গেছে যে অষ্ট্রিয়া এবার তার কাজ শুরু করবে। হ্যাঁ, যথেষ্ট শক্ত হাতে। সমস্ত দূতাবাস এবং ইউরোপ বুঝতে পারে ব্যাপারটার গভীরতা এবং তার পরিণতি। সবাই মিলে তাই চেষ্টা করে সমস্যাটার একটা সমাধান খুঁজে বার করার। আমরা ততোদিন সেই সমাধানের আশাতেই অপেক্ষা করছিলাম।

সার্বিয়ার খুন কিন্তু ইতালিতে কিছুটা কৌতূহল ছাড়া আর কোন আলোড়ন আনতে পারে নি। এমন কি আর্চ ডিউক এবং তার স্ত্রীর মৃতদেহ যখন গালফ্ অফ ত্রিয়েস্তায় নিয়ে এসে সারাটা রাত আলোময় করে শেষ শ্রদ্ধা জানানোর জন্য রাখা হয়েছিল, অষ্ট্রিয়ার শাসিত হলেও সেই অঞ্চলের ইতালির অধিবাসীরা নাটকের শোকাবহ একটা দৃশ্যের দর্শকদের মন নিয়ে সেখানে উপস্থিত ছিল। তার বেশি নয়।

ফ্রানসিস্ ফার্দিনান্দ ইতালির শত্রু ছিল। আমার ধারণায় ফার্দিনান্দ আমাদের জাতটাকে সব সময় নিচু চোখে দেখতো। কিন্তু ইতালির লোকেরা যারা ওর পতাকার নীচে ছিল, তাদের হৃদয়ের ভাষা পড়তে ও সক্ষম হয় নি। একটা জাতি যখন জেগে ওঠে, তার শক্তি ফার্দিনান্দ কখনো পরিমাপ করে উঠতে পারে নি। সব সময় তিনটে জাতিকে একত্রিত করে নিজের

সিংহাসনের স্বপ্ন দেখেছে। আমি তো জানি বিভিন্ন জাতিকে এক পতাকার তলায় নিয়ে আসা কি ভীষণ কষ্টকর। আসলে ফ্রানসিস্ ফার্দিনান্দ ইতালি জাতিকে ঘৃণা করতেই আনন্দ পেতো। ইতালির ব্যাপার স্যাপারে যতোটুকু আগ্রহ ফার্দিনান্দ দেখাতো, তা' হলো পোপের পার্থিব ক্ষমতার ব্যাপারে একটা সমঝোতায় আসা। পরম্পরায় শোনা যায় যে ফার্দিনান্দ তার পারিষদবর্গের সঙ্গে গোপনে পরামর্শ করতো যাতে রোমে একটা পোপ সংশ্লিষ্ট শহর গড়ে তোলা যায়, যার বর্হিগমনের পথ থাকবে সমুদ্রে।

আমার মতো ক্যাথলিক ধর্মে গভীর বিশ্বাস রাখলেও ধর্মটাকে ফার্দিনান্দ নিরঙ্কুশ শাসন কাজ চালিয়ে যাওয়ার জন্যই ব্যবহার করতো আত্মিক জাগরণের জন্য ধর্মকে কখনো ব্যবহার করে নি।

চেহারার দিক থেকে বেঁটে খাটো, খেঁকিয়ে কথা বলায় অভ্যস্ত আর্চ ডিউক ভাবতো যে ঈশ্বর ওকে পৃথিবীতে পাঠিয়েছে প্রজাদের শাসন করার জন্য। ওর রাজত্বের চারদিকে যে সব ছোট ছোট রাজ্য ছিল, তাদের সব সময় ভয় দেখাতো। ওর মৃত্যু কিছুটা বিস্ময়কর ব্যাপার হলেও আমাদের কিন্তু দুঃখিত করে নি। তার কারণ হলো গ্র্যাণ্ড ডাচেসের মর্মান্তিক সমাপ্তি। আসলে ইতালিয়ানরা জাতি হিসেবে অনেক বেশি ভাবপ্রবণ এবং সহানুভূতিসম্পন্ন।

প্রিয়জনবিয়োগে কাতর ফার্দিনান্দের সন্তানদের কাছে পাঠানো কাইজারের টেলিগ্রামের ভাষায় নাটকীয়তা ছাড়া আমার ধ্যান-ধারণার সঙ্গে যথেষ্ট মিল ছিল। বুঝতে পারি অষ্ট্রিয়া সার্বিয়ার বিরুদ্ধে যে পথ-ই অবলম্বন করুক না কেন জার্মানীর তা'তে পূর্ণ সমর্থন থাকবে। আমরা ভেবেছিলাম যে ভিয়েনা বেলগ্রেদের কাছে একটা জোরালো প্রতিবাদ জানাবে। কিন্তু সোজাসুজি যে এমন চরমপত্র দিয়ে বসবে যাতে সেই জাতির স্বাধীনতাই বিপন্ন হয়ে পড়ে— এটা আমরা কখনো ভাবি নি। আবন্তির তরুণ সম্পাদক হিসেবে পুরো ঘটনাপ্রবাহটাকেই আমি তীক্ষ্ম দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করেছিলাম।

চরমপত্রের এক নায়কতন্ত্রী ভাষা যে আঙ্গিকে ওটা লেখা হয়েছিল তা'তে কিন্তু সমস্ত পৃথিবী বুঝে গিয়েছিল যে যুদ্ধের কালো মেঘ আকাশের বুকে ভাসতে শুরু করেছে। আমরা অর্থাৎ ইতালিয়ানরা পৃথিবীর মুখ চেয়ে থাকি ; কারণ আন্তর্জাতিক চাপ কি এই যুদ্ধ বন্ধ করতে সফল হবে নাকি ব্যর্থতাকে মেনে নেবে। যাইহোক বিস্ময় বিমূঢ় হয়েই আমাকে ব্যাপারটার উপসংহারে পৌঁছতে হয়।

দূতাবাসগুলোতে কাজকর্মের চাপ প্রচণ্ড ভাবে বেড়ে যায় রাজনৈতিক দলগুলোও যথাসম্ভব চাপ সৃষ্টি করে।

ইতালি—আমাদের দেশকে মৌখিক তত্ত্বের বদলে যাকে বাস্তব অবস্থার মুখোমুখি হয়ে বাধ্য করেছে একাকী পথ চলতে। জলের বুদ্‌বুদের মতো মোহগুলো মুহূর্তে ফেটে পড়েছে। এমন কি ফরাসী এবং জার্মান সোশ্যালিষ্ট আর প্যারিসে জাউরেসের হত্যাও তখন দ্বিতীয় সারির ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমার কাছে পুরো ব্যাপারটাই হলো শক্তিশালী এবং নাটকীয় সংঘর্ষের ঝালর দেওয়া টুপি বিশেষ—যা দিনে দিনে নিয়তির প্রচণ্ড টানে বিভিন্ন জাতিকে যুদ্ধক্ষেত্রে টেনে এনেছে।

মহাযুদ্ধ শুরু হওয়ার কয়েক মাস আগে ফরাসী পার্লামেন্টে ফরাসী সৈন্যদলের অনভিজ্ঞ, অর্থনৈতিক এবং সমরাস্ত্রের দিক থেকে আধুনিক যুদ্ধ করার ক্ষমতাহীনতাকে ঘিরে বদনাম যে উঁচু স্বরে উঠেছিল—তা' আমি এখনো ভুলি নি। ক্লিমেনসিউ সেই তর্কে অংশ নিয়েছিল

অবশ্যই মুখ গোমড়া করে। পরে বলেছে যে ১৮৭১ সাল থেকে নিয়মিত রাজনীতি করলেও পার্লামেন্টে এইরকম নাটকীয় দৃশ্যের মুখোমুখি অতীতে আর কখনো হয় নি, যাতে সমগ্র ফরাসী জাতি উপলব্ধী করে যে তারা অনভিজ্ঞ সৈন্যবাহিনীর ছত্রতলে রয়েছে—যারা যে কোন বড় সড় যুদ্ধের মুখোমুখি যুঝতে অপারঙ্গম। এটা কিন্তু আমাদের কাছে একটা শিক্ষা ছিল, যা আমরা কখনো ভুলি নি।

যুদ্ধ তখন দরজায় কড়া নাড়তে শুরু করে দিয়েছে। পোপ এবং মিত্রশক্তির বাইরের হিতৈষী দেশগুলোর দুর্বল হস্তক্ষেপের কোন মূল্যই ছিল না ; ঘটনা প্রবাহের মিছিল রোখার শক্তি তাদের ছিল না বললেই হয়। ১৯১৪ সালের ১লা আগস্ট যুদ্ধ শুরু হয়। গ্রীষ্মের সময়। সেই বছরের গ্রীষ্মও ছিল ভারী চমৎকার। যুদ্ধভরা মেঘের ছায়ার নীচে দাঁড়িয়ে পুরনো ইউরোপের লোকেরা সাপকে যে ভয় মিশ্রিত বিস্ময়ে দেখে, সেই বিস্ময়ে যেন স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল।

ইতালি এই যুদ্ধ শুরু হওয়ার কয়েক বছর আগে ত্রিপাক্ষিক মিত্রশক্তির চুক্তি নবীকরণ করেছে। পুরো ব্যাপারটাই যেন শ্রদ্ধা ছাড়া বিয়ে ; এবং রাজনৈতিক প্রয়োজনীয়তার চেয়ে সামরিক শক্তির দাপুটে অধিকার প্রতিষ্ঠিত করার অপচেষ্টা। সামরিক মিত্র চুক্তি এবং নিরাপত্তার মধ্যে পার্থক্য তেমন নেই।

অষ্ট্রিয়া এবং হাঙ্গেরীর সঙ্গে মৈত্রীবদ্ধতা ইতালিতে কিছুটা নড়াচড়ার মতো স্বাধীনতা এনে দিয়েছিল। বৈদেশিক মন্ত্রী মারচেসে অফ সান গিউলিয়ানো সার্বিয়াকে অষ্ট্রিয়ার চরম সতর্কতার পর আপ্রাণ চেষ্টা করে ইতালিকে নিরপেক্ষ রাখতে। সঠিকভাবে বলতে গেল এই ত্রিপাক্ষিক মৈত্রীচুক্তি যে কোন দেশকে আক্রমণ করলে তবে এই চুক্তি কার্যকর করা যাবে। যতোদূর আমার জানা আছে, এই বিষয়ে আমাদের একেবারে অন্ধকারে রাখা হয়েছিল। চুক্তি ভাঙার জন্য এটাই যথেষ্ট নয় কি! যাতে ত্রিপাক্ষিক সেই চুক্তির বাধ্যবাধকতা থেকে ইতালি বাইরে বেরিয়ে আসতে পারে।

অনেকগুলো সাহসী পদক্ষেপের মধ্যে একটা হলো ইতালি আত্মবিশ্বাসে বলিয়ান হয়ে নিজেকে স্বাধীন করার ব্যবস্থা নেয়। ইতিমধ্যে সার্বিয়ার পক্ষে রাশিয়া এসে দাঁড়ালে অষ্ট্রিয়া-হাঙ্গেরীর মিত্রপক্ষ জার্মানীর সঙ্গে ফ্রান্সের বিরোধ বাঁধে।

আমি ইংল্যাণ্ডকে মনযোগ দিয়ে পর্যবেক্ষণ করি। কি ধরনের পদক্ষেপ নেওয়াটা উচিত হবে ইংল্যাণ্ড তখন দ্বিধাগ্রস্থ মন নিয়ে সেটা চিন্তা-ভাবনা করতে ব্যস্ত। নিজের আধিপত্য বজায় রাখতে এবং সঙ্গে সঙ্গে গর্বোদ্ধত মাথাটাকে উঁচুতে ধরে রাখার নিমিত্ত, কিছুটা বা মানবত্বের কারণেও যুদ্ধপোকরণ এবং সৈন্যবাহিনী নতুন লক্ষ্যের দিকে সরিয়ে নিয়ে আসে, যাতে জার্মানীর হাত থেকে পুরনো মহাদেশের দেশগুলোকে কুক্ষিগত করতে পারে।

জার্মান সেনাদল পূর্ব ফ্রান্সে হানা দিলে কিন্তু ইতালিয়ান জনসাধারণ তীব্র ক্ষোভে ফেটে পড়ে। বিশেষ করে জার্মানদের বীভৎস কার্যকলাপও কম আতঙ্কিত করে তোলে না ইতালিয়ানদের। উপরন্তু কোন কারণ ছাড়াই জার্মানদের বেলজিয়াম হানা তো ছিলই। ফরাসী সৈন্যবাহিনী পিছু হটে যায়। শুধু একটা জাতিরই নয়, বহু জাতির ভবিষ্যত-ই তখন অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। সম্পাদকীয় অফিসে বসে থাকলেও ঘটনা প্রবাহের ব্যাপারে কিন্তু আমি সদা সতর্ক ছিলাম। তবে ইউরোপের জাতিদের মধ্যে যে সংস্কৃতির মেলবন্ধন বর্তমান ছিল, তা' কিন্তু অতীত এবং বর্তমান ঝগড়াকে ভুলিয়ে দিতে চায়। তবে যেসব জাতি যুদ্ধের ফলে দুভার্গ্যের শিকার হয়েছে, ইতালি তাদের পরিত্যক্ত করবে—এটা আমি ভাবতেও পারতাম না।

প্রপাগান্ডা দিয়ে জার্মানী ইতালিয়ান জনসাধারণের ক্ষোভ দূর করে জার্মানীর দিকে টেনে নেয়। কারণ মানুষ হিসেবে ইতালিয়ানরা অনুভূতিপ্রবণ। ব্যাপারটা কিন্তু আমাকে ক্রুদ্ধ করে তোলে। জার্মানরা প্রোপাগান্ডাটাকে আরো জোরদার করার জন্য অভিজ্ঞ কূটনীতি বিশেষজ্ঞ প্রিন্স ভন বুলোকে ইতালিতে পাঠায়। কারণ বুলো ইতালি এবং রোমানদের খুব কাছ থেকে চিনতো। বুলোর কাজ ছিল এই যুদ্ধে ইতালি যাতে নিরপেক্ষ থাকে তা' সুনিশ্চিত করা।

কিন্তু ইতালি তখন যুদ্ধের দিকে ঝুঁকে পড়েছে। এই ব্যাপারে আমিও কিছুটা সাহায্য যে না করেছি তা' নয়। ইতালিয়ানদের জীবনে সোশ্যালিষ্ট পার্টির বেশ কিছুটা প্রভাব ছিল ; সেই তুলনায় অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলো কিন্তু অনেক দুর্বল ছিল। তবে সোশ্যালিষ্ট পার্টিও ঠিক বুঝে উঠতে পারে নি তাদের তখন কি ভূমিকা পালন করা উচিত ছিল। আসলে তখনো ব্যাপারটাকে ঠিক বুঝে উঠতে না পারায় ওদের চিন্তাধারায় টলমলে ভাব ছিল। সোশালিষ্ট পার্টির বেশির ভাগ সদস্যই চেয়েছিল যাতে ইতালি সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ থাকে। সময় এবং কোনরকম শর্ত টর্ত ছাড়াই তারা এই নিরপেক্ষ থাকার দাবী তুলেছিল। এমন কি সেই দলের অনেক সদস্য তো খোলাখুলি জার্মানীকে সমর্থন জানিয়েছিল। আমি কিন্তু কখনো তা' করি নি।

কয়েকজন বুদ্ধিজীবি এবং প্রচণ্ড ইচ্ছাশক্তির অধিকারী নিজেদের অন্তরেই এই প্রশ্ন তোলে যে ক্রশিয়ার রাজাকে রাজনৈতিক মদত দিলে ইতালি বা পৃথিবীর ভবিষ্যত কি ভালো হবে? আমি নিজেও আবন্তি পত্রিকায় এই প্রশ্ন-ই রেখেছিলাম। বলাবাহুল্য সমস্ত শ্রেণীর পাঠক-পাঠিকারাই তা' পড়েছিল। এটা সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে আমার একটা বিরাট অবদান বলেই আমি মনে করি। এই প্রশ্নটা কিন্তু যুদ্ধে ইতালিকে ফ্রান্স এবং ইংল্যান্ডের পাশাপাশি দাঁড়াবার জন্য জনমত তৈরিতেও সাহায্য করেছিল। আমাদের স্মরণে রাখা উচিত যে পূবদিকের সীমান্ত যা অষ্ট্রিয়ার সঙ্গে ১৮৮৬ সালের যুদ্ধের পর থেকে খোলা রয়েছে, তার সঙ্গে শুধু অনুভূতি-ই নয়, আরো অনেক প্রশ্ন জড়িত।

রাত্রে পত্রিকার অফিস থেকে হাঁটতে হাঁটতে বাড়িতে পরিবারের কাছে ফিরে আসি। মনের মধ্যে সূচিমুখ জিজ্ঞাসাগুলো যেন জোর করে বাইরে বেরিয়ে আসতে চায়। সর্বোপরি আমার দেশ। চোখের ওপরে দেখতে পাচ্ছি যে আন্তর্জাতিকতাবাদ রীতিমতো মুখ থুবড়ে পড়েছে। বিশ্বস্ততার মূল্যও বিশাল। তখন আমি একটা সম্পাদকীয়তে লিখেছিলাম যদি ধরে নেওয়া হয় যে একটা সোশ্যালিস্ট দেশ আমরা গড়ে তুলতে পারি, বহু পুরনো জাত-পাত বা ঐতিহাসিক বিবাদগুলোর সাহায্যে কিন্তু যুদ্ধ করা সম্ভব হবে না।

পূবদিকে ইতালির সীমান্ত জুড্রিয়ো পর্যন্ত বিস্তৃত কিন্তু ল্যামবার্ডি এবং ভেনিসিয়ান প্রদেশের কিছু অংশ ট্রেনটিনো অঞ্চল অষ্ট্রিয়ার শাসকরা বে-আইনি ভাবে দখল করে রেখেছে। অষ্ট্রিয়া-হাঙ্গেরীর সাম্রাজ্যের সঙ্গে ব্যাপারটার বোঝাপড়া তখনো বাকী যা মহাপুরুষ দান্তে প্রতিটি ইতালিয়ানদের হৃদয়ে প্রবেশ করিয়ে দিয়েছিল। ইতালির সীমান্তরেখা হওয়া উচিত ব্রেনেরো এবং গুয়েলিয়াৎ আর ইলিরাক আল্পস বরাবর। ফিউমে আর ডাল মাটিয়ারও সেই সীমান্তের মধ্যেই পড়া উচিত।

এই নতুন ধরনের পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়ে সমস্ত রাজনৈতিক চেতনা সম্পন্ন মানুষ, এমন কি আমিও নিজেদের চিন্তাধারাকে বিশ্লেষণ করতে শুরু করি। শুধু সমস্যাটার উল্লেখেই

জাতীয় আত্মচেতনার নিদারুণ গোপন প্রসব যন্ত্রণাটা পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। আমার চিন্তাধারাটাকে বাস্তবে রূপ দিতে দৃঢ় সংকল্প হই।

যুদ্ধের স্বপক্ষে সিজার বাতিস্তি'র শ্লোগান ছিল—হয় এখনই অথবা কখনো নয়। অস্ট্রিয়ার শাসকবর্গ তাকে শহীদ করলেও তার পবিত্র আত্মা প্রতিটি ইতালিয়ানের হৃদয়ে অমর ; দূরদ্রষ্টা ফিলিপো করিডনির সশস্ত্র অগ্নি-বিপ্লবও তার সঙ্গে হাত মিলিয়েছিল। তাদের চিন্তাধারায় অনুপ্রাণিত হয়ে সোশ্যালিষ্ট পার্টির একটা অংশকে যুদ্ধের পক্ষে টেনে নিয়ে আসতে সক্ষম হই। আমার সঙ্গে আরো অনেক বিপ্লবী ছিল যারা তাদের সংগ্রামকে আর টেনে নিয়ে যেতে পারছিল না ; কিন্তু তাদের মধ্যেই কয়েকজন আমাদের জাতির অবিনশ্বর জীবনিশক্তিকে আবার জাগিয়ে তোলে।

সোশ্যালিষ্ট পরিচালকবর্গ যখন ভালো করে বুঝতে পারে যে আমি ঠিক কোথায় চলেছি, তখন আবন্তি পত্রিকার পরিচালনার ভার আমার কাছ থেকে নিয়ে নেয়। ইতালির সেই যুদ্ধ যাত্রার পথ আমি কিছুতেই সমর্থন করতে পারি নি। প্রতিটি সম্মেলনে সোশ্যালিষ্টরা আমার বিরোধিতা করতে শুরু করে। আমাকে পার্টি থেকে বহিঃষ্কার করলে আমি ব্যাপকভাবে জনসভার আয়োজন করি।

কিছুদিনের মধ্যে ফ্যাসিষ্ট নামে একটা দল তৈরি করি। একদল মরীয়া যুবকদের সঙ্গে নিয়ে, যারা ভাবে শক্তির দ্বারা অনেক কিছু করা সম্ভব। সন্দেহ নেই তখনকার যে রাজনৈতিক চিন্তাধারা যা ইতালি স্বাধীন হওয়ার পর থেকে ১৯১৪ সাল পর্যন্ত চলে আসছে—পুরো ব্যাপারটাকেই যেন সজোরে ঝাঁকি দেয়। আমি তাদের নেতা নির্বাচিত হই।

আজকে ব্যাপারটা কৌতূহলদ্দীপক হলেও সন্দেহ নেই যে গণতন্ত্র উদার গণতান্ত্রিক প্যাসিফিষ্টের চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। যে দলের ওপরে রয়েছে জিয়োভানি জিয়োলিটি—যার পার্লামেন্টের ওপরে কর্তৃত্ব কম নয়। তদুপরি ধূর্ত রাজনৈতিক সংগঠন ক্ষমতার অধিকারী। সেই জিয়োভানি তখন এমন একটা তত্ত্ব দাঁড় করাতে চেষ্টা করছে যাতে ইতালির সীমান্ত ঝামেলা যে মিটবে শুধু তাই নয়, দেশ যুদ্ধে জড়িয়ে পড়লে যে প্রচণ্ড ক্ষয়ক্ষতি আর জীবন হানির সম্ভাবনা—তার হাত থেকেও ইতালি যাতে বাঁচতে পারে। জিয়োলিটি বার বার একটা কথারই পুনরাবৃত্তি করতো যে যুদ্ধ ছাড়াও ইতালি প্রচুর সুযোগ সুবিধা পেতে পারে। তবে ইতালিয়ানদের মনে কিন্তু এই জিয়োলিটির অনেক কিছু পাওয়ার সম্ভাবনা নিছক ব্যঙ্গ ছাড়া আর কিছু মনে হয় নি। স্বভাবতই ইতালিয়ানরা বাস্তববাদী এবং রাজনৈতিক দর কষাকষির বিরুদ্ধে।

ইতালির জনসাধারণ কিন্তু এই শান্তিপূর্ণ কয়েকটা সুবিধাপ্রাপ্তি এবং সীমান্তের কিছু সংশোধনকে তেমন একটা গুরুত্ব দেয় নি। বরং হাল্‌কা ভাবেই নিয়েছে। আসলে এই ষড়যন্ত্রকারী ধূর্ত নেতার আন্তরিকতায় ইতালির আপামর জনগণ বিশ্বাস করে নি। আমার মতে রাষ্ট্রনেতার এটা দুর্বলতা—আপোষকারী রাষ্ট্রনেতা বলাটাও অন্যায় হবে না। ভবিষ্যতদ্রষ্টারা ইউরোপের বিভিন্ন জাতির মধ্যে এই সংঘর্ষটাকে নিজেদের জাতির সুবিধার কাজে লাগাতো—বিশেষ করে অন্যান্য জাতির ওপরে প্রভুত্ব স্থাপনের এই তো ছিল সুযোগ। সময়ের চক্র ঘুরে সেই নাটকীয় মুহূর্ত এসে উপস্থিত হয়েছিল, যখন ইতালি তার সামরিক বিভাগের ওজনের জন্য পৃথিবীর অগ্রগণ্য জাতিদের সঙ্গে নিজেদের দাঁড় করাতে পারতো।

সেটাই ছিল আমাদের সুযোগ। আর সেই সুযোগটাকেই আমি দখল করতে চেয়েছিলাম। আমার চিন্তার গভীরে তখন এই একটা বিষয়-ই ছিল।

মহাযুদ্ধ শুরু হয়েছিল ২৮শে জুলাই, ১৯১৪ সালে। ষাট দিনের মধ্যে সোশ্যালিষ্ট পার্টির সঙ্গে আমি আমার সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করে ফেলেছিলাম। তার আগেই অবশ্য আবন্তি পত্রিকার সম্পাদকের পদ ছেড়ে দিয়েছিলাম।

নিজেকে অনেক হাল্‌কা মনে হয়েছিল। মুক্তও বটে। বিশেষ একটা রাজনৈতিক দলের মতভেদের পোষাক পড়ে সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার চেয়ে নিজের সংগ্রাম নিজের করা অনেক ভালো। তবে আধুনিক অস্ত্র অর্থাৎ আত্মরক্ষা এবং আক্রমণ করার সবচেয়ে প্রকৃষ্ট উপায় হলো সংবাদপত্র।

দৈনিক একটা পত্রিকা তখন আমার সবিশেষ প্রয়োজন ছিল। সত্যি বলতে কি তখন আমি একটা সংবাদপত্রের প্রয়োজনে রীতিমতো উদ্‌ভ্রান্ত। অতীতে রাজনৈতিক সংগ্রামে যারা আমার পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল—সেই রকম কয়েকজন বন্ধু যোগাড় করি। শুধু যখন টাকার প্রয়োজন, তখন কি আমার পক্ষে ভেল্‌কি দেখানো সম্ভব। তবে একটা প্রজেক্ট শুরু করার জন্য অবশ্যই মূলধনের প্রয়োজন ; বিশেষ করে সংবাদপত্র প্রকাশের ব্যাপারে। ব্যাপারটার অন্য দিকটাও দেখি। রাজনৈতিক মূল্যবোধ এবং আত্মিক শক্তিটার দিকেই আমার নজর পড়ে। টাকা আমার কাছে ঘৃণিত একটা উপাদান বিশেষ—তবে কখনো কখনো তা' দিয়ে সুন্দর এবং মহৎ কাজ করাও সম্ভব।

আমার কয়েকজন বন্ধু, যারা নতুন ধ্যান-ধারণায় ভরপুর এবং সেই চিন্তাধারায় কঠোর বিশ্বাসী দ্রুত মিলানে পিজা দেল ডুমোর কাছে সংকীর্ণ একটা রাস্তার ওপরের বাড়ির চিলেকোঠার মতো ছোট্ট একটা ঘর খুঁজে বার করে। বাড়িটার সামনেই একটা প্রেস ছিল। প্রেসের মালিক অতি অল্প খরচে আমাদের পত্রিকাটা ছেপে দিতে রাজী হয়। আমি সেই পত্রিকাতে ইতালি এবং ইতালিয়ানরা কি চায় আর কতোটুকুই বা সুযোগ সুবিধা পেতে পারে, সেই বিষয়ের ওপরেই জোর দেই।

সুতরাং পত্রিকাটা বার করতে বিশাল কোন খরচের দরকার পড়ে নি। পত্রিকাটার প্রকাশনা এমনভাবে করতে চেয়েছিলাম যাতে মিলান শহরটাকে সম্পাদকীয় প্রবন্ধগুলোর দ্বারা দুর্গের মতো ঘিরে রাখা যায় আর প্রতিটি ইতালিয়ান পত্র-পত্রিকা সেই সম্পাদকীয়গুলোর অংশ বিশেষ হলেও পুনরায় ছাপতে বা উদ্ধৃতিতে বাধ্য হয়।

তার সঙ্গে অবশ্য সবরকম নাটকীয় ভাবে চেষ্টা করেছি পাঠক সংখ্যা দ্রুত বাড়িয়ে যেতে। আমার প্রবল ইচ্ছা ছিল এটাই। লক্ষ্যও বটে। অফিসটাকেও তাড়াতাড়ি একটা টেবিল আর কয়েকটা চেয়ার দিয়ে সাজিয়ে গুছিয়ে ফেলি। সাংবাদিকতার যে মোহ বা প্রেমে আমি পড়েছিলাম, তার থেকে বের হওয়ার ক্ষমতা আমার ছিল না। বরং সাংবাদিকতার ট্রেঞ্চে বসে যুদ্ধ লড়ে যাওয়াটাই ছিল আমার চরম লক্ষ্য।

প্রেসের সঙ্গে আমরা একটা চুক্তি স্বাক্ষর করি ; কিন্তু সাপ্তাহিক সেই প্রেসের খরচা কয়েক হাজার লিরা মেটাতে গিয়ে আমরা যারপরনাই বিপদে পড়ি। কিন্তু তবু চিন্তাধারাকে কিছুতেই পেছু হঠতে দেই না।

শেষ পর্যন্ত ১৫ই নভেম্বর, ১৯১৪ সালে পোপোলো দ্য ইতালিয়ার প্রথম সংখ্যা

আত্মপ্রকাশ করে। এখনো পর্যন্ত আমার স্মরণে আছে যে এই পত্রিকাটাই আমার প্রথম এবং সবচেয়ে প্রিয়তম সন্তান। এই ছোট্ট শুরু দিয়ে আমি আমার রাজনৈতিক জীবনের যুদ্ধে জয়লাভ করেছি। এখনো পর্যন্ত আমি সেই পত্রিকাটার ডিরেক্টার।

১৯১৪ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়ে ১৯২২ সাল পর্যন্ত আমার পটভূমিকা হিসেবে যে পত্রিকাটা কাজ করেছে—সেই পত্রিকাটা সম্পর্কে হাজার পাতার স্মৃতিকথা আমি লিখতে পারি। আমাকে তৈরি করার পেছনে এই পত্রিকাটার ভূমিকা নেহাৎ কম নয়। পোপোলো দ্য ইতালিয়ার নাম তাই বার বার ঘুরে ফিরে এই লেখাতে আসবে। আমার রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের বিকাশে, সাংবাদিক হিসেবে, যুদ্ধের স্বপক্ষে আমার দৃঢ় মত প্রকাশে, সৈনিকের পোষাকে এবং সর্বোপরি একজন ইতালিয়ান আর ফ্যাসিস্ত হয়ে ওঠার পেছনে পত্রিকাটার গুরুত্ব সম্ভবত সর্বাধিক ছিল।

পোপোলো দ্য ইতালিয়াতে আমার লেখা প্রথম প্রবন্ধটাই বিশাল জনসাধারণকে ইতালির যুদ্ধে নামার প্রেরণায় উদ্‌বুদ্ধ করে। ফরাসী এবং ইংল্যাণ্ডেও তার প্রতিধ্বনি শোনা যায়।

আমার পাশে এসে দাঁড়িয়ে সংবাদপত্র সম্পাদনায় যারা সাহায্য করেছিল, তারা ছিল সবাই ফ্যাসিষ্ট। অবশ্য সেই দলে যারা যুদ্ধে ইতালি যাতে যোগ দেয়—সেই বিশ্বাসে বিশ্বাসী কিছু উগ্রপন্থী বিদ্রোহী, ইউনিভার্সিসিটির ছাত্র এবং কার্ল মাকর্সের আদর্শে আস্থা না থাকা কিছু সোশ্যালিষ্ট আর পেশাগত লোকের সংখ্যাও কম ছিল না। বিশেষ করে শ্রমিক শ্রেণী, যারা দেশের ভাষা তখন পর্যন্ত স্পষ্ট শুনতে পারতো।

ইতালি যুদ্ধের বাইরে থাকলেও আমরা প্রাচীন রোমের মতো হাজার ছ'য়েক সৈন্যের একটা দল গঠন করে ফ্রান্সে যুদ্ধ করতে পাঠাই। আরগনির যুদ্ধে রিসোওটি গারবল্ডীর দু'ই ছেলে ব্রুনো এবং কসটান্টে নিহত হয়। ওরা হলো গ্রেট গারবল্ডীর ভাইপো— যে সম্মিলিত ইতালির হয়ে নর্থ সিসিলি এবং নেপেলস্ জয় করেছিল। এই দুই বীরের শেষকৃত্য রোমে সম্পন্ন করা হয়। যার ভাবগম্ভীর প্রতিধ্বনি ইতালির কোণে কোণে ছড়িয়ে পড়ে। আবার সেই লাল সার্ট ইতালির উদ্ধারকর্তার ভূমিকা পালন করে। বর্তমানে ফ্রান্সের মাটিতে ল্যাটিনের বিশুদ্ধতাও প্রমাণ করে।

ভূমধ্যসাগরের ওপরে আধিপত্য নিয়ে অতীতের ঝগড়া—যা খুব বেশিদিনের কথা নয়, উভয়পক্ষই ভুলে যায়। লিবিয়ার সঙ্গে আমাদের যুদ্ধের সময় ফ্রান্সের শত্রুতা কেউ মনে রাখে না। তুর্কীদের সাহায্যকারী ফরাসী জাহাজদ্বয় মানুবা এবং কার্থেজের কথা কারোর স্মরণে থাকে না। যাদের ১৯১২ সালের জানুয়ারী মাসের যুদ্ধে আমাদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করা হয়েছিল। অতীতের সবকিছু ইতালির মানুষ তখন ভুলে গেছে। ফ্রান্স বিপন্ন। বেলজিয়ামকে নৃশংস ভাবে ধর্ষণের পর ফ্রান্সে ওরা হানা দিয়েছে ; আক্রমণ চালিয়েছে। যে কোন সময় ফ্রান্সের পতন ঘটতে পারে।

গাব্রিয়েল ডি আনুনজিয়ো ৫ই মে জেনোয়ার কাছে কোয়ার্তো দাই মিলিতে তার বক্তৃতা শুরু করে। এই কোয়ার্তো দাই মিলি থেকেই গারবল্ডী তার যাত্রা শুরু করেছিল। সিসিলিতে। সঙ্গে ছিল হাজার হাজার উত্তরের অধিবাসী। যাতে বুয়োরবন্‌সদের কাঁধ থেকে জোয়ালটা নামিয়ে দক্ষিণ ইতালিকে দেওয়া যায়। সে তার চমৎকার বাগ্মিতা দিয়ে ইতালিকে যুদ্ধে নামতে প্রলুব্ধ করে।

ইতালির আত্মিক শক্তি ততোদিনে জেগে উঠেছে। যুদ্ধের স্বপক্ষে জিয়োলিটির বিরোধিতার পালায় হঠাৎ যবনিকা নেমে আসে। রাজা সংবিধান অনুযায়ী এবং পার্লামেন্টের কাউন্সিলারদের পরামর্শের জন্য বাধ্য হয় সংবিধানের প্রতিটি রক্ষণশীল অনুচ্ছেদ মেনে চলতে। তাই কাইজারের প্রতিনিধিকে জানায় যে পুরনো মিত্র হিসেবে ইতালিকে পুরো ব্যাপারটাতে অন্ধকারে রাখা হয়েছে তাই ব্যাপারটা গিয়ে বিশ্বাসঘাতকতার পর্যায়ে পড়েছে।

যুদ্ধের স্বপক্ষে মিলানের সরব জেহাদ রোম, পাদুয়া, জেনোয়া এবং নেপেলেসেও জোরদার সমর্থন পায়। রাজা তৃতীয় ভিক্টর ইমানুয়েল প্রধানমন্ত্রী জিয়োভানি জিয়োলিটিকে পদত্যাগ করতে বলে। তারপর রাজা সালেনদ্রোকে আহ্বান করে নতুন মন্ত্রীসভা গঠন করার জন্য। আমার ধারণায় যুদ্ধের প্রথম রাউন্ডে আমি জিতে গেছি। অল্পবয়স, বলতে গেলে অনভিজ্ঞ আমি অশৃঙ্খলিত ক্ষমতা এবং স্বাধীনতার স্বাদ পাই।

নতুন মন্ত্রীসভা যুদ্ধে যোগ দেওয়ার স্বপক্ষে রায় দেয়। হ্যাঁ, জিয়োলিটির ধ্যান-ধারণা যুক্তি- টুক্তি গুলোকে একপাশে ঠেলে দিয়ে। তবে প্রশ্ন হলো কখন এবং কিভাবে! আমাদের সবার নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস যেন তখন থমকে গেছে ; প্রস্তুত হয়ে আমরা অধীর আগ্রহে সেই মহা-সময়ের জন্য অপেক্ষা করি। শেষমেষ ১৯১৫ সালের ২৪শে মে সেই মহামুহূর্ত এসে উপস্থিত হয়। বিজয়ের সেই মুহূর্তে আমি কেন কারোর পক্ষেই মনের তখনকার অবস্থা বর্ণনা করা সম্ভব নয়।

ইতালিয়ান সীমান্তে ঠিক কি কি ঘটনা ঘটেছিল, একটা অধ্যায়ে সব কিছু বিস্তারিত লেখা সম্ভব নয়। কারণ ব্যাপারটা অসম্ভবের পর্যায়ে পড়ে। যুদ্ধ যেন আমাকে ছাঁচে ঢালাই করে দেয়। আর সাধারণ একজন সৈনিক হিসেবে সেই যুদ্ধের নাটকীয় ঘটনাগুলোর সঙ্গে জড়িয়ে পড়ি। হ্যাঁ, সৈনিক এবং তদুপরি একজন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব হিসেবে যেগুলো আমার অনুভূতিকে গভীরভাবে ছুঁয়ে গিয়েছিল, সেগুলোই বলবো।

যেদিন থেকে বারসেগ্লিয়ারী রেজিমেন্টের হয়ে বাদামী-সবুজ রঙের সৈনিকের পোষাক গায়ে চড়িয়েছি, সেদিন থেকেই একজন সর্বোৎকৃষ্ট সৈনিক হিসেবে যা যা কর্তব্য, করে গেছি। বারসেগ্লিয়ারী রেজিমেন্ট ইতালির সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ রেজিমেন্ট বিশেষ করে যে কোন পরিস্থিতির মোকাবিলার ব্যাপারে। অবশ্য এই রেজিমেন্টেই আমি সৈনিক জীবনের শিক্ষানবিসি করেছিলাম। আমি সবসময় একজন বাধ্য, কর্তব্যপরায়ণ, সুশৃঙ্খল সৈনিক হ'তে চেয়েছি। এবং মনে হয় তা'তে সফলও হয়েছি। আমার রাজনৈতিক অবস্থানের জন্য সুযোগ সুবিধার আহ্বান কম পাই নি ; নিরাপদ সুরক্ষিত স্থানেও সরে যাওয়ার সুযোগ আমার ছিল। কিন্তু আমি অবহেলায় তা' সরিয়ে দিয়েছি।

সব সময় চেষ্টা করেছি নিজে যেটা বিশ্বাস করি, সেই আদর্শের প্রতি একনিষ্ঠ এবং সৎ থাকতে; ব্যক্তিগত যে কোন লাভের জন্য কোনরকম ষড়যন্ত্র করা আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না। আমার বিশ্বাসের শিকড় মনের গভীরে প্রোথিত ছিল এবং আজও আছে। আর সেটাই হলো আমার জীবনের ধ্রুবতারা। আমার মতে যদি কেউ কোন ধ্যান-ধারণা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে, তা'হলে সেই ধ্যান-ধারণাকেই তার আঁকড়ে ধরে থাকা উচিত। হ্যাঁ, প্রত্যহের জীবনেও। আর সেই মতবাদ প্রতিষ্ঠার জন্য যে কোন মূল্যে সংগ্রাম করে যাওয়াটাই সঙ্গত।

শেষ বিজয়বিন্দুতে না পৌঁছনো পর্যন্ত।

সময় অনেক কিছুকেই মুছে দিয়েছে ; ভুলে যাওয়াটাই মানুষের চরিত্রের স্বাভাবিক ধর্ম। দীর্ঘ এক চল্লিশ মাস তীব্র যুদ্ধের পরে যে বিজয় এসেছিল তা' অনেক হৃদয়ের গভীরে ক্রোধ জাগিয়ে তোলে।

যুদ্ধ ঘোষণা করার সঙ্গে সঙ্গে সামরিক কর্তৃপক্ষকে আমি জানাই যে স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে যুদ্ধে যোগ দিতে চাই। ওরা উত্তরে জানায় যে স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে আমাকে নেওয়া যাবে না। ঘটনাটা নিঃসন্দেহে দুঃখজনক। কারণ সামরিক আইন অনুযায়ী শারীরিক বা অন্য কোন কারণ বশত যারা আবশ্যিক মিলিটারী ট্রেনিংয়ে যোগ দিতে পারে নি অথবা যোগ দিতে দেওয়া হয় নি—তারাই একমাত্র স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে কাজ করার অধিকারী। আমাকে উপরিওয়ালার নির্দেশ অনুযায়ী সময় মতো ডেকে পাঠানো হবে। বলতে আপত্তি নেই যে ব্যাপারটাতে আমি অত্যন্ত নিরাশ হয়ে পড়ি।

যাইহোক সুখের বিষয় যে শীঘ্র সামরিক বাহিনীতে যোগ দেবার জন্য আমার ডাক পড়ে। ইতালি যুদ্ধ ঘোষণা করার মাত্র তিন মাস পরে ১লা সেপ্টম্বর আমি গায়ে বারসেগলিয়াঁরী রেজিমেন্টের পোযাক চাপাই। লামবার্ডির ব্রেসসিয়াতে আমাকে পাঠানো হয়। এই ব্রেসসিয়ার আশে পাশে তখন মুহুর্মুহু বিমান থেকে বোমাবর্ষণ হয়ে চলেছে।

ব্রেসসিয়াতে পৌঁছনোর সঙ্গে সঙ্গে আমাকে অন্যান্য সৈনিকদের সঙ্গে আল্পসের উঁচু যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠিয়ে দেয়। সেখানে তখন প্রচণ্ড যুদ্ধ চলেছে। এখানে কয়েক মাস পাহাড়ের ট্রেঞ্চে যে কষ্ট করতে হয়েছে, জীবনে এতো কষ্ট আর কখনো পাই নি। সেই প্রচণ্ড কষ্টের দিনগুলোয় উপসম করার মতো কিছু ট্রেঞ্চে বা ব্যারাকে ছিল না। এক জায়গায় পরস্পর গাদাগাদি করে থাকা। সব জিনিষপত্রেরই অভাব ছিল। চারদিক কাদায় কর্দমাক্ত। প্রথম কয়েক মাস তো আমরা প্রচণ্ড ঠাণ্ডা, বৃষ্টি, কাদা আর ক্ষিদেয় কষ্ট পেয়েছি। তবে এগুলো কিন্তু আমার উৎসাহকে এতোটুকু দমাতে পারে নি। সেইদিনগুলোতেও আমি ভেবেছি যুদ্ধ প্রচণ্ডরকমের কষ্টকর হলেও ইতালি জাতির দরকার ছিল এই যুদ্ধের। সেই দুঃখ কষ্ট আমার একটা মাথার চুলও যেমন এদিক ওদিক করতে পারে নি, তেমনি আমার চিন্তাধারাতেও এতোটুকু ফাটল ধরে নি।

শ্রুতিলেখক হিসেবে প্রথমে আমাকে বিভিন্ন হেড কোয়ার্টার্সে পাঠানো স্থির হয়। কিন্তু কর্তৃপক্ষের এই প্রস্তাব সোজাসুজি আমি প্রত্যাখান করি। তার চেয়ে বিপদজনক হলেও বিভিন্ন সামরিক ক্ষেত্র পরিদর্শনের কাজটাই আমি বেছে নেই। হ্যাঁ, স্বেচ্ছায়। তবে তা'তে যে আমার অনেক উপকার হয়েছিল তা' অস্বীকার করার উপায় নেই। কয়েক মাসের মধ্যে ঊর্ধতন কর্তৃপক্ষ আমাকে কর্পোরাল পদে উন্নীত করে বলে,—বেনিতো মুসোলিনি, তোমার সাহস-ই তোমাকে এই পুরস্কার এনে দিয়েছে।

আমার অতীত রাজনৈতিক কার্যকলাপের জন্য অবশ্য ততোদিনে ওপরওয়ালারা বেশ সাবধান হয়ে গেছে। দৃষ্টির আড়ালে হলেও যে আমাকে নজরে নজরে রাখা হয়েছে তা' বুঝতে কষ্ট হয় না। যারজন্য ভেরেনেজোতে অফিসারদের জন্য নির্দিষ্ট ট্রেনিং স্কুলে আমাকে পাঠানো হয়নি। এক সপ্তাহ ছুটির পরে আবার বেশ কয়েক মাসের জন্য আমাকে ট্রেঞ্চে পাঠানো হয়। একই ধরনের জীবনযাত্রা। নিত্য জ্বরে ভোগা, রোমাঞ্চকর, বে-পরোয়া।

কয়েকদিন পরে টাইফয়েডে শয্যাশায়ী হয়ে পড়লে সামরিক কর্তৃপক্ষ আমাকে সিবিডালের মিলিটারী হাসপাতালে পাঠায়। কিছুটা ভালো হয়ে উঠলে আমাকে অল্প সময়ের জন্য স্বাস্থ্য লাভের তাগিদায় পাঠানো হয় ফেরারাতে। অলস সেই দিনগুলোয় বিরক্তি এসে যায়। সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভের পর আল্পসের একটা চূড়ায় ফিরে আসি। রাতের বেলা অন্ধকার আকাশের দিকে তাকিয়ে কাঁপতে থাকা তারাগুলোকে অনেক কাছে বলে মনে হ'তো।

আত্মরক্ষার জন্য আমার ব্যাটেলিয়ানকে শত্রুব্যূহের আরো কাছে এগিয়ে নিয়ে গিয়ে কারসোতে ঘাঁটি গড়তে আদেশ দেয়। আমার অধীনস্থ সৈনিকদের হ্যান্ড গ্রেনেড ছোঁড়ার বিশেষ প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছিল। পাকাপাকিভাবে আমাদের অবস্থানের থেকে কখনো মনে হয়েছে এই আগুন-ঝরানো গুলি-বর্ষা আর থামবে না ; আর জীবনে এই বিভীষিকার হাত থেকে মুক্তিও পাবো না।

কিছুদিন কষ্টের পর ট্রেঞ্চের আতঙ্কগ্রস্থ জীবনযাত্রার সঙ্গে অভ্যস্ত হয়ে পড়ি। পোপোলো দ্যা ইতালিয়া আমার সংবাদপত্র হলেও পত্রিকাটা যেন গোগ্রাসে গিলি। কয়েকজন বন্ধুর ওপরে পত্রিকাটা প্রকাশনার ভার দিয়ে এসেছিলাম। কিন্তু পত্রিকাটা থেকে সরে এসে স্বজন বিয়োগ ব্যথায় কষ্ট পাচ্ছিলাম। যদিও সেই বন্ধুদের ওপরে আদেশ ছিল পত্রিকাটায় প্রকাশিত লেখাগুলোর মাধ্যমে ইতালির কর্তব্য এবং অদৃষ্টকে যেন আলোকবর্তিকার মতো জ্বালিয়ে রাখে। আর সব সময় যুদ্ধের আহ্বানটাকে বড় করে তুলে ধরে। হ্যাঁ, যুদ্ধ শেষ না হওয়া পর্যন্ত। তবে নিজেকে কিন্তু এইসব ব্যাপারে জড়াই নি। কারণ তখন আমি একজন সৈনিক। সুতরাং সৈনিকের কর্তব্য পালন আমি সবার ঊর্ধে তুলে ধরে রেখেছিলাম। অফিসার এবং সৈনিকদের মানসিকতা অনুধাবন করাই ছিল ট্রেঞ্চের মধ্যে আমার আনন্দ। খুশীও হতাম। পরবর্তী জীবনে এই অনুধাবন আমাকে ওপরে উঠতে অনেক সাহায্য করেছে।

যাইহোক আমার সেই অশান্ত হৃদয়ে সারা ইতালিতে ছড়িয়ে থাকা প্রতিটি সৈনিকের জন্য গর্ববোধ করি। পূর্ব সীমান্তের অনেক আদেশের পেছনেই ঐতিহাসিক কোন যুক্তি ছিল না কিন্তু সৈনিকরা জানতো তাদের ঊর্ধতন অফিসারদের আদেশ কিভাবে অক্ষরে অক্ষরে পালন করতে হয়। সেই মিলিটারী অফিসারদের মধ্যে অনেকেই ছিল ইউনিভার্সিটির এবং কলেজের ছাত্র ; কিন্তু বর্তমান বংশধরদের শিরায় শিরায় যে অতীতের বীরদের বীরত্ব বয়ে চলেছে, কথাটা ভাবতেও সেদিনগুলোয় অত্যন্ত আনন্দ পেতাম।

সত্যি বলতে কি যুদ্ধে এতো মানুষ ক্ষয়, কতো বিশাল জিনিসপত্রের প্রয়োজন পড়ে আর কী সাংঘাতিক পরিশ্রম যা আমাদের অবাক করে দেয়। গ্যারিবল্ডিয়ান যুদ্ধের চিন্তাধারার সঙ্গে প্রকৃত এই যুদ্ধের যদি এতোটুকু মিল থাকে। ঘাড় গুঁজে যুদ্ধ সম্পর্কে আমাদের পুরনো চিন্তা ঝেড়ে ফেলে দিয়ে সংগ্রাম বা আত্মরক্ষা এবং আক্রমণ উভয়ক্ষেত্রেই নতুন পদ্ধতি চালু করি। সবচেয়ে আনন্দের ব্যাপার যে আমাদের জাতি এতো তাড়াতাড়ি পুরো ব্যাপারটাকে রপ্ত করে নিয়েছে, সেটা ভাবতেও অবাক লাগে। হেড কোয়ার্টাসগুলো এবং তাদের সাহায্যকারী অন্যান্য সামরিক সংস্থা, বিশেষ করে মেডিকেল টিমগুলো যে সূক্ষ্মতার সঙ্গে কাজ করে গেছে তা' আমার পক্ষে কখনো ভোলা সম্ভব নয়। তবে আমাদের সৈন্যদের রাজনৈতিক চেতনার দিকটা ভাবলেই মনটা অন্ধকার হয়ে উঠতো। বিশেষ করে রোমে অবস্থিত সামরিক সংস্থাগুলোর কাজকর্মে রীতিমতো মনে ভয় ধরিয়ে দিতো। আসলে

পার্লামেন্ট তখনো অতীত দিনের দোষ থেকে নিজেকে মুক্ত করতে পারি নি।

হস্তক্ষেপ না করে নিরপেক্ষ থাকার প্রচেষ্টাটা আগে আমাদের ঘাড়ের ওপরে বিষ বাষ্পের মতো নিঃশ্বাস ফেলে কিছুটা হলেও শক্তি কেড়ে নিচ্ছিলো। পরাজয়ের মুখোমুখি কখনই তারা হ'তে চায় নি। জানি তারা তখন আপ্রাণ চেষ্টা করে চলেছে যতোখানি পারা যায় আমাদের যুদ্ধ করার উৎসাহ এবং ক্ষমতা কেড়ে নিতে।

বোকার মতো বুদ্‌বুদ্‌ তোলা আর কফি হাউসে বসে ভীত হয়ে যুদ্ধের বিরুদ্ধে অসংলগ্ন কৌশল আঁটা লোকগুলো যখন এমন পরিবারে যেতো, যাদের ছেলেরা যুদ্ধক্ষেত্রে যুদ্ধরত, এদের কথাবার্তা শুনে পরিবারের সকলের প্রতিরোধের ইচ্ছেটাই উবে যেতো। সাধারণ সৈনিক হিসেবে আমি কিছুতেই বুঝে উঠতে পারতাম না যে মাত্র কয়েক শ' মেসিন গানের মালিক রুমানিয়াকে কি করে যুদ্ধে টেনে নামানো হয়েছিল। আর গ্রীস? গ্রীস শুধু পেরিয়াতে ইসাডোরা ডানকানের ক্লাসিক নাচে অনুপ্রাণিত হয়ে তুর্কীর বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেছিল।

. আমাদের সেনাবাহিনীর প্রতিদিনের অগ্রগতির খবরাখবর আমি রাখতাম। ১৯১৬ সালের ইসানজো'র যুদ্ধ ; আল্পসের পাহাড়ে পাহাড়ে তখনো সমানতালে যুদ্ধ চলেছে। তবে ফ্রান্সের যুদ্ধের গতি প্রকৃতিতে আমার খুব একটা উৎসাহ ছিল না। বিশেষ করে হতভাগ্য দার্দেনেলিশের পতন এবং পূর্ব সীমান্তের যুদ্ধের ব্যাপার স্যাপারে যে আমার উৎসাহের ঘাটতি ছিল তা'বলাই বাহুল্য। যদিও যতো দীর্ঘ সময় ধরে যুদ্ধ চলবে বলে ভেবেছিলাম, বাস্তবে যুদ্ধ তার চেয়ে অনেক বেশি দীর্ঘায়িত হয়েছিল যার জন্য আমাদের অর্থনৈতিক ক্ষমতার ওপরে প্রচণ্ড চাপ পড়েছিল। তবু আমি নিশ্চিত জানতাম যে শেষে জয় আমাদের সুনিশ্চিত।

ক্রমাগত আমাদের আক্রমণ শত্রুপক্ষকে নাস্তানাবুদ করে ছেড়েছিল। সমস্ত দুঃখ কষ্ট সত্ত্বেও ইতালিয়ান সৈনিকদের মধ্যে চরম শৃঙ্খলাবোধ ছিল। সেই শৃঙ্খলায় কখনো এতোটুকু ঘাটতি পড়ে নি। খামতি হয় নি। ১৯১৬ সালে আল্পস পাহাড়ের উপত্যকায় শত্রু আক্রমণ শুধু বিফল করে দেওয়া হয় নি, ওরা চরম পর্যুদস্তও হয়েছিল। বিশেষ করে যে সৈন্যদলে আমি ছিলাম, সেই কার্সোর সৈনিকরা তো প্রচণ্ড দক্ষতায় অতি অভিজ্ঞদের মতো লড়াই করেছিল।

অবশ্য সেই বিশাল নাট্যমঞ্চে যেখানে আমাদের হাজার হাজার ভাইয়ের মৃত্যু ঘটেছে, সেখানে বিচ্ছিন্নভাবে এক আধজনের বিষয়ে বলাটা সম্ভব নয়।

যাইহোক ইতালিয়ান রাজনৈতিক জীবনে যে ঘূণ ধরেছে—সেটা জানানোর জন্য বাধ্য হয়ে আমাকেই আমার সম্পর্কে লিখে জানাতে হয়েছে। যাতে যাদের মনে সন্দেহ ছিল যে কোন অফিসে লুকিয়ে থেকে আমি চিঠিপত্র বিলির কাজ করেছি এবং এই যুদ্ধে বিজয় সম্পর্কে আমার মনেই দ্বিধা ছিল, এই ধারণা ভাঙা যায়। আর এই ধারণা ভাঙতে গিয়ে বারবার আমাকে জানাতে হয়েছে যে তখন আমি কি করেছি। এবং আগেই বা কি করতাম। বারসেগেলিয়েরীতে তখন আমি মেজর-কর্পোরাল এবং সামনের সারির ট্রেঞ্চে যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকে ১৯১৭ সালের ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত সমানে আস্থা রেখেছি এবং জয়ী যে হবো এই বিশ্বাসের জমি থেকে এক ইঞ্চিও নড়ি নি। মাঝে মাঝে আমাদের সীমাহীন প্রতিরোধ নিয়ে পোপোলো দ্যা ইতালিয়াতে প্রবন্ধও লিখেছি। সব সময় সেই সব প্রবন্ধে বলেছি যে আমাদের জয় সুনিশ্চিত। সামরিক শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য আমি নম দ্য প্লামে বক্তৃতা

দিয়েছি। সুতরাং আমাকে দু'ভাবে শক্রর সঙ্গে লড়তে হয়েছে। এক সামনের শত্রু, আর পেছনের শত্রু যারা সব সময় আমাদের জেতার উৎসাহে জল ঢালতে ব্যস্ত ছিল।

১৯১৭ সালের ২২শে ফেব্রুয়ারীর সকালে সেক্টর একশো চুয়াল্লিশের একটা শত্রুপক্ষের ট্রেঞ্চে প্রচণ্ড বোমাবর্ষণ করি। আমরা তখন কিন্তু কার্সোর ট্রেঞ্চে বসে। সেই দিনেই ঘটনাটা ঘটেছিল। অবশ্য এই ধরনের ঘটনা ট্রেঞ্চে অহরহ-ই ঘটতো বলা চলে। আমাদেরই একটা হ্যান্ড গ্রেনেড ট্রেঞ্চের মধ্যে হঠাৎ ফেটে যায়। আমরা প্রায় কুড়িজন সৈনিক তখন ট্রেঞ্চের ভেতরে। মুহূর্তে ধুলোবালি এবং ধাতুর টুক্‌রোয় আমরা প্রায় ঢাকা পড়ে যাই। চারজন মারা যায়। বাকীরা সাংঘাতিক ভাবে আহত হয়।

শত্রুপক্ষের ট্রেঞ্চের থেকে কয়েক মাইল দূরের রন্‌চি হাসপাতালে আমাকে নিয়ে যাওয়া হয়। ডাক্তার পিকাগনি এবং অন্যান্য সার্জেনরা যতোখানি সম্ভব আমার প্রতি যত্ন নেয়। আমার আঘাত যে অত্যন্ত গুরুতর ছিল তা'তে সন্দেহ নেই। ধৈর্য এবং কুশলতার দরুণ সার্জেনরা আমার দেহ থেকে চব্বিশটা গ্রেনেডের টুক্‌রো অপারেশন করে বার করে। শরীরের বহু জায়গার মাংস ছিন্নভিন্ন হয়ে গিয়েছিল অনেক জায়গার হাড়ও ভেঙেছিল। প্রচণ্ড ব্যথায় তখন ছটফট করছি ; অসহ্য যন্ত্রণা। সব অপারেশনগুলোই কিন্তু করা হয়েছিল অ্যানাথিসিস ছাড়া। এক মাসের মধ্যে সাতাশটা অপারেশন করা হয়েছিল। দু'টো অপারেশন ছাড়া বাকীগুলোর বেলায় আমাকে মোটেই অ্যানাথিসিস করা হয় নি।

রন্‌চি হাসপাতালের একটা দিক আর মূল বাড়ির কিছুটা অংশ যতোদিন না বোমাবর্ষণে ধ্বংস হয়ে যায়, ততোদিন পর্যন্ত এই নারকীয় যন্ত্রণা আমাকে ভোগ করতে হয়েছে। ক্ষতস্থানগুলোর যন্ত্রণা দূরে পালিয়ে গেলেও আমার শারীরিক অবস্থা এমন ছিল না যে আমাকে অন্য কোন হাসপাতালে সরানো যেতে পারে। যার জন্য বেশ কয়েকদিন শত্রুপক্ষের অবিরত গোলাবর্ষণ আর ধ্বংসস্তূপের মধ্যেই আমাকে পড়ে থাকতে হয়েছিল। আত্মরক্ষা করার কোন উপায়-ই তখন আমার ছিল না।

এতো লাঞ্ছনা সত্ত্বেও আমার আঘাতগুলো সারতে শুরু করে। সুদিনের সঙ্গে সঙ্গে স্বস্তিও ফিরে আসে। আমি যে আমার আঘাত প্রাপ্তির জন্য উদ্বিগ্নভরা অসংখ্য টেলিগ্রাম পেয়েছিলাম, তার মধ্যে রাজার টেলিগ্রামও ছিল। যুদ্ধে আহত এবং নিহত সৈনিকদের প্রতি ওঁর আন্তরিক সমবেদনা আমি তো না-ই, সারা ইতালি-ই কখনো ভুলতে পারবে না।

কয়েক মাস পরে আমাকে মিলানের সামরিক হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। আগস্ট মাসের শুরুতে ক্র্যাচ্ নিয়ে চলাফেরা করতে আরম্ভ করি। বেশ কয়েক মাস এই ক্র্যাচে ভর দিয়েই আমাকে চলাফেরা করতে হয়। আমার শরীরের ওজন দুর্বল পা দু'টো তখন আর বহন করতে পারতো না।

পত্রিকা অফিসে সংগ্রামী হিসেবেই আমি আবার আমার টেবিলে এসে বসি। রাশিয়া সীমান্তে সেনাবাহিনীর ব্যর্থতা আমাদের ওপরে নতুন দায়িত্বভার চাপিয়ে দেয়। কারণ রাশিয়ার সীমান্তে আবার আমাদের সৈন্যদের মুখোমুখি দাঁড়ানোর প্রয়োজন পড়ে। তার ওপর দেশের মধ্যে অপপ্রচারের বন্যা তো ছিলই। পার্লামেন্টের সোশ্যালিষ্ট সদস্যদের গোপন শ্লোগান ছিল—শীত আসার আগেই ট্রেঞ্চ ফাঁকা হয়ে যাবে।

সাধারণ লোকের লাঞ্ছনা এবং অনুভূতি নিয়ে দেশের মধ্যে যে খেলা চলেছে ; সেই রহস্যময় শক্তির বিরুদ্ধে যে করেই হোক রুখে দাঁড়াতে হবে। সৈনিকরা পনেরো দিনের ছুটি কাটিয়ে ব্যথিত মনে তখন ট্রেঞ্চে ফিরে আসছে। শহরের জীবন যতোরকম সম্ভব যুদ্ধের বিরোধিতা করে চলেছে। এই সময় কিন্তু লোকেদের মনে যতোখানি সম্ভব সাহস জোগানোর দরকার ছিল। এবং তারজন্য এই ব্যাপারে সরকারের এক পায়ে খাড়া হওয়া উচিত।

বলাবাহুল্য ব্যাপারটার পোস্টমর্টমে আমি উৎসাহী ছিলাম না। ১৯১৭ সালের আভ্যন্তরীণ রাজনীতির দুর্বলতা, পার্লামেন্টের ক্ষীণ কণ্ঠস্বর, ঘৃণিত সোশ্যালিষ্টিক প্রচার ইত্যাদি সমগ্র ইতালিকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাচ্ছিলো। এবং আরো বড় আঘাত এসে পড়েছিল ১৯১৭ সালের অক্টোবর মাসে ; কাপোরেত্তোর পতন ঘটে।

আমার জীবনে একজন ইতালিয়ান বা রাজনীতিবিদ হিসেবে কাপোরেত্তোর পরাজয়ের সংবাদ আমি কিছুতেই মেনে নিতে পারি নি।

মহাযুদ্ধে বিভিন্ন ফ্রন্টে পরাজয়ের কাহিনী কিন্তু এই ঘটনাটার ব্যতিক্রম নয়। তবে ইতালিয়ানদের পক্ষে বিশেষ করে এই পরাজয়টা যে মুহ্যমান করে দিয়েছিল তা'তে সন্দেহ নেই। সীমান্তের এই হঠাৎ হাওয়া ফাটল দিয়ে শত্রুসৈন্য ইসানজো'র উঁচু উপত্যকায় ঢুকে পড়ে। যুদ্ধের প্রথম ধাক্কায় পুরনো অষ্ট্রিয়ার সীমান্ত পেরিয়ে অনেকটা ভেতরে ঢুকে পড়েছিল আমাদের সেনা বাহিনী। যাতে শত্রু-জমিতে যুদ্ধটা হ'তে পারে। ১৯১৬ সালে এমিয়াগো আল্পসের আক্রমণ আমাদের সেনাবাহিনী জোরদার প্রতিরোধ করেছিল। বাইনসিজার অধিত্যকাও আমরা অধিকার করে নিয়েছিলাম। ইসানজো'তে আমাদর পরাক্রম দশগুণ বেশি ছিল। আমাদের অনুভব এবং শত্রু পক্ষের ব্যূহ ভেদ করার শক্তিটাই যেন প্রচণ্ডভাবে নাড়া খেয়ে গেছে।

মুহূর্তগুলো ভয়াবহ। ইসানজো'কে উল্টোদিক থেকে তৃতীয় সামরিক বাহিনীর ঘেরাওকে মুক্ত করতেই হবে। ব্যাপারটা সেনাবাহিনীকে যে কোন মূল্যে উত্তেজিত করে পিয়েভে দাঁড়িয়ে মাউন্ট গ্রাপেকে রক্ষা করার পক্ষে যথেষ্ট। কারণ নইলে বাকী ইতালি থেকে ভেনিসিয়ান প্রদেশগুলো বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে। ছত্রভঙ্গ সৈন্যদলকে একত্রিত করে প্রায় সঙ্গে সঙ্গে অগ্রসর হয়ে যথাস্থানে দ্রুত পৌঁছে যায় সেনাবাহিনী। মাউন্ট গ্রাপেকে ইস্পাত — দৃঢ়তার সঙ্গে রক্ষা করে। পিয়েভেকে পাশ কাটিয়েও শত্রু সৈন্য আর অগ্রসর হ'তে পারে না। আমাদের সৈন্যদলের ভেতরে নতুন এক প্রাণের উন্মাদনা যেন জোয়ার আনে। যে কারোর পক্ষেই তা' বোঝা কষ্টকর ছিল না। এই উন্মাদনাই যুদ্ধের গতিতে মোড় ঘোরায়। গরিজিয়া এবং অন্য দু'টো প্রদেশ বালুনা আর উধিনে হাতছাড়া হওয়ার পর আবার আমাদের সৈন্যদল শত্রুসৈন্যের মুখোমুখি দাঁড়ায়। তখন কিন্তু আমরা গভীরভাবে আহত এবং নাটকীয় সেই মুহূর্তগুলোয় আমাদের হৃদয়ও ছিন্নভিন্ন হয়ে গিয়েছিল। তবে তখন আমাদের একমাত্র চিন্তা ছিল যে বহু সৈন্য এবং দেশের ভাগ্যে যে চরম লাঞ্ছনা জুটেছে, ইতালির বা সৈন্যদলের কপালে যেন সেটা আর না জোটে। মহাযুদ্ধে আমাদের চরম ক্ষয়ক্ষতি, তিনটে প্রদেশ হাতছাড়া এবং মাসুর লেকের কাছের যুদ্ধ, কোয়েনিগস্‌বার্গে হানা — ফ্রান্সের চৌদ্দটা সমরাস্ত্র বাহিনী এবং বেলজিয়ামে তখন যেন শত্রুসৈন্যের বন্যা বয়ে গেছে।

সেই আতঙ্কগ্রস্থ মুহূর্তগুলোয় আমার সংবাদপত্র কিন্তু দেশের রাজনৈতিক জীবনকে

জোরদার-ই করেছে। আমাদের সৈন্যদলের সংগ্রামী মনোবল বাড়াতে যথেষ্ট সাহায্য করেছে পত্রিকাটা।

অঙ্গচ্ছেদ হওয়া, আহত এবং যুদ্ধের স্বপক্ষে লড়া প্রায় বৃদ্ধ মানুষগুলোর সহযোগীতায় যুদ্ধ শেষ করার স্বপক্ষে জোরদার প্রচার কার্য চালাই।

অগ্নিক্ষরা ভাষায় কেন্দ্রীয় সরকারকে কুঁড়ে এবং যারা যুদ্ধ করার ইচ্ছায় জল ঢেলে দিতে চায়, তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিতে বলি। বারবার সৈন্যদলের ভেতরে স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী তৈরি করতে অনুরোধ জানাই। ইতালির উত্তর অংশে সামরিক শাসন ব্যবস্থা কায়েম করার দাবী করি। সোশ্যালিষ্ট সংবাদপত্রগুলোকে বন্ধ করার আওয়াজও তুলি। বারে বারে বলি সৈনিকদের প্রতি যেন আরো বেশি মানবত্ব দেখানো হয়। যুদ্ধে শৃঙ্খলা বজায় রাখার ব্যাপারটা নিয়েও কম প্রচার করি নি। সারা দেশে এবং ফ্রন্টে। প্রথমে সংবাদপত্রে, তারপরে জনসাধারণের সভায়। শেষে ফ্রন্টে যুদ্ধরত সৈন্যদলের জমায়েতে। বলতে দ্বিধা নেই ব্যাপারটাতে আশাতীত কাজ দেয়। হ্যাঁ, যা আমি ভেবেছিলাম তার চেয়ে অনেক বেশি। আমাদের প্রচেষ্টা, প্রতিরোধ এবং বিজয় যাত্রার পেছনে পেছনে সরকারকে যেন গুণ টেনে এগিয়ে নিয়ে যাই।

এইভাবেই শীতকালটা কাটে। বসন্তের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে ইতালির জনগণ তাদের সমস্ত উৎসাহ উদ্দীপনা নিয়ে পিয়েভে এবং গ্রেপা সীমান্তের দিকে দৃষ্টি ফেরায়।

শেষ পর্যন্ত একটা জাতীয় একাত্মবোধ সৈন্যবাহিনী এবং তাদের পরিবার পরিজনদের মধ্যে গভীর ভাবে জেগে ওঠে। চরম কর্তব্যবোধ আর দেশের কারণে নিজেকে উৎসর্গবোধ ইতালির জন জীবনকে ভীষণভাবে অনুপ্রাণিত করে।

১৯১৮ সালে পিয়েভের শিখরচূড়ায় আমরা তখন প্রস্তুত। আরদিতি অর্থাৎ প্রথম ঝটিকা বাহিনী স্বেচ্ছাসেবকদের সমন্বয়ে গড়া গ্রেনেড আর ছোরা নিয়ে তৈরি—যারা তাদের নাটকীয় আবেদনের মাধ্যমে আমাদের মধ্যে আক্রমণাত্মক উত্তেজনা ছড়িয়ে দিয়েছিল। প্রত্যেকের মধ্যে তখন কাপোরেটোরের স্মৃতি মুছে ফেলতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। হ্যাঁ, আমাদের সেখানে ফিরে যেতে হবে; যেখানে আমাদের মৃত এবং জীবিত ভাইয়েরা আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে। বিশেষ করে মৃতদের স্মৃতি যেন অহরহ আমাদের হাতছানি দিয়ে ডেকে চলে। স্বাভাবিক ভাবেই আমাদের প্রতিপক্ষ পিয়েভে পার হ'তে দিতে নারাজ। তবে তা' ওদের অলস চিন্তা যা আমাদের আক্রমণ দিয়ে তছনছ করে দিয়েছিলাম।

আমাদের বোমারু বিমানগুলো শত্রুপক্ষের ঘাঁটিগুলোকে খুঁজে বের করে প্রচণ্ডভাবে বোমাবর্ষণ করতে শুরু করে। আমি বুঝতে পারি যে ইতালির আত্মা ইতিমধ্যে বিজয়ের পথ ধরে হাঁটতে শুরু করেছে। চমৎকার মেধা সম্পন্ন মস্তিষ্কগুলোকে প্রয়োজনে আরো ধার দিয়ে ধারালো করে তুলেছে। শেষমেষ জুন মাস এসে হাজির হয়। আর শত্রুপক্ষের আক্রমণও তীব্র আকার ধারণ করে।

আমাদের সামরিক গোয়েন্দা বিভাগ কিন্তু সাফল্যের সঙ্গে জানিয়ে দিতো যে শত্রুপক্ষ কখন কোন্‌দিক থেকে আক্রমণ হানবে। আর আমাদের যুদ্ধ পরিকল্পনার ছক এতো চমৎকার ভাবে কাটা হয়েছিল যে শত্রুর আক্রমণের ঘণ্টা কয়েক আগেই আমাদের সেনাবাহিনী গিয়ে

শুধু শত্রুবাহিনীর ওপরেই ঝাঁপিয়ে পড়তো না, পেছনের সাপ্লাই লাইনটাকেও ছিঁড়ে টুক্‌রো টুক্‌রো করে ফেলতো। এক কথায় গোয়েন্দা বিভাগের সহযোগিতায় আমাদের সেনাবাহিনী শত্রুপক্ষকে একেবারে বিধ্বস্ত করে দিয়েছিল। পিয়েভের ওপর দিয়ে যতোগুলো সেতু শত্রু সৈন্যের দল তৈরি করার চেষ্টা করেছিল ; আমাদের সৈন্যরা সব ক'টা সেতুকে ধ্বংস করে দিয়েছিল। সুল-মনটেলো—সীমান্তের সবচেয়ে মূল্যবান ঘাঁটি, যাকে শত্রুপক্ষ আমাদের সেনাবাহিনীর ওপরে সাঁড়াশি হিসেবে ব্যবহার করতে চেয়েছিল। কিন্তু আমরা কুকুরের মতো ধৈর্য নিয়ে তা' রক্ষা করি। কয়েক মাইল আগে পিছে হটলেও যুদ্ধ ক্রমাগত চলতে থাকে। একবারের জন্যও তা'তে বিরতি পড়ে নি। আমরা সমানে প্রতি আক্রমণ করে গেছি। প্রথম তিনদিন যুদ্ধের পরে শত্রুপক্ষ বোঝে ইতালির সৈন্যদলের এই শক্ত প্রাচীর ভাঙা সম্ভব নয়। এমন কি সেই প্রাচীরে ফাটল ধরিয়ে ফোকর বার করাও অসম্ভব।

জেনজনের কাছাকাছি শত্রুপক্ষ মোনাষ্টি অফ ট্রিভিসোতে নদী পার হ'তে সমর্থ হয়। কিন্তু ঝটিকগতিতে আমাদের প্রতি আক্রমণে আবার শত্রুপক্ষকে ঠেলে দেওয়া হয় পিয়েভেতে। শত্রুসৈন্যের পক্ষে ব্যাপারটা বিধ্বংসীকারক হয়ে দাঁড়ায়। নদীতে বন্যা আসায় সেতুগুলো এবং সঙ্গে সঙ্গে শত্রুসেনাদেরও ভাসিয়ে নিয়ে যায় মহাসমুদ্রের দিকে। ২৩শে জুন অর্থাৎ ভয়ানক যুদ্ধ শুরু হওয়ার পাঁচ দিন পরে আমাদের সুপ্রীম কমাণ্ড ইতালির জনসাধারণকে আশ্বস্ত করে যে আমাদের প্রতিরোধ ক্ষমতায় কোনরকম ফাটল নেই। আমি বুঝতে পারি যে বিজয় আমাদের হাতের মুঠোয় এসে গেছে। ব্যক্তিগত ভাবে আমি মনে করি যে পিয়েভের যুদ্ধ প্রথম মহাযুদ্ধের মধ্যে অন্যতম চূড়ান্ত পর্যায়ের যুদ্ধ হিসেবে পরিগণিত।

শত্রুপক্ষের যে ক্ষতি এই যুদ্ধে হয়েছিল, কোনরকমেই ওদের পক্ষে তা' পূরণ করা সম্ভব ছিল না। পিয়েভের যুদ্ধে প্রায় এক লক্ষ হাঙ্গেরীয়ান সৈন্য নিহত হয়। যা বুদাপেস্তে এই যুদ্ধের প্রতি হাঙ্গেরীয়ান জনগণের মধ্যে চরম বিদ্বেষ জাগিয়ে তোলে। অষ্ট্রিয়ান সাম্রাজ্যে বিভিন্ন জাতিদের মধ্যে আলোচনা শুরু হয়ে যায় যে এই সাম্রাজ্যকে রক্ষা করতে গিয়ে প্রত্যেক জাতিকে কি ভীষণ সংখ্যায় নিজেদের লোককে বলিদান দিতে হচ্ছে। যার জন্য প্রত্যেক জাতি-ই মনে করে যে ব্যাপারটা সহ্যের শেষ সীমায় এসে পৌঁছে গেছে।

অষ্ট্রিয়া এবং হাঙ্গেরী থেকে এই বিষয়ে গোপন সূত্রে আমরা নিয়মিত খবরাখবর পেতে থাকি। যাতে পরিষ্কার বুঝতে পারি যে প্রতি মুহূর্তে ওদের অন্তর্দ্বন্দ্ব বেড়ে চলেছে। শত্রুসেনাদের তবু কোনরকমে একত্রে ধরে রাখার কাজটা ওরা করে যাচ্ছিলো। বিশেষ করে আমাদের যে দু'টো প্রদেশ দুর্ভাগ্যবশত তখন পর্যন্ত ওদের পদানত—সেই প্রদেশ দু'টোর লোক জনের ওপরে শত্রুসৈন্য অকথ্য অত্যাচার চালাচ্ছিলো।

জয়ের নেশায় সকলে যখন উৎফুল্ল এবং মশগুল, ঠিক তখনই নজরে পড়ে ইতালির রাজনৈতিক জগতের কিছু বিচিত্র কাজকর্ম। শয়তানদের কাজ তখন শুরু হয়ে গেছে। প্রয়োজন তখন সেই শয়তানদের কাজকর্মগুলো জনসাধারণের কাছে প্রকাশ করে দেওয়া। যাতে ওদের দমন করা যায়। মানবত্বের মোড়কে মোড়া এই কাজকর্মগুলোকে হঠাৎ শয়তানি বলে ধরা যায় না। রাজনৈতিক নক্ষত্ররা তখন ইতালির জনগণকে বেশ কিছু জাতীয় অধিকার দিতে উঠে পড়ে লাগে—সেই ইতালির জনগণকে যারা শতাব্দী ধরে অষ্ট্রিয়ার অধীনে থাকায় ইতালির জাতীয় চরিত্র-ই হারিয়ে ফেলেছে। হ্যাঁ, দীর্ঘদিন স্বেচ্ছাচারে নির্যাতিত হওয়ার ফলে।

জয়ের সূর্য তখন উঠতে আরম্ভ করেছে, কিন্তু বিজয়ী সেনারূপে ভিয়েনার রাস্তায় মার্চ করার জন্য এই মিথ্যা আবেগ সৃষ্টির প্রয়াসের কোন প্রয়োজন ছিল না।

এই টানা পোড়ানির পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে তথাকথিত বিখ্যাত লোকেরা বস্তাপচা জঙ্ ধরা গণতন্ত্রের আদর্শ ধূলোভর্তি র‍্যাক থেকে টেনে বের করে জাতিগত বিদ্বেষ আরো চাগিয়ে তোলে। এই তথাকথিত বিখ্যাত লোকেরা সব সময় আমাদের চরম শত্রুদের পৃষ্ঠপোষকতা করে এসেছে। বিশেষ করে জাতীয়তাবাদী ধ্যান-ধারণাকে ওদের কার্যকলাপ দ্বারা শুধু আক্রমণ-ই করে নি, ছেঁটে বামুনের পর্যায়ে নিয়ে গিয়ে দাঁড় করিয়েছে। যা আমাদের আইনত প্রাপ্য সেই প্রার্থিত বস্তুতে থাবা মেরেছে। এইসব ব্যাপার দেখে শুনে ইতালির লোকেরাও বলতে শুরু করেছে যে যখনই ইতালি তার বিজয়ের পথে পা রেখেছে, হৃত গৌরব উদ্ধার করার রাস্তার প্রায় শেষ পর্যায়ে এসে পৌঁছে গেছে, তখনই তথাকথিত এই মহাপুরুষের দল সেই আন্দোলনকে বিপথে চালনা করেছে। হ্যাঁ, কোন সৎ উদ্দেশ্য নিয়ে নয়।

গ্রীষ্ম শেষ হয়ে আসে ১৯১৮ সালের অক্টোবর মাসে আমাদের সুপ্রীম কমাণ্ড একান্ন ডিভিসন ইতালিয়ান সৈন্য এবং তার সঙ্গে তিন ডিভিসন বৃটিশ, দু'ডিভিসন ফরাসী এবং এক রেজিমেন্ট আমেরিকান আর কয়েক ডিভিসন চেকোশ্লাভাকিয়ান স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী নিয়ে অষ্ট্রিয়ার সীমান্ত বাহিনীকে চূড়ান্তভাবে আঘাত হানে।

পরিকল্পনাটা যে চমৎকার ছিল সেই বিষয়ে সন্দেহ নেই। শত্রুবাহিনীকে সারনাগলিয়াতে ভেদ করে আমাদের সেনাবাহিনী বিদ্যুৎবেগে ভেতরে ঢুকে পড়ে। বাঁদিকে ট্রেনটো, ডাইনে উধিনের দিকে আর নীচে পিয়েভেকে ঘিরে আমরা এগিয়ে যেতে থাকি। আগুনের মতো তীব্র বেগে ধাবমান আমাদের সৈন্যদের বিধ্বংসী আক্রমণ এবং অফিসারদের কর্মকুশলতা শত্রু সীমান্ত বাহিনীকে ধ্বংস করে দেয়। যুদ্ধ সংক্রান্ত বুলেটিনেই দেখতে পাওয়া যাবে কতো বিপুল সংখ্যক শত্রু সেনা আমাদের হাতে বন্দী হয়েছিল আর কি পরিমাণে বন্দুক এবং যুদ্ধাস্ত্র আমাদের হাতে এসেছিল।

অষ্ট্রিয়া-হাঙ্গেরী শেষ পর্যন্ত পরাস্ত হয়। বিশেষ করে শত্রুপক্ষের নৈ-বাহিনী তো ধ্বংস হয়ে যায়। আমাদের সেনাবাহিনী ত্রিয়েস্তাতে নেমে ট্রেনটো দখল করে।

আমাদের চূড়ান্ত জয় কিন্তু শুধুমাত্র একটা যুদ্ধে জয় করা নয়। সমস্ত ইতালি জাতির এই জয়। হাজার হাজার বছর পরে আমরা জেগে উঠি ; প্রমাণ করি আমাদের নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক শক্তির বীর্য। যুদ্ধের মধ্যেও যে আমরা বেঁচে থাকতে পারি, এই যুদ্ধে এটাই প্রমাণিত হয়। দেশের প্রতি ভালোবাসা আরো বেশি করে প্রস্ফুটিত হয়ে ওঠে। নতুন ইউরোপ গঠনে ভবিষ্যতে আমরাও যে এক ওজনদার শরিক হবো, তা'তে আর সন্দেহ থাকে না। ইতালির নতুন প্রজন্ম আনন্দে মেতে ওঠে ; শহরগুলো আবার দেশের সীমান্তের মধ্যে চলে আসে। ট্রেনটো আর ত্রিয়েস্তাতে যেসব ইতালিয়ানরা বসবাস করতো, তাদের দীর্ঘদিনের আকাঙ্খা ছিল ইতালির সীমান্তের মধ্যে আসা ; যা এতোদিনে পূর্ণ হয়। এটাই হলো আমাদের সত্যিকারের সীমান্ত। দান্তে চৌদ্দশ' শতাব্দীতে দিব্যদৃষ্টিতে যা দেখেছিলেন এবং বলে গিয়েছিলেন।

দেশের প্রতিটি গীর্জা থেকে ঘণ্টা ধ্বনি বেজে উঠে নতুন দিনকে স্বাগতম জানায়। দীর্ঘদিন

ধরে চলা যুদ্ধ-পর্ব শেষ হয়। মানুষের ওপরে চেপে বসা বোঝাটাও কিছুটা হাল্‌কা হয়ে আসে।

রাশিয়ার অর্থনীতি ধসে গেলেও এই যুদ্ধে ইতালির জয় ছিল আশাতীত। হ্যাঁ, কুঁড়ে এবং পেশাদারী দেশের শত্রু যারা ইতালির আদর্শকে ধ্বংস করে দিতে চেয়েছিল, তাদের সবরকম কার্যকলাপকে উপেক্ষা করে। প্রতিটি পরিবার যাদের কেউ না কেউ এই যুদ্ধে নিহত বা আহত হয়েছে, তারা ব্যাজ্ পড়ে। বিধবা এবং অনাথ তারা দুঃখের মধ্যেও এই ব্যাজ্ দেখিয়ে রীতিমতো গর্ব অনুভব করতো। আমরা কিন্তু তখন ট্রেনটো এবং ত্রিয়েস্তাতে পৌঁছে গেছি ; ফিউমের অর্ধেক জয় হয়েছে আর ডালমাটিয়া তখন জয়ের অপেক্ষায়।

সমস্ত ইতালির ওপরে যুদ্ধ বিজয়ের গর্ব আর প্রশান্তির আলো ফেলে। আমরা যতোদিন ধরে যুদ্ধ চলবে ভেবেছিলাম, তার চেয়ে অনেক বেশি দীর্ঘতর হয় এই যুদ্ধের স্থায়ীত্ব—যার জন্য আমাদের দেশের সম্পদের ভাণ্ডার তলানীতে এসে ঠেকে।

এই যুদ্ধ জয় আমাদের হৃদয় এবং মনকে তৃপ্তিতে ভরিয়ে দেয়। প্রতিটি ইতালির মাথা নাগরিকের গর্বে উঁচু হয়ে ওঠে। মৃতদের সম্মানে এবং জীবিতদের উজ্জীবিত করতে কর্মে মাতে। ১৯১৮ সালের অক্টোবর থেকে ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত ইতালি দিন রাত প্রচণ্ড উদ্যমে কাজ করে চলা একটা কারখানার মতো ছিল। আমাদের জাতীয় জীবনে যুদ্ধ যেন কবিতার মতো গভীরভাবে বসে যাওয়া বিষাদের সৃষ্টি করেছিল। আমি ছাড়া এই পরিস্থিতির ভালো দিকটা সম্ভবত কেউ-ই কল্পনা করতে পারে নি।

এই ঐতিহাসিক মুহূর্তে আমাদের নবীন প্রজাতি, যারা আমেরিকার প্রজাতির থেকেও বয়েসের দিক থেকে ছোট, সময়ের ঘাত-প্রতিঘাতে যাদের মধ্যে তখনো পরিপক্কতা আসে নি, তাদের ছুঁড়ে দেওয়া হয় উত্তপ্ত অঙ্গার রাখার পাত্রে আর নৃশংসভাবে বিশ্বাসঘাতকতা করে আমাদের দেশের সম্পদ আর মানুষগুলোর সঙ্গে। যারজন্য বাধ্য হয়ে ভারসাইলেসের সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করতে হয় ইতালিকে। সেই মহাযুদ্ধে ইতালির ক্ষয়ক্ষতির তুলনা নেই। ছ'লক্ষ বাহান্নো হাজার নিহত, সাড়ে চার লক্ষ লোকের অঙ্গহানি ঘটেছিল। আর এক কোটির ওপরে আহত হয়েছিল। এই একচল্লিশ মাস ব্যাপি বীভৎস যুদ্ধে দেশের এমন একটা পরিবারও ছিল না যাদের প্রচণ্ডরকমের পারিবারিক ক্ষয়ক্ষতির মুখোমুখি হ'তে হয় নি। দশ বছর পরেও আমি জানি সেই অঙ্গহীন আহত পুরুষদের, বিধবাদের এবং অনাথদের প্রতি আমাদের দেশবাসীর বিশাল একটা অংশ শুধু সম্মান-ই জানায় নি, সম্ভ্রমও করে এসেছে প্রতিদিন।

হ্যাঁ, আমি কখনোই ভুলবো না। আমাদের রাজনৈতিক জীবনে হাজার বার অন্তর্ঘাত হয়েছে; বিপথে ঠেলে দিয়েছে সেই মাথা চাড়া দিয়ে ওঠার প্রচেষ্টাটাকে। মাউন্ট স্টেলভিও থেকে সমুদ্র পর্যন্ত যে অসংখ্য সমাধি ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে— সেগুলো আমাদের জাতির ভবিষ্যৎ দুর্গ প্রাকারের মতো রক্ষা করে চলেছে। না, এগুলোকে আমি কিছুতেই ভুলতে পারি না।

যুদ্ধ সম্পর্কে আমি প্রচন্ডরকমের বিশ্বাসী ছিলাম। একজন ইতালিয়ান এবং সৈনিক হিসেবে উষ্ণ হৃদয় নিয়েই আমি যুদ্ধ করতে গেছি। কারণ স্থির বিশ্বাস ছিল যে এই যুদ্ধে আমরা জয়ী হবোই। এমন কি যুদ্ধ পরবর্তী অশান্ত সময়েও মনের দিক থেকে সেই বিশ্বাস

আমি হারাই নি। কিন্তু সুখ অথবা দুঃখ—প্রতিটি ঘটনার সময়েই আমি পাথরের মতো অচঞ্চল, বাতিঘরের মতো উজ্জ্বল ছিলাম। সেই দুঃসময়েও যারা প্রয়োজনে উপদেশ নিতে আমার কাছে এসেছে, তাদের আমি ফেরাই নি। বিশেষ করে যুদ্ধক্ষেত্রে নিহতদের স্মৃতি সব সময়ে আমাকে প্রতিটি ব্যাপারে উজ্জীবিত করে রেখেছিল। আমার কাছে সবাই আসতো -- ইতালির প্রতিটি প্রদেশ, সব ধরনের জীবিকা সম্পন্ন, এমন কি বিদেশে বসবাসকারী ইতালিয়ান বা বিদেশ ছেড়ে সদ্য আসা আমার দেশবাসী। ওরা এই যুদ্ধে ওদের রক্ত দিয়েছে ; এমন কি দেশের জন্য প্রাণ পর্যন্ত উৎসর্গ করতে রাজী ছিল। যতোদিন পর্যন্ত না নিজের জাতি অপর জাতিবর্গের ওপরে প্রভুত্ব করতে না পারে, ততোদিন পর্যন্ত দেশের জন্য যারা রক্ত দিয়েছে, মৃত্যুবরণ করেছে—তাদের জন্য সম্ভ্রম দেখানো প্রতিটি নাগরিকের সুমহান দায়িত্ব। কারণ যুদ্ধ তাদের দেহ, মন এবং আত্মার ওপর দিয়েই ঝড়ের গতিতে এগিয়ে গেছে।

সর্বোপরি বর্তমান প্রজন্মকে মানবতার পথ তারাই দেখিয়েছে।

।। জ্বলন্ত অঙ্গার এবং ছাই।।

যুদ্ধের অগ্নিশিখাটা কাঁপতে কাঁপতে এক সময় দপ করে নিভে যায়।

কিন্তু ১৯১৯ এবং ১৯২০ সালের যুদ্ধের ঠিক পরবর্তী দিনগুলো আমার কাছে ইতালির জীবনের সবচেয়ে অন্ধকার এবং দুঃখময় বলে মনে হয়েছে। আমার একতাবদ্ধ হওয়ার প্রতিশ্রুতির আকাশে তখন ঘন কৃষ্ণবর্ণ মেঘ ঝুলে আছে। ইতালির সংঘবদ্ধ হওয়ার প্রচেষ্টাটাই যেন সজোরে ধাক্কা খায়। আমি মানস চোখে ইতালির আকাশের ঈশানকোণে ঝড়ের সংকেত দেখতে পাই।

ইতিমধ্যে অবশ্য অশান্তিময় ঘটনাগুলো আমাদের জাতীয় জীবনকে ছিন্নভিন্ন করে দিয়েছে। তার জন্য অর্থনৈতিক অবস্থার চেয়ে রাজনৈতিক ঘটনা প্রবাহ-ই বেশি দায়ী। ১৮৯৪ সালের সিসিলিয়ান গাসাইয়ে এবং ১৮৯৮ সালের মিলানের রক্তাক্ত আন্দোলন তবে এগুলো ছিল স্থানীয় বিক্ষোভ মাত্র। অবশ্য একটা বিক্ষোভও কিন্তু ইতালি জাতির মধ্যে ভেদাভেদ বা বিচ্ছিন্নতার বীজ বপন করতে পারে নি। কিন্তু ১৯১৯ এবং ১৯২০ সালে যে বীজাণু ছড়ানো হচ্ছিলো, যদি সেই বীজাণু বীরত্বের সঙ্গে উৎপাটন না করা যেতো, তবে এই সভ্য ইতালিয়ান জাতটাকেই তা' কুঁড়ে কুঁড়ে খেয়ে ফেলতো।

সব ব্যাপারগুলো আবার আলোচনার মাধ্যমে ফিরে আসে। ইতালিয়ানরা রাজনৈতিক সমস্যাবলীর বাক্সো খুলে বসে। মুকুট থেকে পার্লামেন্ট, সেনাবাহিনী আর আমাদের উপনিবেশগুলো, ধনতান্ত্রিক সম্পদ থেকে সোভিয়েত রাশিয়ার কম্যুনিষ্ট ধাঁচের শাসন ব্যবস্থা, স্কুল আর পোপের পদমর্যাদা ইত্যাদি সব বিষয়-ই সেই আলোচনার মধ্যে ওঠে। আহত হয়ে যারা স্বপ্ন দেখছিল যে ১৯১৮ সালের বিজয়ের পর নতুন ভিতে নবীন এক জাতি গড়ে উঠবে—সব স্বপ্ন তাদের টুক্‌রো টুক্‌রো হয়ে যায়। আদর্শবাদীতার গাছ থেকে পাতাগুলো খসে খসে মাটিতে পড়ে।

আমার কেন যেন মনে হয়েছিল যে একত্রিত হয়ে কাজ করার শক্তি আমাদের মধ্যে আর

নেই। বীরত্ব, স্মৃতির পেছুর টান, রাজনৈতিক দার্শনিকতা যা এইসব সমস্যাগুলোকে পেরিয়ে গিয়ে যে যে কারণে আমরা ধ্বংসের পথে চলেছি, তা রোধ করতে পারে। ধ্বংস এবং অবক্ষয়ের বার্তা আমার কাছে অনেক আগেই পৌঁছেছিল।

যুদ্ধের সময় সোস্যালিষ্টদের কাজকর্ম থমকে গিয়েছিল ; কিন্তু ১৯১৯ সালের জানুয়ারী মাসে ওরা আবার নড়ে চড়ে বসে। যুদ্ধ বিরতির সন্ধি পত্রের কালি শুকোতে না শুকোতেই ওরা ওদের বিদ্রোহত্বক কাজকর্ম শুরু করে দেয় ; ব্ল্যাকমেলিং করতে আরম্ভ করে। মিলান থেকে সোশ্যালিষ্ট মিউনিসিপ্যালিটি ভিয়েনাতে স্বেচ্ছাসেবকের একটা দল পাঠায় যাতে তথাকথিত ভাইদের তারা সাহায্য করতে পারে। রুগ্ন আন্তর্জাতিকতা এই বিবর্ণ বসন্তে আবার ফুলের কুঁড়ি থেকে ফুল ফোটানোর চেষ্টা করে। ত্রিয়াস্তে সোশ্যালিষ্টরা শহরটাকে ঢেলে অন্যভাবে সাজানোর প্রয়াসে মুখ্য ভূমিকা নেয়। অগ্রবর্তী এই উদাহরণের জন্য ইতালির অনেক শহরে পুরোন শত্রু অষ্ট্রিয়া এবং হাপুসবুর্গ ছেলেমেয়েদের প্রতিও একই ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। ব্যাপারটা যে কতো আবেগময় তা'তে সন্দেহ নেই। এটা আমাদের স্মৃতি থেকে বিজয় পর্বের রেখাটা মুছে দেওয়ার আপ্রাণ প্রচেষ্টা।

আমি জানি আমাদের অধঃপতনের ধসটাকে পেছন থেকে কারা ঠেলে দিয়েছিল। জার্মান এবং অষ্ট্রিয়ার গুপ্তচর, রাশিয়ার বিক্ষুব্ধরা আর রহস্যজনকভাবে যারা সরকারের সাহায্য পেতো, তারা। তাদের কয়েক মাসের নেতৃত্বে ইতালির জনসাধারণ যেন ধ্বংসের জন্য খাদের মুখে এসে দাঁড়ায়। সারা পৃথিবী জুড়েই যখন অর্থনৈতিক টানা পোড়ানি চলেছে, তখন ইতালি আর তার বাইরে থাকবে কি করে! আমার মতো সৈনিকরা যুদ্ধক্ষেত্র থেকে ফিরে এসেই দুর্গত পরিবারের সাহায্যার্থে ছোটে। আমাদের মানসিক অনুভূতি তখন সম্ভবত কারোর পক্ষেই বর্ণনা করা সম্ভব নয়। ওপর থেকে জোর করে চাপিয়ে দেওয়া ব্যাপারটা লক্ষ লক্ষ লোককে অস্থিরতার অন্ধকারে ছুঁড়ে দেয়। শৃঙ্খলা রক্ষার প্রশ্ন-ই আর আসে না। তখন আমাদের সামনে শীতের তীব্র কামড় থেকে লোকজনদের বাঁচাতে, জামাকাপড় জোগাড় আর শান্তি বজায় রাখার প্রচেষ্টায় পাগল হওয়ার জোগাড়।

যখন দেখতাম আমাদের গৌরবময় সৈনিকদের রেজিমেন্ট পতাকা নিয়ে বাড়িতে ফিরছে, কিন্তু তাদের সম্মান জানানো দূরে থাক—যুদ্ধে জিতে ঘরে ফেরার জন্য যেটুকু জয়ধ্বনি প্রাপ্য তা'ও দেওয়া হ'তো না ; তখন নিজেদেরও লাঞ্ছিত এবং অপমানিত বোধ হ'তো। আমার এবং আমার বন্ধুদের ব্যাপার স্যাপার দেখে মনে হ'তো যে প্রত্যেকে যুদ্ধে জেতার জন্য যতোটা না ব্যাগ্র, তার চেয়ে অনেক বেশি আনন্দিত যে যতোটুকু কম সম্ভব তাকে হারাতে হয়েছে। তাদের কান এবং মন যেন জাতিদের পারস্পরিক শান্তি, মানবতা, ভ্রাতৃত্ব ইত্যাদি শব্দগুলো শোনার জন্য তৈয়ারি হয়ে গিয়েছিল। রাতে ঘুমোতে যাওয়ার আগে আমি নিয়মিত ধ্যান করতাম আর সেই ধ্যানের মাধ্যমেই বুঝতে পারতাম যে বিশ্বাসের অবক্ষয় চারিদিকেই শুরু হয়ে গেছে। এই অস্বীকৃতি ছিল একটা বিজয়ী জাতির নিয়তি। তাই ধ্বংস অতি দ্রুত সমস্ত শ্রেণীর মধ্যে তার কাজ শুরু করে দেয়। এটা নিশ্চিত ভাবে বলা যায় যে কেন্দ্রীয় সরকারের এই দুর্বলতাকে রোধ করার কোনরকম ইচ্ছেই ছিল না।

রাজনৈতিক নেতা এবং দার্শনিক, লাভবান অথবা ক্ষতিগ্রস্ত যারা, অনেকেই তখন তাদের স্বপ্ন হারিয়ে ফেলেছে। হাঙরগুলো নিজেদের বাঁচাবার চেষ্টায় ব্যস্ত। যারা জাতিকে যুদ্ধে

জড়িয়েছিল, তারা ক্ষমা পাওয়ার ফিকির খুঁজছে রাজনৈতিক নেতারা আবার তাদের হারানো জনপ্রিয়তা ফিরে পাওয়ার ব্যাপারে সচেষ্ট ; গুপ্তচর এবং বিক্ষোভকারীরা তাদের বিশ্বাসঘাতকতার মূল্য পেতে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে। দালালদের বৈদেশিক মুদ্রায় পাওনা গন্ডা মেটানো হয়েছে। কয়েক মাসের মধ্যে সমগ্র জাতিকে বিশ্রীরকমের দুর্যোগের মধ্যে ঠেলে দেওয়া হয়। চোখের সামনে দেখি জাতির এবং জনগণের সামনে সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে।

আমার হৃদয় যেন হঠাৎ ওঠা ঝড়ে উথাল পাথাল করে ; গভীর একটা অতৃপ্তি আত্মাকে জারিয়ে দেয়। বিপদের গন্ধ পাই। কয়েকজন দুঃসাহসী পুরুষ আমার সঙ্গে ছিল ; তবে বেশি নয়। মুষ্ঠিমেয়। যাইহোক বর্তমান পরিস্থিতিতে আমার প্রথম এবং প্রধান কাজ হয় এই কালো বিশ্বাসঘাতকতাকে যেমন করেই হোক প্রতিরোধ করা। মিত্রশক্তির মধ্যের কয়েকজন ইতালির নাগরিক অন্ধ এবং স্বার্থপরের মতো নিজেদের ইচ্ছেটাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে চায়। আসলে এরা কিন্তু নিজের মাতৃভূমিকেই প্রতারণা করেছে। লন্ডনের সন্ধি অনুসারে ডালমাটিয়া ইতালির মূল ভূখণ্ডের অংশ ছিল। ডালমাটিয়া বহু বছর ধরে তীব্র আকাঙ্খার সঙ্গে অপেক্ষা করছিল যে যুদ্ধ বিজয়ের পর ইতালির মূল ভূখণ্ডের সঙ্গে মিলিত হয়ে ভেনিস এবং রোমের মতো গর্বের শহরের অংশীদার হবে ; কিন্তু বর্তমানে সেই ডালমাটিয়াকে নির্মম ভাবে আমাদের একতা থেকে বিছিন্ন করা হয়েছে। পরিহারের যে রাজনীতি তা'তে বিদেশীরাও ইন্ধন জুগিয়ে আরো এগিয়ে দেয়। উইলসন ছিল এইসব তত্ত্বের পাতনযন্ত্র কারণ ইতালির জীবন-শৈলী বা ইতিহাস সম্পর্কে ওর কোন ধ্যান-ধারণা ছিল না। অজ্ঞাতে হলেও ওর সাহায্যেই এই বিষবৃক্ষের চারা মহীরুঢ় হওয়ার পথ ধরে। ফিউমে এইরকমই একটা স্বেচ্ছায় উৎসর্গীকৃত শহর। যারা ইতালির সীমার মধ্যে আমার জন্য সেই শহরের স্কোয়ারে বিশাল ভাবে জমায়েত হয়েছিল। আন্তর্জাতিক সৈন্যরা সেই শহর দখল করে নেয়। আমরা আর একটু হলে আরো একটা যুদ্ধ-উপহার হারাতে বসেছিলাম। তা'হলো অষ্ট্রিয়ান নেভী। ত্রিয়েস্তা থেকে মাত্র কুড়ি কিলোমিটার দূরে আরো একটা যুদ্ধ ফ্রন্ট খোলার জন্য আলাপ-আলোচনা তখন চলছিল।

আমি তখন বলেছিলাম যে কোন জাতির ভাগ্যে যুদ্ধ বিজয়ের পরেই এমন অস্বীকৃতি জোটে নি। ১৯১৯ সালের প্রথমদিকের মাসগুলোয় কয়েকজন রাজনৈতিক -নেতার কার্যকলাপে মনে হয় বিজয়ের আনন্দ এবং উত্তেজনাকে ধ্বংস করাটাই যেন তাদের মুখ্য উদ্দেশ্য হয়ে দাঁড়ায়। ওদের লক্ষ্য ছিল ইতালির সত্যিকারের সীমান্তকে অস্বীকার করা যাতে জাতির জন্য ন্যায্য মাটি ফিরে পেতে না পারে। তারা যুদ্ধে নিহত আমাদের ছ' লক্ষ সৈনিক এবং দশলক্ষ আহত সৈনিকের কথা বেমালুম ভুলে মেরে দিয়েছিল। সেই বিপুল সংখ্যক আহত এবং নিহত সৈন্যের উদার হাতে ঢালা রক্ত বৃথাই নষ্ট হয়েছে। এইসব নেতারা ইতালির সীমান্ত নিয়ে বিদেশী আবেগের তাড়না, সন্দেহ এবং মতবাদকে যা বিষের যাহায্যে ফেনানো—তাকেই সমর্থন করে গেছে। ওদের এই মাতৃভূমিকে হত্যার চেষ্টার সঙ্গে হাত মিলিয়েছিল কিছু বিকৃতমনা বুদ্ধিজীবি আর পেশাদার সোশ্যালিষ্ট। এবং ভবিষ্যতে ফ্যাসিষ্ট বিপ্লব এই দু'ই দলের প্রতি এতো ধৈর্য দেখিয়েছে যে তা' চরম উদারতাকেও ছাপিয়ে গিয়েছিল।

অবক্ষয়ের জানোয়ারগুলো এই সংগ্রাম ক্ষেত্র থেকে আমাকে সরিয়ে দিতে চেষ্টা করে

তখন অবশ্য আমি আমাদের সীমান্ত রক্ষার ব্যাপারে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ—যার জন্য অন্তর্দেশীয় ছোটখাটো রাজনৈতিক ঝগড়াঝাঁটি এবং নোংরামী তখন চারিদিকের পরিবেশটাকেই বিষিয়ে তুলেছে। উপরন্তু আন্তর্জাতিক মাঠে আমাদের বাজি ধরা হয়েছিল অত্যন্ত উঁচুদরে। অন্তর্দেশীয় রাজনীতিতে জানতাম যে শক্ত হাতে লাগাম ধরা সরকার শীঘ্র-ই এই সোশ্যালিষ্ট, সন্ত্রাসবাদী, ক্ষয়িষ্ণু এবং ধ্বংসোন্মুখ নেতাদের সোজা করে দিতে সক্ষম হবে। কারণ ওদের মানসিক শক্তির ক্ষমতা আমার অজানা ছিল না। সব সময় এবং প্রত্যেক যুগে এই একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হয়ে চলে। কাপুরুষ নেকড়ে এবং ক্রুদ্ধ মেষের দল একই খেলা খেলে।

শেষপর্যন্ত ১৯১৯ সালের ২৬শে ফেব্রুয়ারী রোববারে, যুদ্ধের কয়েক মাস পরে, মিলানে এমন একটা দৃশ্য দেখি যা আমি অতীতে অসম্ভব বলে মনে করেছিলাম। সোশ্যালিষ্টদের মিছিল। অসংখ্য লাল পতাকা হাতে। সঙ্গে তিরিশটা ব্যান্ড। যুদ্ধকে ধিক্কার দিতে দিতে চলেছে। স্ত্রীলোক, ছোট ছোট ছেলেমেয়ে, রাশিয়ান, জার্মান, অষ্ট্রিয়ান প্রভৃতি একটা নদীর মতো রাস্তা জুড়ে শহরের কেন্দ্রস্থলের দিকে এগিয়ে চলেছে। অ্যাম্ফি থিয়েটারের প্রাঙ্গণে জমায়েত হওয়ার জন্য। ওরা দেশ ভাগ চাইছিল।

বর্তমানের চেয়ে তখনকার দিনে শহর মিলানে কর্ম চঞ্চল একটা জাতির প্রাণ স্পন্দন খুঁজে পাওয়া যেতো। মিলান—যে শহরে আমার আদর্শগুলোকে রূপায়ণ করার জন্য এতো পরিশ্রম করেছি, ১৯১৪ এবং ১৯১৫ সালের প্রথম মাসগুলোতে যুদ্ধের জন্য সর্বদা প্রস্তুত ছিল। শহরটাতে সব সময় উজ্জীবিত জীবনের লক্ষণ দেখা যেতো। দেশের অন্যান্য প্রান্তের চেয়ে শহর মিলানেই নাগরিকরা ছিল অত্যন্ত সচেতন। যুদ্ধ প্রচেষ্টাকে সম্মানের সঙ্গে বাঁচিয়ে রাখাটাই ছিল শহর মিলানের নাগরিকদের প্রধান কাজ। আর যুদ্ধে জয়ের পর দশ হাজার স্বেচ্ছাসেবক বিশিষ্ট শহরটা যেন হঠাৎ রোগাক্রান্ত হয়ে পড়ে।

আমি যে মিছিলের কথা আগে বলেছি—তা' প্রমাণ করে যে সব শ্রেণীর লোকেরাই, বিশেষ করে অধিকতর প্রগতিশীল বা বামজোট গভীর পাঁকে ডুবতে বসেছে। মিছিলটা রাস্তা দিয়ে চলাকালীন বুর্জুয়া, দোকানদার, হোটেলের মালিকরা ত্রস্থ হাতে দরজা জানালা বন্ধ করে দেয়। তাদের চোখে মুখে ভয় আর উদ্বিগ্নতার স্পষ্ট ছাপ ফুটে ওঠে। তথাকথিত বিদ্রোহীরা তখন ব্যাপার স্যাপার দেখে রীতিমতো আরো জোরে বাদ্যি বাজাতে শুরু করে। এই দায়িত্বজ্ঞানহীনদের কাজকর্ম বন্ধ করতে কিন্তু পথে নামে না। ওদের বিশেষ ভাবে লক্ষ্য ছিল ইতালির ত্রিবর্ণ রঞ্জিত পতাকার দিকে। যার জন্য ব্যালকনির দিকে সবাই ত্রস্থ হাতে সেই ত্রিবর্ণ রঞ্জিত পতাকা সরিয়ে ফেলে।

সেই লজ্জাস্কর দিনগুলোতে একটা ঘটনা আমার স্পষ্ট মনে আছে। একজন স্কুল শিক্ষিকা ইতালির জাতীয় পতাকাটা বাঁচাবার জন্য ছুটে যায়। নিজের জীবনকে বিপন্ন করে অগ্নিবর্ষী চোখে তাকিয়ে থাকে একজন পোড় খাওয়া কম্যুনিষ্টকে লক্ষ্য করে।

সবাইকে জানানো প্রয়োজন যে আমরা আবার যখন একতাবদ্ধ হয়ে এই ছাইয়ের গাদা থেকে সদর্পে উঠে দাঁড়াই, সেই ভদ্রমহিলার দুর্জয় সাহসিকতার জন্য তার বুকে সোনার মেডেল ঝুলিয়ে দেই।

পোপোলো দ্য ইতালিয়া সংবাদপত্রের শুধু আমি প্রতিষ্ঠাতা-ই ছিলাম না, সম্পাদকও বটে। সুতরাং আমার সেই দিনগুলো যে চরম তর্ক-বিতর্কের মধ্যেই কাটতো সেটা

বলাইবাহুল্য। প্রত্যেকটা দিন-ই যেন যুদ্ধের মধ্যে দিয়ে কাটতো। ভিয়া পোয়ালো দ্য ক্যানিয়েবো নামের ছোট্ট রাস্তাটা সব সময় পুলিশ অথবা ইতালির গুপ্ত রাজনৈতিক সভার থেকে ছিটকে বেরিয়ে আসা সদস্যবৃন্দ বা সৈনিকদের দ্বারা ভর্তি থাকতো। আমাদের পত্রিকার কেউ জনসাধারণের মুখোমুখি হ'তে চাইলেই তাকে ঘিরে রাখা হ'তো সহজেই বোঝা যেতো যে সরকার আমাদের নিয়ে যথেষ্ট বিব্রত। শাসকবর্গ পোপোলো দ্য ইতালিয়ার সমস্ত কাজকর্ম খর্ব করার চেষ্টা করতো। বিশেষ করে রাজনৈতিক উপায়ে পুরুষোচিত সংগ্রামগুলোকে তো বটেই। সেন্সারশিপ্ ব্যবস্থার প্রবর্তন করা হয়। হ্যাঁ, একমাত্র পোপোলো দ্য ইতালিয়ার জন্য। পেছনের খিড়কি দরজা দিয়ে একজন নাম করা সোশ্যালিষ্ট ডেপুটি এই বিষয়ে ইনকোয়ারী কমিশন বসানোরও চেষ্টা করে। তবে ব্যাপারটা হাস্যকর হয়ে দাঁড়ায় শেষ পর্যন্ত।

আমি মিলানে মিছিল বের হওয়ার পরের দিনই একটা প্রবন্ধ লিখি। নাম রাখি জিয়োরভানো ব্রুনোর বিখ্যাত কিন্তু বির্তকিত বই থেকে। প্রবন্ধটার নাম দেই—পশুদের প্রত্যাবর্তনের বিরুদ্ধে।

পোপোলো দ্য ইতালিয়াতে ১৮ই ফেব্রুয়ারী প্রবন্ধটা প্রকাশিত হয় এবং নীচের যথাযথ শব্দগুলো দিয়ে প্রবন্ধটার উপসংহার টানি।

যদি এমন যুদ্ধের বিরোধিতা করা হয়—যাতে আমরা শুধু যুদ্ধের জন্য যুদ্ধ করি নি, বিজয়ী হয়েছি। আর তার প্রতি বর্তমানে যে নীচতা দেখানো হচ্ছে, সেই ব্যাপারে আমরা যে হস্তক্ষেপ করবো শুধু তাই নয়, উপরন্তু সমগ্র ব্যাপারটাতে গৌরবান্বিত-ই হই। এবং স্বর্গের দিকে গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে বলবো দূর হঠো। তোমরা সব শিয়ালের দল। আমাদের কাছ থেকে মৃতদের কেউ ছিনিয়ে নিতে পারবে না। সেই মৃতদের স্তূপ অত্যন্ত পবিত্র, পিরামিডের মতো যেন আকাশকে ছুঁয়েছে। সেই স্তূপ কারোর ব্যক্তিগত নয়, সবার। কেউ এই আকাশ ছোঁয়া পিরামিডের স্তূপ ছিনিয়ে নিতে পারবে না। সেই মৃতদেহগুলো কোন পার্টির নয়, তারা চিরন্তন মাতৃভূমির সম্পদ। মানবতার এই সম্পদকে কিছুতেই কোন মদের দোকান বা কো-অপারেটিভ ষ্টোর্সের পেছনে লুকিয়ে রাখা সম্ভব নয়। এই স্বল্প আঁচে পাক দেওয়া রাজনৈতিক ব্যাপারটা অত্যন্ত অসম্মানজনকও বটে। অপবিত্র নোংরা ব্যাপারগুলোর সংস্পর্শ থেকে দেশের জন্য আত্মোৎসর্গিত মৃতদেহগুলোকে বাঁচানো কি আমাদের কর্তব্য নয়? টৌটি বা রোমান অথবা যে কেউ একজনের এই আত্মত্যাগ সমগ্র ইতালির সোশ্যালিজিমের চেয়ে অনেক উঁচু। এরা যুদ্ধ কে করেছে, কিসের জন্য করেছে আর কেন-ই বা করেছে ইত্যাদি জানতে এবং বুঝতে চায়। আর আমরা মৃত্যুর দিকে জেনেশুনেই এগিয়ে গেছি। কারণ এই মৃত্যুর মূল্য আমাদের জানা। ডিসিও র‍্যাগি, ফিলিপো করিদনি, সিজারে ব্যাটিষ্টি, লুইগি লরি, ভেনেজিয়ান, সাউরো, রিসমন্ডি, কানটুসি প্রভৃতি ইতালির বীরত্বের আকাশে আরো হাজারো নক্ষত্র বর্তমান। এই বীররা নিশ্চয়ই ভাবছে যে শেয়ালের দল ওদের হাড়গুলো চিবিয়ে খাওয়ার তোড়জোড় শুরু করেছে। ওরা কি তোমাদের রক্ত ভেজা মাটি পৃথিবীর বুক থেকে তুলে দিতে চাইছে নাকি তোমাদের আত্মবলিদানের ওপরে থু থু ছিটানোর তোড়জোড় করছে ? গৌরবময় আত্মাগুলোর ভয় পাওয়ার কিছু নেই। কারণ আমাদের কাজ আমরা সবেমাত্র শুরু করেছি। তোমাদের ক্ষতি কেউ করতে পারবে না। আমরা সদা জাগ্রত প্রহরী। প্রয়োজনে কবরখানা এবং ট্রেঞ্চ থেকে মৃতদেহ গুলোকে উদ্ধার করে রক্ষা করবো।

এটা কিন্তু ছিল একটা বিস্ফোরক ঘটনার সতর্কবাণী। ট্রামপেটের আহ্বান। সরাসরি যাদের মুখের ওপরে আঘাতটা গিয়ে পড়ে, তারা পালায়। আর যারা ভাবে যে এই বিতর্কে তারাও জড়িয়ে পড়তে পারে, তারা কাঁপতে থাকে। তবে বেশি না হলেও কয়েকজন আমার সংবাদপত্রটাকে ঘিরে ধরে।

আমাদের প্রতিরোধ গড়ে তোলার প্রয়োজন ছিল ; বিশেষ করে আন্তর্জাতিক চরিত্র বিষয়ক তর্ক-বিতর্কে, ঘরোয়া রাজনীতিতে আমাদের অবস্থান নিয়ে এবং মিথ্যা বন্ধুত্বের মুখোশ খুলে দেওয়ার কারণে। তথাকথিত জালি শান্তিবাদী এবং বিশৃঙ্খল ঝুটা মানবত্ব যারা দেখাচ্ছে, তাদের বিরুদ্ধে। মোদ্দাকথা যুদ্ধে জয় করার বিরুদ্ধে যতোরকম অবক্ষয়কারী প্রচেষ্টা, সবগুলোর বিপক্ষেই আমাদের লড়াকু মনোভাব নিয়ে দৃঢ়ভাবে দাঁড়াতে হবে।

প্যারিসে পাঠানো আমাদের প্রতিনিধিদের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হয়ে উঠেছিল; মিত্রপক্ষের কয়েকজন রাষ্ট্র নায়কের অন্যায়, অবিচারের প্রতিনিধিরা তখন রীতিমতো বিপর্যস্ত; ঘরোয়া কোন্দলের জন্য আমাদের প্রতিনিধিদের কোনরকম দৃঢ় পদক্ষেপ নেওয়া সম্ভব ছিল না। সারা ইতালিতে যে অশান্ত এবং বিশৃঙ্খলতার ঢেউ ছড়িয়ে পড়েছে—সেটাই আমাদের মধ্যে অনেককে উদ্বিগ্ন করে তোলে।

ভয়াবহ পরিস্থিতি। রাস্তার মোড়ে বা মাঠে ঘাটে জনসাধারণের সামনে আমরা ক'জন মিলে বক্তৃতা দিয়েও কিছু করা সম্ভব নয়। কারণ তা'হলে আমাদের অনেক ক'টা ফ্রন্টেই লড়তে হবে। দেশের ভেতরে থেকেই ইতালিকে রক্ষা করতে হবে ; একতাবদ্ধ শক্তি হিসেবে গড়ে তুলতে হবে ইতালিকে, যা ভাঙা কারোর পক্ষে সম্ভব হবে না।

যুদ্ধ—পূর্ব বিশ্বস্ত লোকজন এবং পাতিজানদের একত্রিত করার কাজও করা প্রয়োজন। বিশেষ করে আমার মতো যারা নিজেদের ইতালিয়ান বলে মনে করে। অনেকগুলো দিন বিনিদ্র থেকে বিস্তারিত চিন্তার পর স্থির করি, হ্যাঁ আমার সংবাদপত্রের মাধ্যমেই এই বিশৃঙ্খলা বন্ধের ডাক দিতে হবে।

১৯১৯ সালের ২৩ শে মার্চ তারিখে মিলান শহরে আমি জাতির ভিত্ তৈয়ারির প্রস্তাব রাখি ঃ ফ্যাসিসি ডি কমবাটিমেন্টো অর্থাৎ সংগ্রামের তাগিদে ফ্যাসিস্ত পরিকল্পনা।

ফ্যাসিস্ট মতবাদ ইতালিতে প্রতিষ্ঠার জন্য প্রথম মিটিংয়ের স্থান ছিল মিলানের পিজা এস সেপোলেরোতে। ব্যবসায়ী এবং দোকানদারদের সংগঠন এই হলে মিটিং করার জন্য আমাদের অনুরোধ করেছিল। সেই সংগঠনের ম্যানেজারদের সঙ্গে দীর্ঘদিন ধরে আলোচনার পর, মিটিং করার অনুমতি পাওয়া যায়। যাইহোক শেষপর্যন্ত সংগঠনের ম্যানেজারদের যে সুবুদ্ধির উদয় হয়েছিল তাতেই আমরা খুশী। আমাদের তরফ থেকে অবশ্য চেঁচামেচি এবং কোনরকম বিশৃঙ্খলা হবে না বলে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়। তারপরেই আমরা যা চেয়েছিলাম তা' পাই।

জমায়েতটা কিন্তু পুরোপুরি চরিত্রগত ভাবে রাজনৈতিক ছিল। আমি পোপোলো দ্য ইতালিয়াতে বিজ্ঞাপন দিয়েছিলাম যে এই জমায়েতের মুখ্য কারণ হলো নতুন একটা সংগ্রামের ভিত্তি স্থাপন করা; আর সেই সঙ্গে এই নতুন সংগ্রামের ধরন-ধারণ এবং পরিকল্পনাও ছকা হবে এই মিটিংয়ে। যাতে জয়ী হওয়া জাতিকে এই লাঞ্ছনা এবং গঞ্জনার বিরুদ্ধে সংগ্রামে দাঁড় করাতে পারি।

পোপোলো দ্য ইতালিয়াতে ক্রমাগত সম্পাদকীয় লিখে আহ্বান জানাতে থাকি। তবে অসংখ্যবার কিন্তু নয়। আমার একজন সংগ্রামী বন্ধু সেই হলের মধ্যে উপস্থিত থেকে যারা আমাদের সংগ্রামের সাথী হওয়ার দরখাস্তে স্বাক্ষর করবে, তাদের নাম ধরে ডাকতে থাকে। দু'দিন ধরে তর্ক-বিতর্কের পরে চুয়ান্ন জন তাদের নাম তালিকাভুক্ত করার জন্য স্বাক্ষর করে এবং শপথ নেয় যে আমাদের সংগ্রামে বিশ্বস্ততার সঙ্গে সাথ দেবে।

আমি আন্দোলনের কথা বলেছি, পার্টি গঠনের নয়। কারণ আমার ধারণায় ফ্যাসিজিমো বা সমাজতন্ত্রবাদ ও সাম্যবাদ বিরোধী আন্দোলনের নীতি অথবা কার্য পদ্ধতি সব সময়েই চরিত্রগতভাবে পার্টি বিরোধী। এই নীতি বা কার্যপদ্ধতিকে পুরনো বা নতুন কোনরকম মতবাদের সঙ্গেই মেলানো সম্ভব নয়। ইতিলিয়ান ফাইটিং ফ্যাসিস্তি—নামটাও সৌভাগ্যের প্রতীক বলে মনে হয়। এই নামের রাজনৈতিক আন্দোলনের মূল লক্ষ্যই ছিল ইতালিকে ধ্বংস করতে চাওয়া ক্ষয়িষ্ণু রাজনৈতিক মতবাদগুলোর বিরুদ্ধে লড়াই করে যাওয়া। আমার নিজের ধারণায় শুধু সোস্যালিজিমের বিরুদ্ধেই আমাদের লড়তে হবে না, এগিয়ে যাওয়ার পথে একমাত্র সংগ্রামও বটে। তা'ছাড়াও অনেক কাজ করতে হবে। তথাকথিত ঐতিহাসিক পার্টি গুলো কার্যপদ্ধতি, প্রয়োজনীয়তা ইত্যাদি সব দিক থেকেই সেকেলে হয়ে পড়েছে। কারণ পার্টিগুলো শুধুমাত্র চটকদার এবং অক্ষম হয়ে পড়েছে; যারজন্য বর্তমান রাজনৈতিক এই সংকট এসে উপস্থিত হয়েছে এবং বর্তমানের জীবনযাত্রার সঙ্গে কিছুতেই পা মিলিয়ে চলতে পারছে না।

পুরনো পার্টিগুলো তো মৃত্যুর আগে গলার ঘড় ঘড়ানি শব্দ তুলতে সুরু করেছে। এই দলগুলো বর্তমানের সঙ্গে নিজেদের মতবাদকে খাপ খাওয়াতে এখানে ওখানে তাপ্পি দিয়ে চলেছে। সমানে। সুতরাং সোস্যালিজিমের কিছু সংস্কার করে নতুন দল গড়ার কোন অর্থ হয় না। বরং সম্পূর্ণ নতুন একটা রাজনৈতিক চিন্তা-ভাবনা নিয়ে দল গড়ার প্রয়োজন—যা বিংশ শতাব্দীর চিন্তাধারার সঙ্গে খাপ খাবে। সঙ্গে সঙ্গে উদারপন্থীদের ব্যক্তিপূজা, ক্ষয়িষ্ণু গণতন্ত্রের সীমাবদ্ধ দিগন্ত এবং বিশেষ করে বলশেভিজিমের অলীক কল্পনাকে পেছনে ছুঁড়ে ফেলে দিতে সক্ষম হবে।

মোদ্দাকথা আমার মনে হয়েছিল যে এমন এক চিন্তাধারার প্রয়োজন যা ইতিহাসে নতুন এক পরিচ্ছদ হিসেবে নিজেকে চিহ্নিত করতে পারবে এবং বর্তমান মানুষের জীবনের ছন্দের সঙ্গে মিলিয়ে নিতে সক্ষম হবে। তাই নতুন এক সভ্যতার ভিত্তি প্রস্তর স্থাপনের প্রয়োজন হয়ে পড়ে। সুতরাং প্রতিদিনের ঘটনা প্রবাহের ওপরে আমি তীক্ষ্ম নজর রাখতে থাকি; কারণ আমি কোথায় চলেছি এবং তার ফলাফলই বা কী হ'তে পারে সে সম্পর্কে আমার সম্পূর্ণ ধারণা ছিল। কিন্তু আমার সামনে তখন একটাই সমস্যা—পথ, সময় এবং রূপ খুঁজে বার করা।

যাইহোক সেদিনের সভায় সভাপতিত্ব করার ফাঁকে ফাঁকে আমার কিছু নতুন চিন্তাধারা ছড়িয়ে দেই, যা আজও মৌলিক এবং সজীব। পরে আমাদের পরিকল্পনা যে চিন্তাধারাগুলোকে আবর্তিত করেই গড়ে ওঠে। আমাদের সেদিনের সভায় জীবনের বিভিন্ন স্রোতের থেকে আসা লোকজন উপস্থিত ছিল। যেমন শ্রমিকতন্ত্রবাদে বিশ্বাসী, প্রাচীন মধ্যপন্থীর দল, সামরিক পোষাক পড়া এদিক ওদিক ঘুরে বেড়ানো অফিসারবৃন্দ এবং বহু

সংখ্যক আরদিতি—যাদের ছোঁড়া গ্রেনেড আর ছুরিতে বিপক্ষ সৈন্যদলের বুকে কাঁপন ধরে গিয়েছিল।

এই ইতালিয়ান আরদিতি, কিন্তু যুদ্ধের সৃষ্টি। গারবল্ডির আবেগপ্রবণ শৌর্যবীর্যে ভরা মনে প্রথম এই আরদিতির চিন্তা আসে। বহু আগে ইতালির অনেক অংশেই শহর জীবনের রক্ষণাবেক্ষণ এই মিলিশিয়ারাই করতো। আরদিতিরা যুদ্ধে যে যথেষ্ট পরাক্রম দেখিয়ে ইতালির সেবা করেছিল তা'তে সন্দেহ নেই। ওরা প্রথম সৈন্যদলে ছুটে যেতো; হাতে বোমা নিয়ে, দাঁতে ছুরি ধরে, মৃত্যু-যুদ্ধে ওরা নিজেদের ছুঁড়ে দিতো। যুদ্ধ সংগীতের মহান সুর গাইতে গাইতে। ওদের মধ্যে শুধু উজ্জীবিত শৌর্যবীর্য-ই ছিল না—লৌহ কঠিন ইচ্ছাও কাজ করতো ওদের মনে।

এই টিপিক্যাল ইতালিয়ান দল যুদ্ধের পরেই যেন আরো বেশি দ্রুত বেড়ে ওঠে। ফ্যাসিস্ট দলে যারা প্রথমে যোগ দিয়েছিল, তারা কিন্তু প্রায় সবাই মনস্থির করে এসেছিল। ওরা ছিল মনে প্রাণে সাহসী এবং দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। সোস্যালিষ্ট এবং কম্যুনিষ্টদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে প্রথম বছরগুলোতে যুদ্ধ-ফেরত অভিজ্ঞ আরদিতিরাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল। আমি বেশ কয়েকবার ওদের চীফ্ হিসেবে নির্বাচিত হয়েছি এবং বর্তমানেও আরদিতি অ্যাসোসিয়েসানের অনারারি প্রেসিডেন্ট। তবে এই পদের দায়িত্ব শুধু জনসাধারণ এবং সামরিক বিভাগের কাজকর্ম দেখা আর শৃঙ্খলা বজায় রাখা।

যারা ফ্যাসিস্ত দল গড়ে তোলার জন্য সেই জমায়েতে যোগদান করেছিল, তারা কিন্তু কথাবার্তা বেশি বলে নি। শুধু স্বপ্ন দেখার লোকও তারা ছিল না। ওদের লক্ষ্য ছিল স্বচ্ছ এবং সোজা; যে কোন মূল্যে যুদ্ধ বিজয়কে অক্ষুণ্ন রাখা, মৃতদেহের স্মৃতিকে বিস্মৃতির গর্ভে ঠেলে না দেওয়া। শুধু তাই নয়, যাদের পরিবার থেকে যুদ্ধ করতে গিয়ে আত্মবলিদান দিয়েছে—সেইসব পরিবারকে যতোটা সম্ভব সুখ-স্বাচ্ছন্দ দেওয়া। যাদের অঙ্গহানি হয়েছে বা যুদ্ধের দৌলতে বিকলাঙ্গ হয়ে পড়েছে, তাদের প্রতিও কর্তব্য কর্ম করে যাওয়া। তবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ ছিল ওদের তথাকথিত সোস্যালিজমের বিরোধিতা করে যুদ্ধ বিজয়ের পতাকাটাকে উঁচুতে ধরে রাখা। এবং সর্বশক্তি দিয়ে বিশ্বাসঘাতকতা আর দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যাওয়া। যাতে জাতির শক্তির ক্ষয় রোধ এবং অতিরিক্ত ধনলিপ্সা থেকে ওদের দূরে সরিয়ে রাখা যায়।

কয়েকজন আবার এমন ভান করে যে ফ্যাসিমো বা সমাজতন্ত্রবাদ অথবা সাম্যবাদ বিরোধী আন্দোলন বলতে কি বোঝায় তারা তা' বুঝতে পারছে না। আর কিছু লোক তো আন্দোলনটাকে আগাছা বলে ভাবতে শুরু করে। কিন্তু আমি তখন দৃঢ় প্রতিজ্ঞ যে বাক্চাতুরী না করে নতুন ধরনের এই আন্দোলনকে একটা বিশেষ নামে অভিহিত করার প্রয়োজন। এই কারণে পুরো প্লাট্ফরমটাকে আমি তিন তক্তায় ভাগ করি।

প্রথমটা হলো ঃ

২৩শে মার্চের মিটিংয়ে ইতালির সেইসব সন্তানদের প্রতি শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করা হয়, যারা দেশকে মহৎ এবং পৃথিবীকে মুক্ত করার কাজে আত্মোৎসর্গ করেছে। শুধু তাই নয়, যাদের অঙ্গহানি হয়েছে বা আহত অথবা বিদেশীদের হাতে বন্দী হয়েছিল তাদেরও শুভেচ্ছা পাঠানো থেকে দূরে সরিয়ে রাখা হয় না। এক কথায় যারা যুদ্ধে গেছে, তাদের অর্থনৈতিক এবং নৈতিক সব দাবী-ই মেনে নেওয়া হয়।

দ্বিতীয় ঘোষণা হলো ঃ ফ্যাসিস্টরা যেসব বহির্দেশের সাম্রাজ্যবাদ ইতালির ক্রমাগত ক্ষতিসাধন করে চলেছে, সেইসব দেশের বিরুদ্ধে নিরন্তর সংগ্রাম করে যাওয়া। কারণ ইতালির বিরুদ্ধে এইসব সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলো ব্যাপারটাকে স্বতঃসিদ্ধ বলে ধরে নিয়েছে। শুধু তাই নয়, এই মিটিংয়ের মাধ্যমে আরো দাবী রাখা হয় যে আল্পস্ এবং আড্রিয়াটিক সীমান্ত শক্তিকে জোরদার করে ফিউমে আর ডালমাটিয়াকেও ইতালির সঙ্গে সংযোজন করতে হবে।

তৃতীয় হলো ঃ অদূর ভবিষ্যতে নির্বাচন করতে হবে। এই পর্বে ফ্যাসি দ্য কম্‌বাটিমেন্টো আরো বলে যে দুধে জল মেশানো ইতালির প্রতিনিধিদের বিরুদ্ধে এরা সর্বশক্তি নিয়ে সংগ্রাম করবে।

শেষে আমরা সংগঠন নিয়ে আলোচনা করি। যে সংগঠন এই নতুন ধরনের আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। আমি ব্যক্তিগতভাবে আমলাতান্ত্রিক কোন সংগঠন পছন্দ করি নি। মনে হয়েছিল সর্বোত্তম ব্যবস্থা হিসেবে ইতালির প্রতিটি বড় শহরে পোপোলো দ্য ইতিলিয়ার যে প্রতিনিধিরা রয়েছে, তাদের ওপরেই সেই শহরে এই সংগঠন গড়ে তোলার দায়িত্ব বর্তাবে। আর সেই প্রতিনিধির ওপরেই ফ্যাসি দ্য কম্‌বাটিমেন্টোর শুধু আদর্শ রূপায়ণের ভার থাকবে না, তাদের কাজও করে যেতে হবে সেই লক্ষ্য রেখে। প্রথমদিকে এই সংগঠনের খরচ কয়েক হাজার লিরা পোপোলো দ্য ইতিলিয়ার দুর্বল তহবিল থেকেই খরচ করা হয়। আর সমস্ত আন্দোলনটাকে পরিচালনা করার জন্য একটা সেন্ট্রাল কমিটিও গঠন করা হয়।

আমার কাছে ব্যাপারটা আজও বিস্ময়কর লাগে যে কেউ-ই এই মিটিংটাকে কোনরকম গুরুত্ব দেয়নি। জমায়েতটাকে যেন এড়িয়ে গেছে। বোকা সোস্যালিষ্টরা এবং সংকীর্ণমনা ইতালির লিবারেল পার্টি তো এই জমায়েতের পেছনের রহস্যটাই ধরতে পারে নি।

বিরাট লিবারেল সংবাদপত্র দ্য করিয়্যারে দেলা সেরা এই মিটিং নিয়ে মাত্র কুড়ি লাইন লিখেছিল; ইতালির রাজনীতির ভেতরের ব্যাপারটা শুধু নয়, ইতালির রাজনীতিটাই তখন ছিল এলোমেলো; বিশৃঙ্খল এবং অস্পষ্টতায় ভরা।

এমন কি যারা যুদ্ধ করেছিল, তাদের চোখে মুখেও স্পষ্ট হতাশা ফুটে উঠেছিল। উদ্বিগ্নতার একটা চাদার যেন সব শ্রেণীর লোককে ঢেকে দিয়েছিল। ইউরোপের মহাযুদ্ধে যে চার্চ নিজেকে যুদ্ধরত সব জাতির কাছ থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছিল, সেই চার্চও তখন শুধু শান্তি প্রতিষ্ঠায় নয়—সব ব্যাপারেই নাক গলাতে সুরু করে।

এতোদিন আমাদের জাতীয় জীবনে চার্চ পার্টিটো পোপোলারে বা ক্যাথলিক পার্টির মাধ্যমে ওদের কার্যকলাপ সীমিত কয়েকটা ক্ষেত্রে রেখেছিল। সেই সীমিত ক্ষেত্রগুলো ছিল পরিবার, ধর্ম এবং জাতিকে ঘিরে। বিশেষ করে সোস্যালিষ্ট পার্লামেন্টারী পদ্ধতিতে বলশেভিক ধ্যান-ধারণাগুলোকে ঢুকিয়ে রোম থেকে প্রদেশগুলোকে ছিন্ন করার প্রচেষ্টা। কিন্তু পার্টিটো পোপোলারে এক সময় নিজেরাই রেল লাইন থেকে ছিট্‌কে বেড়ার ওপরে মুখ থুবড়ে পড়ে। কারণ ক্যাথলিক পার্টি তখন সোজাসুজি সোশ্যালিষ্ট পার্টির সঙ্গে দ্বন্দ্বে নেমে পড়েছে। ওদের দেশপ্রেম সম্পর্কেও সন্দেহের অবকাশ ছিল। কারণ ফ্যাসিষ্টদের ওরা বিরুদ্ধচারণ করেছিল। ক্যাথলিক পার্টি তখন অন্যান্য পার্টির সঙ্গে মিলে যুদ্ধকে বাক্যের সঙ্গে ব্যাকরণের মতো পার্থক্য গড়ে তুলতে ব্যস্ত।

ইতালির শহরগুলোতে রাজনৈতিক দাঙ্গা, অস্থিরতা এবং ধর্মঘট চক্রবৎ লেগেই থাকতো। সুতরাং আমাকেও নিয়মিত সেইসব পরিস্থিতির মোকাবিলার জন্য ব্যাপারগুলোকে পর্যালোচনা করতে হ'তো। ইতালির অন্তর্দেশীয় রাজনৈতিক গণ্ডগোল মেটাবার পক্ষে কাউনসিলের প্রেসিডেন্ট অরল্যাণ্ডো ছিল অক্ষম। বৈদেশিক সমস্যাগুলো মেটাবার ক্ষমতা অরল্যাণ্ডোর ছিল না। ওর কাজকর্মও ছিল পরস্পর বিপরীত ধরনের; সস্তা আবেগে ভর্তি। সর্বোপরি অরল্যাণ্ডোর ব্যর্থতার মূল কারণ ছিল যে সে ইতালিকে আন্তরিকভাবে ভালোবাসতো না। ফরাসীদের যেমন চিনতে পারে নি, তেমনি মিত্রশক্তির সঙ্গে করা সন্ধিগুলোকেও অরল্যাণ্ডো বেশির ভাগ ক্ষেত্রে এড়িয়ে গেছে। যারজন্য ভার্সাইয়ে শান্তি চুক্তির আলোচনার টেবিলে সন্‌নিনোর উপস্থিতি সত্ত্বেও চরমভাবে ব্যর্থ হয়। উইলসন তো শান্তি আলোচনায় ইতালির ব্যাপারে দ্ব্যর্থক ভূমিকায় বরাবর অভিনয় করে গেছে। যে কারণে ইতালির প্রতিনিধিবর্গ ২৩শে এপ্রিল প্যারিস ত্যাগে বাধ্য হয়েছিল। ৫ই মে সেই প্রতিনিধি দল ফিরে আসে। সব মিলিয়ে এক অনিশ্চয়তার পরিবেশ সৃষ্টি হয়। জুন মাসের ভোটে অরল্যাণ্ডো মন্ত্রিসভা হেরে গিয়ে বিদায় নেয়। ইতিমধ্যে জুন মাসেই ফিউমে ফরাসী নাবিক এবং ইতালির সৈন্যদের সঙ্গে তীব্র সংঘর্ষ বাধে।

তবে পরবর্তীতে যে এসেছিল অর্থাৎ নিটি—ওর মতো ইতালির স্বার্থ আর পরিকল্পনার ক্ষতি আর কেউ করেনি। এমন একটা ব্যক্তিত্ব যে জীবনের কোন আদর্শকেই স্বীকার করে নেয় নি। বিশেষ করে সংঘাতময় আদর্শগুলোকে। অর্থনৈতিক ধ্যান-ধারণা কিন্তু নিটির স্বচ্ছ ছিল। অবশ্য নিজের চিন্তাভাবনার ব্যাপারে লোকটা ছিল নির্লজ্জ প্রকৃতির। একগুঁয়ে লোকটা সবসময় মন্ত্রীসভায় মধ্যমণির ভূমিকা নিতে চাইতো। তা' সে ক্যাবিনেটের প্রেসিডেন্ট হোক বা সাধারণ একজন মন্ত্রী থাকুন।

ক্ষমতায় এসে তার প্রথম কাজ ছিল ক্ষমা প্রদর্শন। প্রথমবারের ক্ষমা প্রদর্শনের পেছনে আরো দু'বার এই একই কাজ করে। প্রথমবারের ক্ষমা প্রদর্শনের ব্যাপারটা ছিল চরিত্রগত ভাবে সাধারণ সবার জন্য—যা আমি মেনে নিয়েছিলাম। কিন্তু পরবর্তী দু'ক্ষেত্রে নিটি নৈতিক দিক থেকে অপরাধী হিসেবে গণ্য হওয়ার যোগ্য। কারণ যারা শৌর্যবীর্য সহকারে যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ দিয়েছে আর যেসব ইতালিয়ান জাতির সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে শত্রু শিবিরে যোগ দিয়েছে, উভয়ক্ষেত্রেই নিটি ক্ষমা প্রদর্শন করেছে। যা অত্যন্ত অন্যায়।

নিটির সব কাজকর্মের মাধ্যমে সোশ্যালিষ্টদের সম্মতি আদায়ের চেষ্টা ছিল। কারণ ভবিষ্যতে ইতালির প্রজাতন্ত্রের প্রেসিডেন্ট হওয়ার স্বপ্ন দেখতো। জননায়কের জামাকাপড় পড়লেও জনসাধারণের মধ্যের বিশৃঙ্খলা বা দুর্ঘটনা রোধ করার কোন চেষ্টাই সে করে নি। যার জন্য অনেক সময় মানুষকে মূল্য হিসেবে জীবন পর্যন্ত দিতে হয়েছে। বলশেভিকদের মুখোমুখি যেমন কখনো হ'তে চায় নি, তেমনি লম্পটদের বিরুদ্ধেও খোলা মাঠে জেহাদ ঘোষণা করে নি। রাজা রুটির দাম সম্পর্কে একটা ডিক্রী জারী করেছিল; পরের দিনই নিটির চাপে পড়ে সেই ডিক্রী তুলে নিয়ে আরেকটা ডিক্রী জারী করে। সেটাতেও স্বাক্ষর করেছিল রাজা স্বয়ং।

জাতীয় জীবনের কোন দিক নিয়েই নিটি আলোচনায় আসে নি—যা সোশ্যালিষ্টদের হাত শক্ত করেছে। তাই ওরা আস্তিনের আড়ালে মুখ লুকিয়ে হেসেছে যে পরের নির্বাচনে ওদের রাজনৈতিক সফলতা নিশ্চিত। কারণ নির্বাচন হবে আনুপাতিক মাফিক, তাই

সোশ্যালিস্টরাও সেই নির্বাচনী যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়ে ইতালির রাজনৈতিক প্রভু হয়ে বসবে। আমার মনে হয়েছিল আমাদের সেই গ্রীষ্মটা যাবে দৈহিক এবং মানসিক টানাপোড়ানি আর দৃঢ়সংকল্পের মধ্যে দিয়ে।

১৯১৯ সালের জুন মাসে ভার্সাইতে জার্মানীর সঙ্গে শান্তিচুক্তি সম্পন্ন হয়। বলা ভালো যে পুরো ব্যাপারটা আমার কাছে ছিল যেন যৌন কর্মের দ্বারা সম্পাদিত বিবাহ। ইউরোপের বুক থেকে বিভীষিকাময় দিনগুলোর অবসান ঘটে। তবে ক্রমাগত হতাশা, মিত্রশক্তির বিরুদ্ধে জার্মানীর প্রতিবাদ ইত্যাদি ব্যাপার নিয়ে অনেক জাতি-ই চরম টানা পোড়ানির মধ্যে ছিল। তাই সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর হওয়ার পর সেইসব জাতি যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচে।

ইতালির পক্ষে এটা একটা মর্মন্তুদ ঘটনা; সমস্ত আদর্শগুলোকেই যেন ঘটনাটা নাড়িয়ে বিধ্বস্ত করে দেয়। আমরা যুদ্ধ জয় করেছি, কিন্তু কূটনৈতিক যুদ্ধে চরমভাবে পরাজিত। জারা ছাড়া সম্পূর্ণ ডালমাটিয়া আমাদের হাতছাড়া হয়। কিন্তু ডালমাটিয়ার ইতিহাস এবং সংস্কৃতি তো আমাদের-ই; উপরন্তু ডালমাটিয়ার লোকেরা আমাদের ভাষাতেই কথা বলে। তাছাড়া মাতৃভূমির প্রতি ওদের রয়েছে উদগ্র আশা-আকাংখা। আর ফিউমের বেশির ভাগ শহরের অধিবাসীরা তো ইতালির হয়েই যুদ্ধ করেছে। উপনিবেশের সমস্যাগুলোর জট খুলতে গিয়ে আমাদের বঞ্চিত হ'তে হয়। আমাদের মতো যারা শুধু যথেষ্ট শক্তিধর-ই নয়, উৎপাদনশীলও বটে—তাদের কাঁচামাল এবং বাজারের জন্যও জমি দরকার। তদুপরি যে হারে ইতালির জনস্ফীতি হয়ে চলেছে, শুধু সীমান্তের কিছুটা রদবদল করে তা'তে আমাদের ক্ষতিপূরণ হওয়ার বিন্দুমাত্র সম্ভাবনা নেই বললেই চলে।

আমার বুঝতেও অসুবিধা হয় না যে অসন্তুষ্টির একটা চোরাস্রোত শুধু জনসাধারণের মধ্যে দিয়েই বয়ে যাচ্ছে না, কমবাওনিটিকেও তা' ধীরে ধীরে গ্রাস করে চলেছে। আরেকবার ইতালিকে ওরা সংঘর্ষ, অর্থনৈতিক অভাব এবং পৈতৃক সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করে শান্তি চুক্তি করতে যায়। ফিরে আসে খালি হাতে এবং একরাশ হতাশা নিয়ে।

নিটি সরকারের ক্রমাগত হতাশাব্যঞ্জক কাজকর্মে আমাদের অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক অবস্থা দেউলিয়া হওয়ার কাছাকাছি এসে দাঁড়ায়। নিটি স্বয়ং, ওর পত্রিকা এবং অনুচরবৃন্দ ইতালির জনসাধারণকে বোঝাতে চেষ্টা করে যে ভার্সাই চুক্তি-ই হলো বর্তমান পরিস্থিতিতে সবচেয়ে ভালো প্রাপ্তি। এই উপদ্বীপে লাঞ্ছনার একটা ছায়া যেন ঘিরে ধরে। তবে অনেকেই কিন্তু সত্যিকারের ট্রাজিডিটাকে মন থেকে মেনে নিতে রাজী হয় না। অনেকে বুঝতে না পারলেও আমি জানতাম যে এই বিষণ্ন নিস্তব্ধতা থেকেই বেরিয়ে আসবে চরম প্রতিশোধ স্পৃহা।

সরকার মানুষের মতিগতির বন্যা ঠিক কোনদিকে বয়, সেদিকেই তীক্ষ্ন নজর রাখছিল। কিন্তু বাস্তবে নির্বাচনী যন্ত্রটাকে ঠিক কিভাবে এবং কোনদিকে ঘোরাবে তা' বুঝে উঠতে পারছিল না। যাতে বিযময় আনুপাতিক পদ্ধতির দ্বারা নির্বাচনী আইন কানুন উল্টে দেওয়া যায়। ধ্বংসের খেলায় মেতে ওঠা ওদের অবিশ্বাস্য ব্যাপারটা হলো বিমান চালনার ক্যাম্পগুলোকে দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেওয়া; ১৯১৯ সালের আগষ্ট মাসে ইনকোয়ারী কমিশনের দুঃখজনক অধ্যায় কাপেরেটোতে প্রকাশিত হয়।

নিজের মনেই ভাবতাম যে আগুনে ঘি পড়েছে; সোশালিষ্ট পত্রিকা আবান্তির তিনটে সংস্করণ প্রকাশিত হত। একটা তুরিন থেকে, বাকী দু'টো রোম আর শহর মিলান। ওরা

সেনাদলের বিরুদ্ধে জোরদার হিংস্র প্রচার চালাচ্ছিল। টাইপিস্টদের ধর্মঘটের জন্য আবান্তি-ই একমাত্র পত্রিকা যা দু'মাস ধরে রোম থেকে প্রকাশিত হচ্ছিলো। রাস্তায় বিক্ষোভ দেখানোর সময় সামরিক পোষাক পড়া কোন অফিসারকে দেখলেই লাঞ্ছনা এবং নির্যাতন করতো। জাতিকে দয়া প্রদর্শনের ব্যাপারটা যে চরম অপমানকর, কিছুতেই তা' ওরা বুঝতে চাইতো না। ১৯১৯ সালের মার্চ মাসে কয়েকজন ফ্যাসিস্ত তাদের কাজকর্মে দারুণ বাধা পায়। ওদের শুধু নিঃসঙ্গ করা হয় না, মারধোরও কম খেতে হয় নি। কখনো গুপ্তঘাতক আর কোন সময় সরকারের হাতে।

কমবাটানটিদের নিত্যদিনের অগ্নিস্নানের ব্যাপার নিয়ে পোপোলো দ্য ইতালিয়াতে যে শুধু লিখেছি তা' নয়, স্বেচ্ছাসেবকদের আকাশচুম্বী গর্ব, এক সুরের বা ঐক্যতানের প্রয়োজনীয়তা এবং সরকারের নোংরা আদর্শহীন বিরোধিতা যা বীরত্বব্যঞ্জক দেশপ্রেমকে কখনোই মহৎ বা সুন্দর করে তুলতে পারে না। রোমে বসবাসকারী কবি গাব্রিয়েল ডি আনুনজিয়ো লিখেছিলেন যে আমার কাব্যের অনুমোদন ওদের ভালোবাসার উত্তাপে যেন কাঁপছে।

বিজয় বৃক্ষের গৌরবময় পাতাগুলো এইসব প্রচেষ্টা সত্ত্বেও খসে খসে পড়েছিল। জাতীয় সরকার তখন নির্বাচন নিয়ে প্রতিদিন আলোচনা এবং আইন পাশ করে চলেছে। প্রত্যহের কাজ-ই ছিল বিশৃঙ্খলা আর সরকারকে ভয় দেখানো। তর্ক তো নয় যেন আড্ডা দেওয়া হ'তো; আর যারা সেই তর্ক বা বিতর্কে অংশগ্রহণ করতো—তাদের যুদ্ধ, সততা বা বীরত্ব সম্বন্ধে কোন ধ্যান-ধারণাই ছিল না।

নির্বাচন! নির্বাচন! নির্বাচন! আমার ধারণায় এই বিষয়বস্তুর ওপরেই পার্লামেন্টে জোর পায়ে দাঁড়ানো সম্ভব।

ফিউমে শহরে তখন ঘটনার ঘনঘটা; ইতালিয়ান আর ফরাসীদের মুখোমুখি সংঘর্ষে লিপ্ত। শহরের বাসিন্দারাও মিত্রশক্তির ওপরে রীতিমতো অসন্তুষ্ট, ক্রুদ্ধ, এবং সেই ক্রুদ্ধতা দিনের পর দিন বেড়েই চলেছে। যারজন্য মিত্রশক্তি শহরের রাস্তায় রাস্তায় মিশেল সৈন্যের দল মোতায়েন করা স্থির করে। সুতরাং ফিউমে যা একান্তই খাঁটি একটা ইতালির শহর ছিল, মোজাইকের বিভিন্ন দানার মতো রকমারী জাতের সৈন্যদলে ভরে ওঠে। অক্ষমতার শিখরের সঙ্গে নির্বুদ্ধিতা মিশে শহরটার তখন চরম অবস্থা।

ডি আনুনজিয়ো নিঃসঙ্গতার দরুণ হাঁফিয়ে উঠলেও গায়ের জোরে ফিউমে শহরটা দখল করতে চায়। তা'ছাড়া ফিউমে শহরের মুক্তির কোন উপায়ও ছিল না। কারণ মনে হয় সবকিছুই যেন হারিয়ে গেছে। মাত্র কয়েক মুঠো লোক তাদের স্বপ্ন নিয়ে এখনো বেঁচে আছে। তবে আমাদের সৈন্যদলের সেই লোক ক'জনই কিন্তু বিশ্বস্ত। তারা হলো পুরনো স্বেচ্ছাসেবকের দল। ফ্যাসিষ্ট। যারা মনে করতো রোম এবং অন্যান্য শহরের রাস্তাঘাট যুদ্ধ এবং তা' বিজয়ের জন্য যেন উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। ওরা রন্‌চি থেকে অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করতে সুরু করে।

ইংরেজ নাবিকেরা যখন ফিউমে ছেড়ে যায়, ঠিক সেই মুহূর্তেই শহরটা দখল করা হয়। বলাবাহুল্য দ্রুত এবং গর্জন সহকারে। নিশ্চুপে নয়। সরকার ব্যাপারটা জানতে পেরেই আক্রমণের মোড় ঘোরানোর জন্য ছুটে যায়। শহরের মাঝামাঝি জায়গায় অবরোধ করে বিদ্রোহীদের আক্রমণ করে। কিন্তু ডি আনুনজিয়ো এবং তার প্রাচীন রোমের সৈন্যদলের

মতো বীর্যশালী বা লিজিয়ানরা নীরবে আক্রমণের পরিকল্পনা ছঁকেছিল। বর্তমানে সরকারের সৈন্যদলের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে প্রতিদ্বন্দ্বীতায় আহ্বান জানায়।

গাব্রিয়েল ডি আনুনজিয়ো রনচি থেকে রওনা হওয়ার আগে আমাকে একটা চিঠিতে লিখেছিল ঃ

প্রিয় কমরেড,

পাশার ছক টেবিলের ওপরে। আগামীকাল ফিউমে যাবো। সশস্ত্র অবস্থায়। ফিউমে শহর দখল নেওয়ার জন্য। ইতালির ভাগ্যদেবতা নিশ্চয়ই আমাদের সাহায্য করবে।

গেজেটে দেল পোপোলোতে প্রবন্ধটা সংক্ষেপে ছেপে দিও। তবে সমাপ্তির পুরোটা যেন ছাপা হয়। সংঘর্ষের সময় কারণগুলোকে কৃপণতার সঙ্গে নিও না।

আমার আলিঙ্গন রইলো।

গাব্রিয়েল ডি আনুনজিয়ো।

১১ই সেপ্টেম্বর, ১৯১৯ সাল।

সারা ইতালির থমকে থাকা আবহাওয়াটা ডি আনুনজিয়োর নতুন পরিকল্পনায় ভিসুভিয়াসের মতো ফেটে পড়ে। আবার আমরা যেন ভ্রাতৃত্বের উৎসাহের সোচ্চার উল্লাসের শব্দ শুনতে পাই। ১৯১৫ সালের মে মাসের উদ্দীপনা শিরায় শিরায় ঢেউ তোলে। নিটি সরকারের নীতির মুখে এই পবিত্র মুক্তি আমাদের মানবিক অনুভূতিকে কাব্যময় এক জগতে নিয়ে যায়।

ফিউমে যেমন ফ্যাসিস্টরা অজেয় লিজিয়েনের ভূমিকা নিয়ে এগিয়ে গিয়েছিল, দেশের মধ্যেও তেমনি নতুন ও পুরনো পরাজয়পন্থীদের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছিল এই ফ্যাসিস্টরাই। সারা পৃথিবী জুড়ে ইতালির উপনিবেশকারীরা ভার্সাই সন্ধির পুরো ব্যাপারটাকেই উদ্বিগ্নতার সঙ্গে লক্ষ্য রাখছিল; তারাই ডি আনুনজিয়োর অভিযানের সময় প্রচুর টাকা পয়সা পাঠিয়ে এই অভিযানে সাহায্য করেছিল। ফিউমে শহরের অধিবাসীরা মুক্তি যে আসন্ন তা' তাদের ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় দিয়ে অনুভব করতে পেরেছিল। আর তার অভিব্যক্তি হয়েছিল ফিউমের অধিবাসীদের মধ্যের চরম উদ্দামতায়। দুঃসাহস ওদের প্রতি অবিচারের অনেকটাই মেরামতির কাজ করেছিল। শহরের সবাই একসঙ্গে দাঁড়িয়ে নীটিয়ান অথবা আন্তর্জাতিক শক্তিকে অস্ত্র বলে চ্যালেঞ্জ জানানোর জন্য সদা প্রস্তুত ছিল।

নিটি কাউন্সিলের প্রেসিডেন্ট, পার্লামেন্টে পুরো ব্যাপারটাকে অবজ্ঞাভরে এড়িয়ে যায়। বদলে প্রতিবাদের বিপদজনক ভাষা হিসেবে সর্বাত্মক ধর্মঘট ডাকে। দ্ব্যর্থক ভাষায় সেই সব শ্রেণীভুক্ত মানুষদের এই সর্বাত্মক ধর্মঘটে অংশগ্রহণ করতে আহ্বান জানায় যাদের শিকড় রয়েছে সোশ্যালিজিমে। বিশেষ করে যারা নিজেরাই সোশ্যালিস্ট এবং র‍্যাডিকেলস্। নিটি তাদের নির্দেশ দেয় ডি আনুনজোয়ার অভিযানের বিরুদ্ধে রাস্তা জুড়ে প্রতিবাদ জানাতে।

নিটি শেষমেষ যুগোশ্লাভিয়ার মন্ত্রী ট্রুমবেকের সঙ্গে আলাপ আলোচনার পর বুঝতে পারে যে মুষ্টিমেয় কয়েকজন বীর তাকে ফাঁদে ফেলবে। লাঞ্ছনার শেষ রাখবে না।

নিটির চিন্তাধারা এবং কাজকর্ম সব কিছুই কিন্তু শারীরিক ভীতি তাড়িত ছিল। লোকটা যে পাগলামীতে ভরা স্বপ্ন দেখতো তা'তে সন্দেহ নেই। যতোরকম উপায়ে সম্ভব ফিউমের

লিজিয়ানদের বাধা দেওয়ার জন্য পরিকল্পনা ছকেছিল। সৈন্যদের পলাতক বলে ঘোষণা করা হয়; পুরো শহরটাকে এমন ভাবে অবরোধ করা হয় যাতে নাগরিকদের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ব্যহত হয়ে ওদের প্রাণ চাঞ্চল্যে স্থবিরত্ব আসে। পার্লামেন্ট বন্ধ হয়ে যায়। অসুবিধাজনক আনুপাতিক নির্বাচনের দিন স্থির হয় ১৬ই নভেম্বর, ১৯১৯ সালে।

সাময়িকভাবে হলেও এই নির্বাচন আপাত অশান্তির ওপরে পর্দা টেনে দেয়। প্রতিটি পার্টি-ই জনসাধারণ এবং নিজ দলীয় ক্ষমতার পরিমাপ করতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। সোশ্যালিষ্ট যারা যুদ্ধের খারাপ ফলাফলের জন্য হিসেব নিকেশ করতে ব্যস্ত ছিল এবং ডি আনুনজিয়োর অভিযানের কারণে আরেকটা যুদ্ধের বিপদের আশংকা করছিল, তারাই সবচেয়ে বেশি জনপ্রিয়তা লাভ করে। চার্চ কর্তৃপক্ষ, যারা রাজনীতিতে সবসময় একটা দ্বিধাগ্রস্ত মনোভাব নিয়ে চলেছে, গ্রামে গ্রামে বিভিন্ন গীর্জায় কর্মরত পাদ্রীদের ওপরে চাপ দেয়, যাতে পার্টিটো পোপোলারে বলে ক্যাথলিকদের সৃষ্ট গীর্জার কাজকর্ম নিখুঁত ভাবে চালানোর জন্য তারা পার্লামেন্টে অধিকতর ক্ষমতাসম্পন্ন হয়ে ওঠে। লিবারেলস্, ডেমোক্র্যাটস্ এবং কিছু র‍্যাডিকেলস্ একটা ব্লক তৈরি করে। দ্য ফোর্সেস অফ অর্ডার নামে। ওদের কোন ভিত্তিভূমি বা নির্দিষ্ট লক্ষ্য না থাকায় প্রায়শই নিজেদের অবস্থান বদল করতো। দলের মধ্যে সৃষ্ট এই দলগুলোর নিস্ফলতা আমি বহু বছর ধরে তীক্ষ্ম দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করে গেছি।

আমি মনে প্রাণে চেয়েছিলাম ফ্যাসিষ্টরা যাতে এই নির্বাচনে একাই লড়ে, কোন পার্টির সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে এই নির্বাচন লড়তে আমি চাই নি। এমন কি আদর্শের দিক থেকে কাছাকাছি ন্যাশালিষ্টদেরও কাছে টানি নি। পুরো পরিবেশটাই আমাদের বিরুদ্ধে ছিল; তাই স্বপক্ষের মাথা গুণতির প্রয়োজন পড়েছিল। এমন কি নির্বাচনের মাধ্যমে হলেও সামগ্রিক ভাবে ইতালিয়ান জাতির নৈতিকতা বিশ্লেষণ এবং কতোটুকু তার জাগরণ হয়েছে বিজয়ী জাতি হিসেবে তার হিসেব কষার দরকার ছিল। আমি একটা নির্বাচনী কমিটি তৈরি করি। টাকা পয়সার জোর না থাকলেও কমিটির প্রতিটি সদস্যের যে অভূতপূর্ব মনোবল ছিল তা'তে সন্দেহ নেই। এবং সেই কমিটিকে আদেশ দেই ইতালির প্রতিটি শহরে, বিশেষ করে মিলানে জনসভার আয়োজন করতে।

পিজা বেলজিয়াসোর জমায়েতটা এখনো আমার স্পষ্ট মনে আছে; ওটা একটা টিপিক্যাল মিটিং ছিল। পুরনো মিলান শহরের ততোধিক নির্জন একটা কোণ; যা অতীতে পারিষদ ভবনের উচ্চ বক্তৃতা মঞ্চ হিসেবে ব্যবহার করা হ'তো, অন্ধকার সেই রাত্রে টর্চ জ্বেলে এই সভার আয়োজন করা হয়েছিল। আমি সেই ভিড়ে ঠাসা জমায়েতে বক্তৃতা দেই; শুধু মিলান থেকে নয়, ইতালির বিভিন্ন শহর থেকেই লোকেরা এসেছিল। বোলোনিয়া, তুরিণ, রোম এবং নেপলস্ থেকে ফ্যাসিষ্ট দল তাদের প্রতিনিধিদের পাঠিয়েছিল যাতে নির্দিষ্ট আইন জেনে আদেশ নিয়ে নির্বাচনী যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে।

এই উপলক্ষ্যে আমি কিছু আদর্শের রূপরেখা নির্দিষ্ট করে দিয়েছিলাম—যা আজও ফ্যাসিষ্ট দলকে চালনা করতে সাহায্য করছে। আর আমার বাকী রাজনৈতিক জীবনও সেই আদর্শ—তাড়িত হয়ে কেটেছে।

আমি সেই জমায়েতে বলেছিলাম বিপ্লবকে অস্বীকার করার উপায় নেই; কিন্তু তা' নিয়ে বিস্তারিত আলোচনার প্রয়োজন রয়েছে। আমি আরো বলেছিলাম যে রাশিয়ান

বলশেভিজিমকে ইতালির জনসাধারণের নকল করার প্রয়োজন নেই। আমাদের ইতিহাসের নিজস্ব ধারায় মহৎ বিপ্লবের ধ্যান-ধারণা রয়েছে। যা যুগ যুগ ধরে ইতালির প্রাণশক্তিকে উজ্জীবিত করে চলেছে। সেই প্রতিভাধরদের চিন্তাধারা আমাদের বুকে অদম্য সাহসের জোয়ার এনেছে।

যদি সত্যি বিপ্লবের মধ্যে দিয়ে আমাদের এগোতে হয়, তা' হবে ইতালির মাটির থেকে ওঠা। ম্যাজিনী চিন্তাধারা আর কার্লো পিসাকেনের আত্মিক শক্তিকে জড়িয়ে ধরে।

মনের দিক থেকে আমি স্বচ্ছ এবং আত্মবিশ্বাসে পরিপূর্ণ ছিলাম যে ঠিক কোন পথে জরাগ্রস্ত এই সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের পরিকল্পনা ছকতে হবে। কারণ বার্দ্ধক্যহেতু এই সরকারের নিজের মৃত্যুটাকেও ডেকে আনা সম্ভব ছিল না।

১৬ই নভেম্বরের নির্বাচনে ফ্যাসিষ্ট দল নিদারুণ ভাবে পরাজিত হয়। শুধু অন্যের ভাগ্যেই নয়, আমার ভাগ্যেও একই রকমের পরাজয় ঘটে। আমাদের দলের মধ্যে একজনও পার্লামেন্টের সদস্য হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় ভোট পায় না। তবে কয়েকজন ন্যাশানালিষ্ট রোম থেকে নির্বাচিত হয়ে এই বিশৃঙ্খলার রাজত্বে জাতীয় চরিত্র এবং পরিকল্পনা কিছুটা হলেও তুলে ধরতে সমর্থ হয়। মিলানে নির্বাচিত হ'তে গেলে যে সংখ্যায় ভোট চাই, তার চেয়ে আমি অনেক পিছিয়ে ছিলাম। ব্যাপারটা দুঃখজনক হলেও সময়ের সঙ্গে সঙ্গে শুধু মজার ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায় না, পরাজিতদের কাছে উল্লেখযোগ্য উদাহরণও বটে।

আমাদের ভেতরের অস্বস্তিটা আরো তীব্র হয়ে ওঠে; জনতা তা'হলে ফ্যাসিষ্টদের বিরুদ্ধে। জনতার মধ্যের স্বপ্নটা যেন আবছা হয়ে আসে। মনের মধ্যে কালো একটা হতাশা ঘুরপাক খেয়ে চলে। বলশেভিজিম কি তা'হলে আসছে। সমস্তরকমের কর্ম চাঞ্চল্য বন্ধ হয়ে গিয়ে তা'হলে কি ইতালির বুকে চেপে বসবে সোভিয়েত।

যা আবান্তি ইতিমধ্যে পত্রিকার তরফ থেকে ওদের পরিকল্পনা বিস্তারিতভাবে প্রকাশ করেছিল। আমার পরাজয় কিন্তু আমাকে ভবিষ্যত চিন্তাধারা থেকে এতোটুকু বিচ্যুত করতে পারে নি। বরং এটা আমাকে বর্তমানের হতাশাজনক পরিস্থিতি সম্পর্কে স্বচ্ছ এবং পুঙ্খনাপুঙ্খ দৃষ্টি এনে দিতে সাহায্য করেছিল। সোশ্যালিষ্ট সংবাদপত্র আমার সম্পর্কে ছোট্ট একটা ব্যঙ্গ খবর ছেপেছিল।

ঃ নাভিজিলিয়োতে একটা মৃতদেহ ভাসমান অবস্থায় পাওয়া গেছে। নাভিজিলিয়ো নামে যে ছোট্ট খালটা মিলান শহরকে দু'ভাগে ভাগ করেছে, সেই খালের জল থেকে রাত্রিবেলা একটা মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। দলিল দস্তাবেজ অনুযায়ী মৃতদেহটা হলো বেনিতো মুসোলিনির—ওর রাজনৈতিক মৃতদেহ। তবে ওরা কিন্তু লেখে নি যে মৃতদেহের চোখ দু'টো ভবিষ্যতের দিকে জ্বল জ্বল করে তাকিয়ে ছিল।

সোশ্যালিষ্টরা কিন্তু বিজয় উৎসবের মধ্যেও কবর দেওয়ার নকল অভিনয় করার কথা ভোলেনি। এই তথাকথিত শোক শোভাযাত্রা রাস্তাগুলোর মধ্যে দিয়ে একটা কফিনের চারপাশে মোমবাতি জ্বালিয়ে এগিয়ে চলে। বাতাসে সেই ইতর ধর্মসংগীতের সুর ছড়িয়ে দিয়ে। এই অভিনব শোকযাত্রা কিন্তু তখনকার নীচ এবং নোংরা পরিবেশকেই ইঙ্গিত করে। এই নকল শোভাযাত্রাটা মিলান শহরের রাস্তাঘাট ঘুরে শহরতলীর দিকে এগিয়ে যায়। শহর মিলান তখন ন্যাশালিষ্টদের পুরোপুরি দখলে। মিছিলটা আমার বসতবাড়ির জানালাগুলোর নীচ দিয়ে চলে যায়। স্বভাবতই আমার পরিবারের সবার তখন ভীত সন্ত্রস্ত অবস্থা।

সন্ত্রাসবাদীদের দাপটে বাতাসও তখন রীতিমতো কাঁপছে। সেদিনগুলোর কথা কিন্তু আমি আজও ভুলি নি; তবে সব সময় ব্যাপারটাকে দুঃখজনক পরিস্থিতির শিকার বলেই মেনে নিয়েছি। তাই সেদিনের সেই ইতর শোভাযাত্রাটাকে কোনরকম গুরুত্ব দেওয়াটাও ঠিক হবে না।

পার্লামেন্টের নির্বাচনে সোশ্যালিষ্টরা একশো পঞ্চাশটা সিট পায়। তবে ওদের এই ধাপে ধাপে উন্নতির বহর দেখে ওরা নিজেরাই ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে। দক্ষিণ ইতালি কিন্তু পরিস্থিতিকে সামাল দেয়। কারণ দক্ষিণ ইতালির লোকেরা পার্টির চেয়ে মানুষটাকে অনেক বেশি দাম দিয়ে থাকে।

তবে এই জয়ে অধিকাংশ সোশ্যালিষ্টদের অবস্থা হয় আঙুল ফুলে কলাগাছের মতো; ওদের ভেতরে শাসন করার তীব্র ইচ্ছা জেগে ওঠে। ক্ষমতার অপব্যবহার করার প্রতি ওদের স্পৃহা বরাবরের। অসংখ্য লাল পতাকা ঘাড়ে নিয়ে রাস্তায় রাস্তায় মিছিল করে ঘোরে। পুরো এক সপ্তাহের ধর্মঘট ডাকে। প্রতিবাদের জন্য নয়; স্রেফ বিজয় উৎসব পালন করতে।

মিলান মিউনিসিপ্যালিটি বিল্ডিংয়ের ওপরে লাল পতাকা উড়ানোর দাবীতে প্রায় হাজার তিরিশেক লোক জমায়েত হয়ে চিৎকার সোরগোল জুড়ে দেয়। নির্বাচনে জেতার সেই ভোর সকালে সমস্ত প্রতিষ্ঠানের আইন কানুনের খোল নল্‌চে এইরকম ভাবে বদলে দেয় যে সাধারণের জীবনযাপন করা অসম্ভব হয়ে ওঠে।

কেউ-ই আর কাজকর্ম করার দিকে মন দেয় না। সেটা একেবারে সারির শেষে ফেলে রাখে। একমাত্র মুষ্টিমেয় ফ্যাসিষ্ট, আরদিতি এব ফুউমেনরা এই সদ্য মাতাল অবস্থা থেকে ইতালিকে আপ্রাণ বাঁচাতে চেষ্টা করে। আর সেই কারণে এই রকম একটা ঘটনা ঘটে যা মানুষকে আরো তাতিয়ে দেয়। কয়েকটা ছোঁড়া বোমায় কয়েকজন মারা যায়; বেশ কিছু লোক আহতও হয়। পার্লামেন্টের কয়েকজন সদস্য মিলে একটা কমিশন তৈরি করে। যার প্রধান হয় ফিলিপো তুরাতি। দলবেঁধে কমিশনের সবাই প্রিফেচুরা অর্থাৎ মিলানের গভর্নরের অফিসে হাজির হয়ে আমাকে এবং সেই সঙ্গে ফ্যাসিষ্ট চীফকে গ্রেপ্তার করার দাবী জানায়।

সেই সময়ের রাজনৈতিক পরিবেশ এবং পরিস্থিতি ছিল নিস্ফল আর ছলচাতুরীতে ভরা। শাসকবর্গ সব সময় নিজেদের দুর্বলতা দেখানোয় এবং আতঙ্কগ্রস্ত থাকায় সোশ্যালিষ্টদের তুইয়ে চলতে হয়েছে। আমার স্বচ্ছ আর সোজা সরলগতির রাজনৈতিক ধ্যান-ধারণা এবং কার্যকলাপ কিন্তু এই ক্ষমতার অপব্যবহারের দরুণ এতোটুকু ক্ষতিগ্রস্ত হয় নি। মাত্র একদিন জেল খেটে বেরিয়ে এসে সহকর্মিদের নিয়ে ভবিষ্যতের পরিকল্পনা ছকতে বসি। আমাদের এখন কি করা কর্তব্য? ক্ষতিগ্রস্থ ইতালিকে সারিয়ে তুলতে কিভাবে আমাদের কাজ সুরু করবো?

নির্বাচনী ট্রাজিডি আমাদের সেন্ট্রাল কমিটিকে ভেঙে টুক্‌রো টুক্‌রো করে দেয়। অনেককেই পুলিশ গ্রেপ্তার করে। বহু সদস্য পুলিশের শাসানি খেয়ে দলত্যাগ করে পালিয়ে যায়। ধীরে ধীরে অবশ্য পরিস্থিতি শান্ত হয়ে আসে; পোপোলো দ্য ইতালিয়াতে আমাদের কারণগুলো প্রকাশিত করে আবার দলটাকে গঠনের চেষ্টা করি। বহু জমায়েতে ইতালির এই হতদরিদ্র পরিস্থিতির বিপদজনক দিকের বিশ্লেষণ করে ফ্যাসিষ্টদের উদ্দেশ্যও খুলে বলি।

সোশ্যালিষ্টদের বিজয় কিন্তু তেমন বিপদজনক কিছু ছিল না। কারণ জয়ের পর ওদের দুর্বলতা আর অক্ষমতা প্রকট হয়ে ওঠে। আর সোশ্যালিষ্টদের এই জয় লিবারেল এবং ডেমোক্র্যাটদের ধ্বংস করে দেয়। কিছুদিন ধরে নীচু গ্রামে গুপ্তভাবে জার্মান আর অষ্ট্রিয়ার দেশগুলোর পরাজয় সম্পর্কে বিভিন্ন কাহিনী ছড়িয়ে দেওয়া হয়। এই কাহিনী গুলো বিভিন্ন ভিয়ানে চাপিয়ে রকমারী পাকে তৈরি করা হয়েছিল। সেই কাহিনীগুলোর মাধ্যমে কখনো বলা হয় যে অধ্যাপকরা জীবন ধারণের নিমিত্ত চাকর বা বাসনপত্র মাজার কাজ নিয়েছে। রাশিয়ার রাজকুমারীরা পেটের দায়ে ব্যালেরিণার কাজ বাধ্য হয়ে করছে। আর জেনারেলরা রাস্তায় রাস্তায় দেশেলাই ফেরী করে ঘুরছে। এইসব কাহিনীর সঙ্গে সোশ্যালিষ্টদের জয়ের দরুণ সমাজের সব স্তরের মানুষদের মেরুদণ্ড বেয়ে ভয়ের একটা ঠাণ্ডা স্রোত বয়ে যায়। আর আমি বুঝতে পারি যে রাজনৈতিক পক্ষাঘাতগ্রস্ততা এবং দুর্নীতিতে পুরো সমাজটা ধীরে ধীরে ডুবে যাচ্ছে। পুরনো রাজনৈতিক দলগুলো খরগোসের মতো ভীরু সোশ্যালিজমের কাছে পরাজিত। আর এই সোশ্যালিজমের লক্ষ্য বলতে কিছু ছিল না। অপরের ভীরুতার সুযোগ নিয়ে এই সোশ্যালিজিমের জয় সংগঠিত হয়েছে; এই কাপুরুষতার প্রধান কারণ হলো জনসাধারণের মধ্যের ছড়িয়ে পড়া অস্বস্তি। সুতরাং নিশ্চিতভাবেই বলা চলে কোন বিশ্বাস বা লক্ষ্যকে সামনে তুলে ধরে ওদের এই জয় আসে নি।

এখানে বলা বোধহয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে আমি আমার পতাকার একটা কোণাও মুড়ি নি। কিন্তু সম্পাদকীয় দপ্তর তখন প্রায় ফাঁকা বললেই চলে। পত্রিকার পাঠক-পাঠিকার সংখ্যাও দ্রুত কমে যাচ্ছে। এই সময় আমি তিক্ত হলেও বেশ কয়েকবার সম্পাদকীয়র মাধ্যমে উপদেশ দেই—প্রতিরোধ, প্রতিরোধ এবং আরো প্রতিরোধ।

সম্পাদকীয় অফিসের বাইরে ছোট্ট একটু জায়গা সুরক্ষিত করে রাখি। পত্রিকাটা ধীরে ধীরে নিঃসঙ্গ হ'তে থাকে, প্রতিদিন সেন্সারও হয়। এতো দুর্যোগ আর দারিদ্রতার মধ্যেও ছোট্ট এই পত্রিকাটাকে বাঁচিয়ে রাখি। সবচেয়ে বেশি করে গলা চেপে ধরে এই অর্থনৈতিক খামতি। পত্রিকাটা বেচে দিতে পারতাম; কিন্তু বিক্রী করি নি।

ইতিমধ্যে নিটি সরকার, আমার কাছে অনেককে পাঠিয়েছিল যাতে আমি সাউদার্ন রাশিয়াতে গিয়ে স্বশাসিত প্রজাতন্ত্রের ব্যবস্থা দেখে আসি। অর্থাৎ ওরা এই ফাঁকে পত্রিকাটাকে তুলে দিতে পারে। আমি সঙ্গে সঙ্গে ওদের দ্বৈত খেলা বুঝতে পারি। ওরা যখন ডি আনুনজিয়াকে অনুরোধ করেছিল রোম থেকে টোকিও উড়ে যেতে, তখন ঠিক এই একই খেলা খেলেছিল। কিন্তু আনুনজিয়া পুরো ব্যাপারটা বুঝতে পেরে টোকিও না গিয়ে আজও ফিউমেতে প্রতিরোধ করে চলেছে। আর আমি পত্রিকার সাহায্যে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়া ফ্যাসিষ্ট দলটাকে আবার একত্রিত করার কাজে ব্যস্ত। প্রায়ই মিটিং ডাকতাম। মোদ্দাকথা আমার লক্ষ্য থেকে আমি এক নিমেষের জন্য হলেও লক্ষচ্যুত হই নি। যে জানোয়ারটা এক নাগাড়ে বাদ্যি বাজিয়ে চলেছে, সেটার মুখ আমি দেখি নি তা' কখনোই বলা যাবে না।

নির্বাচনের ঠিক পরেই পোষ্টাল নিয়ম কানুন মোতাবেক ব্যক্তিগতভাবে আমাকে মিলানের পোষ্ট অফিসের একটা জানালায় হাজিরা দিতে হয়। ফিউমে অভিযানের খরচ খরচা বাবদ বিভিন্ন ইতালির উপনিবেশ থেকে পাঠানো বেশ ভালো রকম টাকা সাহায্য

হিসেবে পাওয়ার ব্যাপারে। সেন্ট্রাল পোষ্ট অফিসের বিরাট বাড়িটার দেওয়ালে দেওয়ালে তখনো সদ্য হয়ে যাওয়া নির্বাচনের স্পষ্ট ছাপ ছড়ানো ছিটানো। ফিস্ ফিস্ স্বরে আলোচনা, দেওয়ালে ষ্টেনসিলের লেখা সর্বত্র। ভাই আরনালডোর সঙ্গে যে জানালায় মানি অর্ডারের টাকা দেয় সেইখানে গিয়ে উপস্থিত হই।

কৌতুক করার জন্য বলশেভিক কেরানী বলে যে আমাকে পরিচিত করার প্রয়োজনে আরো এক ব্যক্তির সাক্ষ্য দরকার। কারণ সে বেনিতো মুসোলিনি নামে কাউকে চেনে না। ছোটখাটো তর্ক-বিতর্কের দরুণ আরো কয়েকজন বলশেভিক কেরানী এগিয়ে এসে বলে যে ওদের মধ্যেও কেউ বেনিতো মুসোলিনিকে আগে কখনো দেখে নি। ইচ্ছে করে পায়ে পা দিয়ে এই ঝগড়ায় কাজকর্ম শিকেয় ওঠার যোগাড় হ'তে বৃদ্ধ একজন কেরানী এগিয়ে আসে। দেশের বিশ্বস্ত সরকারী কর্মচারী এবং সোশ্যালিষ্ট মদে মাতাল নয়। সে বলে,—মানি অর্ডারের টাকাটা দিয়ে দাও। অসভ্যতা করো না। মুসোলিনি নামের পরিচিতি শুধু এখানেই নয়, একদিন এই গণ্ডী পেরিয়ে সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়বে।

এই ভদ্রলোকের নাম কিন্তু আমি কখনো জানতে পারি নি। তিনি সহজ সরল এবং সোজা প্রকৃতির মানুষ ছিলেন।

সোশ্যালিষ্টদের জয়ের বিরুদ্ধতার কিছু চিহ্ন তখনই প্রকাশ পাচ্ছিলো। একদিন পত্রিকার সম্পাদকীয়র দপ্তরে বসে দেখি যে আমার সহকর্মীরা সবাই চরম উদ্বিগ্নতায় ভুগছে। তাদের ধারণায় আমার নির্দিষ্ট কাজকর্মে আমি মন দিচ্ছি না। সুতরাং প্রয়োজন বোধ করি তাদের কাছে আমার ভবিষ্যত পরিকল্পনা এবং স্বপ্ন তুলে ধরার। বলি ঃ তোমরা ভয় পেও না। ইতালি একদিন এই অসুস্থ অবস্থা নিশ্চয়ই কাটিয়ে উঠবে। তবে তীক্ষ্ম দৃষ্টি না রাখলে এই অসুস্থতা মারাত্মক হ'তে বাধ্য। আমি প্রতিরোধ করবো। হ্যাঁ, প্রতিরোধ। বাস্তবিকপক্ষে আগামী দু'বছরের মধ্যে আমাদের পালা আসবে।

।। ক্ষয়িষ্ণু গণতন্ত্রের মৃত্যু-যন্ত্রণা ।।

আমি নিঃসন্দেহে বলতে পারি যে অক্ষম পার্টি এবং পার্লামেন্টারী গণতন্ত্রগুলোর মৃত্যুর কারণ একই; এবং সেই একই ধরনে চালিত হয় বলে এইগুলোর ভবিষ্যতও ক্ষয়িষ্ণু হয়ে দাঁড়ায়। একটাকে তো চোখের ওপরে মরতে দেখেছি আর অপরটার তো মৃত্যু-পূর্বের মুমূর্ষু অবস্থার শ্বাস টানার শব্দ শুনতে পাচ্ছি।

কিন্তু এই বছরগুলোতে আমাদের আত্মা যেন নিরন্তর পরীক্ষা দিয়ে চলেছে। চোখের সামনে যেন সিনেমার পর্দায় দেখা ভেসে যাওয়া বিশৃঙ্খলা এবং শয়তানি কার্যকলাপের সারি ভেসে যাচ্ছে। যে সত্যিকারের দেশকে ভালোবাসে, তার কাছে এর চেয়ে দুঃখের বিষয় আর কিছু হ'তে পারে না। সর্বোপরি এই শক্তিগুলো হলো কপট এবং অকিঞ্চিৎকর।

১৯১৯ সালের ১৬ই নভেম্বরের নির্বাচন ইতালির রাজনৈতিক জীবনের ওপরে রঙীন প্লাইউডের একটা টুক্‌রো সেঁটে দিয়েছে মাত্র। আন্তর্জাতিক বা স্বদেশীয় কোন গভীর সমস্যার সমাধান করা দূরে থাক, মাইক্রোস্কোপের কাঁচের মাধ্যমে সেই সমস্যাগুলোকে দেখার চেষ্টাও করা হয় নি। বরং সব সমস্যাগুলোই গরম করে রাজনৈতিক দলগুলো বর্শা

হাতে পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বীতার নিমিত্ত মুখোমুখি দাঁড়িয়েছে। স্বাভাবিকভাবে বিক্ষুব্ধ অসংগত দেবত্ববোধ যেন নতুন মন্ত্রীরা ইচ্ছে করেই তার ওপর আরোপ করতে চেয়েছে।

সোশ্যালিষ্টরা পুরো ব্যাপারটার ওপরে ওদের কর্তৃত্ব বজায় রাখতে সচেষ্ট থেকেছে; সরকার যখন চরম বামপন্থী অর্থাৎ কম্যুনিষ্টদের কার্যকলাপে অস্থির, তখনই ওরা সরকারকে প্রচণ্ড টানাপোড়ানির মধ্যে ফেলেছে।

একবিংশ বিধানসভা আরম্ভের ঠিক আগে রাজার বক্তৃতা দেওয়া নিয়ে সাড়ম্বরে একটা অনুষ্ঠান হওয়ার সময়ে নিটি সরকার বেশ বিপাকে পড়ে। ওরা সোস্যালিষ্টদের কিছুটা সংযমে ধরে রাখার চেষ্টা করে। কিন্তু সোশ্যলিষ্টরা রাজার বিরুদ্ধে ওদের বিক্ষোভ চেপে রাখতে পারে না। আমি অবশ্য আগেই খবর পেয়েছিলাম যে রাজার বক্তৃতা দেওয়ার সময় সোশ্যালিষ্টরা সভা বয়কট করে অনুপস্থিত থাকবে।

রাজা পার্লামেন্ট ভবনে ঢোকার মুখেই ওরা বিক্ষোভ দেখায়। কিন্তু কি সেই বিক্ষোভ? সোশ্যালিষ্টরা পাটলবর্ণের ফুল কোটের বোতাম ঘরে আটকে দলবেঁধে শ্রমিকদের গান এবং আন্তর্জাতিক একটা সুর ভাঁজতে ভাঁজতে রি-পাবলিকান, ইনডিপেনডেন্স এবং কম্যুনিষ্টদের সঙ্গে হল ছেড়ে বেরিয়ে যায়।

জাতির অখণ্ডতা যারা ধ্বংস করছে—সেই ধ্বংসকারক শক্তিদের বিরুদ্ধে রাজার বক্তৃতায় কোন বক্তব্য-ই ছিল না। জাতীয় অখণ্ডতা যারা রক্ষা করার জন্য প্রাণ সঁপে বসে আছে, সেই ফিউমে অভিযান সম্পর্কেও রাজা নীরব থাকাই শ্রেয় মনে করেছিল। এমন কি সেই বক্তৃতায় সার্বভৌম কিছু অধিকারের কথাও বলা হয় নি। আমাদের উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত বেশ কিছু সম্পত্তির কথাও রাজার বক্তৃতায় কোন উল্লেখ না থাকায় যুদ্ধ ফেরত প্রায় বৃদ্ধ সৈনিক, যোদ্ধা এবং আহতরাও বেশ ক্ষুব্ধ হয়ে পড়ে। বিশেষ করে আমাদের বিদেশ নীতি যখন কুকুরের মতো ক্রমাগত চিৎকার করে চলেছে, অর্থনীতির অবস্থা টলটলায়মান—তখন পুরো ব্যাপারটা মনে হয় ক্লকরুমের মধ্যে টেবিল, চেয়ার এবং বেঞ্চ ইত্যাদির জায়গা পরিবর্তন করে রাখা হয়েছে মাত্র। আর মন্ত্রীদের মধ্যে তো চেয়ার দখলের কুৎসিত প্রতিযোগীতা চরমে উঠেছিল।

প্রথম তিনমাসে নিটি মন্ত্রীপরিষদের তিনবার পতন হয়। কোন রকমে অনেক কমরেডের পর নিজের নিজের চেয়ারগুলো ওরা ধরে রাখতে সমর্থ হয়।

ষ্টাম্পা—প্রাচীন বহুল প্রচারিত উদারপন্থী একটা সংবাদপত্র তো যুদ্ধে ইতালির জড়িয়ে পড়া নিয়ে আইনি পদ্ধতি সুরু করার কথা প্রচার করতে থাকে। বিশেষ করে জিয়োভানি জিয়োলিটি, যে চরিত্রগতভাবে সবচেয়ে বেশি নিরপেক্ষতা বজায় রাখার চেষ্টা করেছে, তার বিরুদ্ধেই সবচেয়ে বেশি সোচ্চার হয়ে ওঠে। জনপ্রিয় দলগুলোর সঙ্গে মিলে চার্চও এই পরিস্থিতিতে সবচেয়ে বেশি ফয়দা তুলতে চেষ্টা করে। জয়ের জন্য যে প্রস্তুতির প্রয়োজন, সোশ্যালিষ্টদের মধ্যে তার এতোটুকুও ছিল না। তাই জয়ের প্রচেষ্টা ওদের বিপদের কাদায় ফেলে দেয়। কারণ আমি নিশ্চিত জানতাম কম্যুনিষ্ট এবং চরম দক্ষিণ পন্থীদের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রেখে চলা ওদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। একদিকে হলো জাতি, অপরদিকে অপরিণামদর্শী আর ফাঁকা চরিত্রের রাজনীতি।

ইতিমধ্যে গাব্রিয়েল ডি আনুনজিয়াকে যেমন পঞ্চম বাহিনীর দালালদের হাত থেকে নিজের লিজিয়ান সৈন্যদলকে রক্ষা করতে হয়েছে, অপরদিকে তেমনি অবরোধকেও

প্রতিরোধ করার প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। কারণ ফিউমে তখন দলে দলে এই দালালরা এসে ভীড় করছে। ১৬ই নভেম্বর, ১৯১৯ সালের নির্বাচনে পরাজয়ের পর আবার ফ্যাসিস্ত শক্তি তখন দানা বাঁধতে শুরু করেছে। তবে সমস্ত আবহাওয়াটাই যেন নিস্প্রভ আলোয় ঘেরা। স্বার্থপরতা, কাপুরুষতা আর নীচতায় ভরা বাতাসে নিঃশ্বাস নেওয়াটাও যেন কষ্টকর হয়ে ওঠে। যাইহোক আমরা তখন সেই ঘোলাটে আবহাওয়ার মধ্যে দিয়েই আমাদের ভবিষ্যতের পথ দেখতে সুরু করেছি।

ফ্যাসিষ্ট সংগঠনকে সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে আবার সাজানো কঠিন হলেও অসম্ভব ব্যাপার কিছু ছিল না। কারণ নির্বাচনী বিপর্যয়ের পরে ফ্যাসিসি ডি কমবাটিমেন্টো অর্থাৎ আলোর ঝাড় আগের চেয়ে অনেক বেশি সুসংহত, উৎসাহী এবং শৃঙ্খলপরায়ণ হয়েছে। উপরন্তু ফ্লোরেন্সে অনুষ্ঠিত ফ্যাসিষ্ট সম্মেলনে শুধুমাত্র কুশলী নেতৃত্বের দেখাও মেলে। ফ্লোরেন্স শহরেই সেবার ইতালির ফ্যাসিসি ডি কমবাটিমেন্টোর প্রথম আন্তর্জাতিক সম্মেলন ডাকা হয়েছিল। চরিত্রগতভাবে এই সম্মেলন ছিল তুলনাহীন। অনুগত ফ্যাসিষ্টরা এই জমায়েতে অধিকার পেতে নিজেদের বক্তব্য রিভালবারের মাধ্যমে বলেছিল। দয়া এবং আতিথ্যের জন্য বিখ্যাত শহর ফ্লোরেন্স কিন্তু ফ্যাসিষ্টদের বিপুল দাঙ্গা-হাঙ্গামার মধ্যে জায়গা করে দিতে বাধ্য হয়েছিল। গোপন জায়গায় ওত্ পেতে থাকা হঠাৎ আক্রমণ ইত্যাদি বিরোধিপক্ষের সবরকম বাঁধাদানের মধ্যেও সম্মেলন করে ফ্যাসিস্টরা। আমাদের বন্ধুরা পুরো ঘটনা প্রবাহগুলো সংগঠিত করতে যে সক্ষম হয়েছিল তা'তে সন্দেহ নেই। প্রচুর ধৈর্য ধরে আর উদ্যমের সঙ্গে ওরা বিরুদ্ধপক্ষের সমস্ত রকমের প্রতিরোধ এবং দাঙ্গা হাঙ্গামা ব্যর্থ করে দিয়েছিল।

ফ্লোরেন্সের এই মিটিংটাই যেন সারা আকাশ জুড়ে তৎকালীন সরকারের আসল সমস্যাগুলো চোখের সামনে তুলে ধরেছিল। আকাশ-দেওয়ালের লেখা ফুটে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে ৯ই অক্টোবর আমি কোনরকম প্রস্তুতি না নিয়েই একটা বক্তৃতা দেই। জাতির ধ্বংসোন্মুখ শক্তিগুলোর প্রতি বিনীত আবেদন জানাই আমার সেই বক্তৃতার মাধ্যমে। পরের দিন কবি এফ টি মারিনেটি, পাসেলার সেক্রেটারী একটা কার্যক্রম উপস্থিত করে যাতে ফ্যাসিসি ডি কমবাটিমেন্টো ইতালির ভিত্তিমূলটাকেই আমূল পরিবর্ত্তন করতে চায়। এই কার্যক্রমে পরিষ্কার ভাবে বলা হয়েছিল যে রাজনীতির পথ ধরে কিভাবে সামাজিক এবং অর্থনৈতিক উন্নতি ইতালির পক্ষে করা সম্ভব। সম্পূর্ণ নতুন একটা পথের দিশারী যে ছিল এই কার্যাক্রম তা'তে সন্দেহ নেই।

আমি সেই কার্যক্রম শুধু বিশ্লেষণ-ই করি নি, সেই কার্যক্রমের বাস্তব রূপও দিয়েছি। পথের শেষে এসে যদি আমাকে কেউ জিজ্ঞাসা করে যে কোন্ কোন্ পথ ধরে আমি নিজেকে এই উন্নত জায়গায় নিয়ে এসেছি, তবে বলবো সেদিনের পরীক্ষা-নিরীক্ষা, ভুল-ভ্রান্তি আমার ভবিষ্যতের পথ নির্দেশক হিসেবে বর্তমান জায়গায় নিয়ে এসেছে।

ফ্যাসিবাদকে কিন্তু তখন লোকে নিতে আরম্ভ করেছে। সত্যি বলতে কি লোকের মধ্যে তখন রব উঠে গেছে যে ফ্যাসিষ্ট শাসন ব্যবস্থা আগতপ্রায়। তবে সেই শাসন প্রণালীর সমস্যা হলো তখন পর্যন্ত কোন নির্বাচন পরিষদ গড়া হয় নি। সেই কারণে ১০ই অক্টোবরের এক বিকেলে আমি একটা কার্যক্রমের কথা ঘোষণা করি ঃ অর্থনৈতিক মুক্তি এবং স্বায়ত্তশাসনের জন্য আন্দোলনে শ্রমিকদেরও সামিল হ'তে হবে। আমরা অসংখ্য

প্রলেতারিয়েত এবং চাকরীজীবিদের কাছে শুভেচ্ছা পাঠাই যারা তখনো সেসব রাজনৈতিক দলগুলোকে মধ্যম অবস্থা থেকে টেনে তোলার চেষ্টা করছে; অর্থনৈতিক দিক থেকে সেইসব নেতাদের ফাঁপা বক্তৃতায় আস্থা রাখতে পারছিল না। মাঝে মাঝেই আমার অবাক লাগতো যে অন্যান্য জাতিরাও এই একই পথে তাদের চিন্তাধারার স্রোত বওয়ায় না কেন।

সেই মিটিংয়ের মূল উদ্দেশ্য-ই ছিল ফিউমের প্রতি শুভেচ্ছা জানানো এবং দলের মধ্যে সামঞ্জস্যহীনতা এবং রেষারেষি বন্ধ করা।

ফিউমে গিয়েছিলাম প্লেনে করে; সেখান থেকে ফ্লোরেন্সে ফিরে আসি। ফিউমে থাকাকালীন দীর্ঘ সময় ধরে প্রীতিপূর্ণ পরিবেশে আন্তরিকতার সঙ্গে গাব্রিয়েল ডি আনুনজিয়োর সঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা হয়। বিশেষ করে ইতালির বর্তমান পরিবেশ এবং পরিস্থিতিতে ঠিক কি করা উচিত—সেই ব্যাপারটাই আলোচনার বেশির ভাগ অংশ জুড়ে থাকে। ফিরে আসার সময় আপার আড্রিয়াটিক থেকে ধেয়ে আসা প্রচণ্ড ঝোড়ো বাতাস প্লেনটাকে উধাইন প্রদেশের আইলো বিমান বন্দরে বাধ্য হয়ে নামাতে হয়। দেরীর জন্য বিরক্ত হলেও ফ্লোরেন্সে যাওয়ার জন্য ট্রেন ধরি; এবং মিটিং সুরু হওয়ার ঠিক আগেই পৌঁছে গিয়ে সভাপতিত্ব করি। বিরুদ্ধপক্ষের সশস্ত্র হাঙ্গামার বিরুদ্ধে আমাদের প্রতিরোধ দেখে অত্যন্ত আনন্দিত হই। বলতে আপত্তি নেই যারা সেখানে সেদিন উপস্থিত ছিল, তাদের মধ্যে আমার নৈরাশ্য-ই বোধহয় সবচেয়ে তলানীতে এসে ঠেকেছিল।

কিন্তু উৎসাহী জনতার চোখে আমি ছিলাম একজন দেশপ্রেমিক। প্রতিরোধ গড়ে তোলার পক্ষে আদর্শ শিক্ষক। পরের দিন পোপোলো দ্য ইতালিয়াতে প্রবন্ধ লিখে বিস্তারিত ভাবে জানাই কিভাবে বলশেভিজিমের ধ্বংসের সুরু হয়েছিল। ফ্যসিষ্ট ষ্টাইলেই মিটিংটা শেষ হয়। প্রতিজ্ঞা করি পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে আবার দেখা করবো এবং যে কোন মূল্যে আমাদের জিততে হবে।

রামাগ্নাতে যাওয়ার জন্য আমি মোটরে রওনা দেই। গাড়ির চালক ছিল জিয়োভা পানসানি। ফ্লোরেন্সে যুদ্ধ ফেরত স্বেচ্ছাসেবক এবং বিমান চালক হিসেবে জিয়োভোর যথেষ্ট খ্যাতি ছিল। দক্ষ অ্যাথেলেট হিসেবেও ওর নাম কম ছিল না। সেই মোটর গাড়িতে পেনসানির শালা গ্যানষ্টোন গ্যালভানি এবং বোলোনিয়া রেলওয়ে ওয়ার্কশপের কর্মী লিওনার্দো আরপিনাটিও ছিল। তৎকালে বোলোনিয়ার এই রেলওয়ে ওয়ার্কশপ রাজনীতির ঘাঁটি ছিল। ফাহেনজাতে এসে আরফেম কাফে-সপের কাছে মোটর গাড়িটাকে থামাতে বলি। আমার কয়েকজন পুরনো বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করার জন্য। ওরা আমাকে শুভেচ্ছা জানায়। মোটরগাড়িতে চড়ে বসলে গাড়িটা দুরন্তবেগে ঊর্ধশ্বাসে ছুটতে গিয়ে একটা রেলওয়ে ক্রশিংয়ের বন্ধ করা গেটে ধাক্কা খায়। মোটর গাড়ির প্রচণ্ড ধাক্কায় প্রথম গেটের লোহার রেলিংটা ভেঙে টুক্‌রো টুক্‌রো হয়ে যায়। গাড়িটা রেলাইন পেরিয়ে দ্বিতীয় গেটে গিয়ে সজোরে ধাক্কা মারে। খেলনার মানুষের মতো ড্রাইভার পানসানি ছাড়া সবাই বেশ কয়েক গজ দূরে উড়ে গিয়ে পড়ি। আমার কিন্তু এতোটুকুও আঘাত লাগে নি; তবে আরপিনাটির আঘাতও ছিল যৎসামান্য। সুতরাং দু'জনে মিলে অপর দু'জন বন্ধু যারা গুরুতর আহত অবস্থায় প্রচণ্ড যন্ত্রণায় গোঙাচ্ছে, তাদের সাহায্যের জন্য চিৎকার করতে থাকি। লোকজন আমাদের চিৎকারে জড়ো হয়ে মোটরগাড়িতে শুইয়ে বলদ দিয়ে গাড়িটাকে টেনে নিয়ে ফাহেনজার একটা হাসপাতালে নিয়ে আসে। আহত দু'জনের অপারেসনের

সময় আমিও সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেই। যতোখানি সম্ভব ওদের আরামের ব্যবস্থা করি। শেষে ট্রেনে করে বোলোনিয়াতে ফিরে আসি। দুর্ঘটনাটা আরো ভয়াবহ হ'তে পারতো। কিন্তু ভাগ্য আমাদের সাহায্য করেছে। আমার মনে হয় বিরুদ্ধে দলের ঘৃণাই এই দুর্ঘটনার তুকতাকের জন্য দায়ী।

" আমি আগেই বলেছি ১৬ই নভেম্বর, ১৯১৯ সালের নির্বাচনে পরাজয়ের পর আমার অনেক বন্ধুই ভয় পেয়ে তৎকালীন রাজনীতির মূল স্রোতের বিরুদ্ধে যেতে বারণ করে। সব সময় সব দলেই এই ধরনের লোকের দেখা পাওয়া যায়। ওরা বলেছিল যে বিরোধী পক্ষের সঙ্গে একটা আঁতাতের প্রয়োজন। কারণ রাজনীতিতে ওরা প্রধান প্রধান জায়গাগুলো দখল করে বসে আছে। এমন কি পার্লামেন্টেও ওদেরই আধিপত্য। রফা আলোচনা এবং চুক্তি—সবকিছুর জন্য আমাকে আহ্বান জানানো হয়েছিল।

যে কোন চুক্তির ব্যাপারে আমি মুখের ওপরে সোজাসুজি না বলে দেই। আমি মুহূর্তের জন্যও ভাবি নি যে যারা যুদ্ধের সময় ইতালিকে বর্জন করেছে এবং বর্তমানে ইতালির শান্তি বিঘ্নিত করছে—তাদের সঙ্গে হাত মেলাবো। অনেকেই সেই সময় আমাকে বুঝতে পারে নি, এমন কি আমার অতি নিকট বন্ধুরাও নয়। পোপোলো দ্য ইতালিয়ার দু'জন সম্পাদক আমার কাছে কাজ ছাড়ার অনুমতি চায়। ওরা বলে যে রাজনৈতিক রাস্তা এবং বাড়ির ঠিকানা বদল করেছে। ওদের ধারণায় নির্বাচনী যুদ্ধের সময় সংগ্রহিত টাকা-পয়সা পোপোলো দ্য ইতালিয়াতে খরচ না করে আমি ফিউমে অভিযানে সাহায্য করেছি। সুতরাং নিজের নিকটতম বন্ধুদের কাছ থেকেও আত্মরক্ষার ব্যাপারে আমার তিক্ত অভিজ্ঞতা হয়।

আমার বিরুদ্ধে চার্জগুলোর শুনানির জন্য লম্বারডিয়ান জার্নালিষ্ট কনভেনসানে এসে হাজির হই। যাতে আমার বক্তব্যও ওদের সামনে তুলে ধরতে পারি। প্রচুর যুক্তি সহ আমার বক্তব্য সংক্ষিপ্ত কিন্তু সোজাসুজিভাবে দাখিল করি। বোর্ডের পক্ষে আমার বক্তব্য মেনে নেওয়া ছাড়া অন্য কোন পথ ছিল না। পরে নিন্দুকগুলো আর সময়ক্ষেপ না করে বাধ্য হয় নিজেদের ভুলগুলো শুধরে নিতে।

কিন্তু ইতিমধ্যে ব্যাপারটা নিয়ে চারদিকে শোরগোল পড়ে যায়। বিশেষ করে সোশ্যালিষ্ট আর পপুলার পার্টির সদস্য পাদ্রীরা তো রীতিমতো যুদ্ধের ভঙ্গীতে ব্যাপারটা নিয়ে রাস্তায় নেমে পড়েছিল। মনুষ্যরূপধারী নকুল জাতীয় কিছু জানোয়ারকে আমার জীবনের ফাঁক ফোকর তন্ন তন্ন করে খুঁজে বের করতে চারদিকে পাঠানো হয়েছিল। আর এই কাজে সহায়তা করার জন্য সৈনিক এবং পুলিশদের ঘুষও কম দেওয়া হয় নি। গোপনে আমার সারাদিনের কাজকর্ম, বিশ্বাস ইত্যাদির ওপরেও তীক্ষ্ন নজর রাখা হয়েছিল। প্রতারক, বাতিল এবং অন্যমনস্ক মানুষগুলোর প্রতি যে কঠোর মনোভাব নিয়েছিলাম, সেই কারণে তারা সব সুযোগ পেয়ে এক জায়গায় হয়ে আমার বিরুদ্ধে ঘোট পাকাতে সুরু করেছিল। তবে বলাবাহুল্য আমার কোন ক্ষতি ওরা করতে পারে নি। লম্বা আর চওড়ায়, ওপর এবং নীচে এতো তদন্ত করেও ওরা আমাকে ফাঁসাতে পারে নি। ফিউমে অভিযানের টাকা পয়সা সংক্রান্ত সব দলিল দস্তাবেজ-ই আমার পত্রিকায় ছেপে দিয়েছিলাম—যা নিয়ে তর্ক-বিতর্কের কোন অবকাশ-ই ছিল না।

অনেক তদন্ত-টদন্তের পর আমার কাজকর্ম নিয়ে যে উপসংহার টানা হয়েছিল, আজও তা' সমান উপযোগী। অন্ততপক্ষে আমার জীবোদ্দশায় তার কোন হেরফের ঘটার কারণ

দেখি না। ন্যায় এবং সত্যের পথে চলেছিলাম বলে অন্তত সেই ব্যাপারে আমার ওপরে কারো হামলা করা সম্ভব ছিল না। আমার রাজনৈতিক কাজকর্ম নিয়ে আমার বিরুদ্ধে চিৎকার করা বা সোরগোল তোলা যেতেই পারে, যাতে আমাকে নীচে টেনে নামানো যায়। কিন্তু ন্যায়ের ক্ষেত্রে আমি ছিলাম অটুট, অনড়। মানুষের উচিত বিশ্বাস নিয়ে জীবনের ছন্দে পা মিলিয়ে পথ হাঁটা। হতাশাগ্রস্ত মানুষদের উজ্জীবিত করা। সত্যিকারের রাজনৈতিক নেতাদের উচিত কাজ হলো মনুষ্যত্বের দিকে দেখা আর মনপ্রাণ দিয়ে মানুষের উপকার করা। নিজের সমাজের প্রতি ভালোবাসা, দূরদৃষ্টি দিয়ে সমাজকে আরো কাছে টেনে নেওয়া। তবে এইসব গুণ চাটুকারদের মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায় না। ভাবতেও গর্ব বোধ হয় যে আমার মধ্যে এইসব গুণাবলী যথেষ্ট পরিমাণেই বর্তমান। যা আমার মানসিক ভিত্তিভূমি সৃষ্টিতে সাহায্য করেছিল।

আমার ধারণায় অন্যান্য গুণগুলো ছেড়ে দিলেও এই একটা গুণ-ই আমার শক্তি এবং ওপরে ওঠার সাফল্যের সিঁড়ি হিসেবে কাজ করেছে।

১৯২০ সালের প্রথমদিকে আন্তর্জাতিক চরম প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে ইতালি কোনরকমে দিন গুজরান করে চলেছিল। বিভিন্ন দেশের কূটনীতিকরা প্যারিসে বসে তখন আদর্শহীন নোংরা আলোচনায় ব্যস্ত। ডালমাটিয়া আর ডি আনুনজিয়োর নেতৃত্বে ফিউমের খোলা ক্ষত দিয়ে তখন অবিরাম রক্ত ঝরে পড়ছে। সোশ্যালিষ্টরা নির্বাচনে প্রচণ্ড রকমের জয় হাসিল করে ফেলেছে। কিন্তু দিনে দিনে সরকারে নিজেদের ঐতিহ্যবাহী স্থানটাকে ধরে রাখতে অক্ষম হয়ে পড়ে। কারণ কাজকর্মের মাধ্যমে নিজেদের ক্ষমতাকে ধরে রাখার কোন ক্ষমতাই ওদের ছিল না। নপুংসক রাজনৈতিক কার্যকলাপে তখন ওদের পার্টি ভরে গেছে। উগ্রপন্থীর দল সমাজের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার ধীর শান্ত ছবিটাকেই যেন উল্টে দেয়। লেনিন সম্পর্কে ঝকঝকে সব রূপকথা হাওয়ায় ভেসে বেড়াতে থাকে। ইতালির লিবারেল পার্টি তখন তাদের সমস্ত রকম বিশেষ অধিকারের থেকে হাত গুটিয়ে নিয়েছে। মন্ত্রীদের কাছ থেকে বিশেষ সুযোগ সুবিধা আদায় করে নেওয়ার জন্য সদস্যরা তখন ব্ল্যাক মেলিং থেকে সবরকমের নীচ পথ বেছে নিয়েছে। পার্লামেন্টের ভেতরে যেমন নিত্যদিন ঝড় চলেছে, বাইরের রাস্তায় তেমন অহর্নিশ লেগে রয়েছে রাজনৈতিক কোলাহল।

দেশের এই পরিস্থিতি এবং এই পরিবেশে জয় পেতে গেলে ক্রমাগত সংগ্রাম করে যেতে হবে। অনেক সময় মনে হ'তে পারে জয় দূরঅস্ত্; তবু সংগ্রামের বিরাম টানা চলবে না। সেই বছর যে প্রবন্ধটাকে দিয়ে সুরু করেছিলাম, সেটার নাম ছিল—দিগ্‌দর্শন করা যাক।

দুটো ধর্ম যারা পৃথিবীতে নিজের বিস্তারের জন্য মুখোমুখি সংঘর্ষে মেতেছে ঃ কালো আর লাল। দু'ই ভ্যাটিকান থেকেই বিস্তৃত প্রচারের জন্য চারদিকে চিঠি বিলি করা হচ্ছে। এক ভ্যাটিকান হলো রোম আর অপরটা মস্কো। আমরা যে এই ধর্মমতের বিরুদ্ধে তা' সোচ্চারে ইতালির জনগণকে জানিয়ে দেই। তাই সংস্পর্শের দ্বারা এই দুরারোগ্য ব্যাধির সংক্রমণের ভয় থাকে না। যুদ্ধ সম্পর্কে বাগ্ বিতণ্ডা আমাদের কাছে খুব একটা মূল্য পায় না। কারণ জানি সংগ্রামের একটা মূল্য আছেই। হয়তো বা যুদ্ধ জয়ের মুকুট মাথায় না চড়তে পারে।

সরকার মেরুদণ্ডহীন হলে যা হয়। একদল রাজনৈতিক নেতা সমস্ত পাব্লিক সার্ভিসে ধর্মঘট ডাকে। এই লাগামছাড়া অবস্থায় ফ্যাসিষ্টরা ধর্মঘটের মধ্যে তাদের জায়গা দৃঢ় হাতে

ধরে রাখে। জায়গা ছেড়ে এতোটুকুও নড়ে না। আমাদের মধ্যে কিছু মানুষ ফ্যাসিজিমে বিশ্বাস রেখে এই বিশৃঙ্খল পরিস্থিতিতেও যেভাবে তাদের কর্তব্য করে গেছে তা' আমার পক্ষে জীবনে ভোলা সম্ভব নয়। ধর্মঘটরত দেশোয়ালীদের করা সমস্তরকম লাঞ্ছনা-গঞ্জনা এবং হুমকি নীরবে আর নির্ভয়ে সহ্য করে নিয়েছে।

ইতিমধ্যে তীব্র ঘৃণা মিশ্রিত ন্যায্য দাবীর আওয়াজ তোলা জনগণের সামনে কয়েকজন সোশ্যালিষ্ট নেতা ভয়ে থর থর করে কাঁপতে থাকে। যেসব সোশ্যালিষ্ট নেতা এই ধর্মঘট ডেকেছিল, তাদের থেকে নিজেদের আলাদা করে নেওয়ার চেষ্টা করে। ঠিক এই সময়ে পোপোলো দ্য ইতালির ২১ শে জানুয়ারীর সংখ্যায় আমি একটি প্রবন্ধ লিখি। সেই প্রবন্ধের নামকরণ করি ঃ অনেক দেরী হয়ে গেছে।

আমি সেই জায়গাতেই বিশেষ করে আলো ফেলি, যেখানে ওদের ভবিষ্যত বক্তৃতার পর্দা ফেসে গেছে। সোশ্যালিজিমের কিন্তু এটাই সত্যিকারের অবস্থা।

ডানপন্থী নেতা ফিলিপো তুরাতির দলের লোকেদের আমি বলতাম তুরাসিয়ানস্। তাই লিখেছিলাম যে তুরাসিয়ানস্দের অনেক আগেই ঘুম ভেঙে জেগে ওঠা উচিত ছিল। এখন তো গাড়িটা ঢালু পথে তরতর করে তীব্র গতিতে ছুটছে; সংস্কার নামক ব্রেকটাতে ফাটল ধরেছে যাতে ব্রেকটার পক্ষে গাড়িটাকে আর সামলানো সম্ভব নয়। লিভার চেপে ধরে যারা গাড়িটাকে থামানোর চেষ্টা করবে, তাদের মিথ্যে শক্তি ক্ষয়-ই হবে। ঢালু পথের শেষে দাঁড়িয়ে রয়েছে বিশাল দেওয়াল। সেই দেওয়ালে ধাক্‌কা খেয়ে গাড়িটা শেষে টুক্‌রো টুক্‌রো হয়ে যাবে। সেই ভাঙচুরের মধ্যে থেকেই আত্মপ্রকাশ করবে সত্যিকারের জ্ঞান। ফরাসী গল্পলেখক লা ফনটাইনে যথার্থ-ই বলেছিলেন ঃ জাতি দুর্দশাগ্রস্ত হয়ে ধ্বংস হওয়ার আগেই মাথা মোটা নেতাদের বুদ্ধির উদয় হওয়া ভালো।

রেলের ধর্মঘট চলেছিল ২৯ শে জানুয়ারী পর্যন্ত আর বিদেশনীতি নিয়ে যেসব কূটনৈতিক তর্ক-বিতর্ক করেছিল, পরিণতিতে তা' আমাদের ধ্বংসই ডেকে আনছিল। আরদিতে, শ্রেণী সংগ্রামের ধাক্কায় সব থেকে উঁচু আদর্শও টুক্‌রো টুক্‌রো হয়ে ভেঙে পড়ছিল। দুঃখ-দুর্দশাগ্রস্ত ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের ফিউমে থেকে মিলানে আনার চেষ্টা করেছিলাম আমরা। ওরা অবরুদ্ধ শহরে আটকা পড়ে গিয়েছিল, যেখানে টাকা-পয়সা রোজগারের উৎস বলতে কিছু ছিল না। নিজেদের দুর্দশাকে মেনে নেওয়া ছাড়া ওদের সামনে আর কোন পথ খোলা ছিল না। ইতিমধ্যে আমাদের শত্রুপক্ষীয় ভিয়েনার ছেলেমেয়েদের কিন্তু ভিয়েনায় নিয়ে এসে তাদের দেখভাল করা হচ্ছিল। তা'হলে আটকে পড়া ইতালির ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা কি জাতির কাছ থেকে দয়া, স্নেহ এবং ভালোবাসা পেতে পারে না? ফিউমে কমাণ্ডের অনুমতি নিয়ে ফ্যাসিষ্টরা ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের যে দয়া প্রদর্শন করেছিল, তারজন্য সারা ইতালিতে জাগরণের একটা সাড়া পড়ে যায়? অসংখ্য লোক প্রতিটি স্টেশনে এবং রাস্তায় জমায়েত হয়ে ছেলেমেয়েদের অভ্যর্থনা জানায়। পত্রিকায় অবশ্য এই ছেলেমেয়েদের নিয়ে আসা সম্বন্ধে কিছু লেখা সম্ভব হয় না। কারণ সেন্সার তখন এই ছেলেমেয়েদের আসা নিয়ে কিছু লেখার ওপরে প্রতিবন্ধকতা টেনে দিয়েছে। এগুলো হলো আমাদের উৎসাহের পাহাড়টাকে ধারাবাহিক ভাবে ভেঙে দেওয়ার প্রচেষ্টার অংশবিশেষ। আর নিটি সরকারের সীসের চামচের ওপরে বিশ্রী দাগের মতো রাজনৈতিক এই পঙ্গুতা সবক্ষেত্রে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়েছিল।

এই লোকটাই নিজের নীচ এবং অনুপযোগী কূটনীতির মোড়কে সংসদে যে বক্তৃতা দিয়েছিল ফিউমের ওপরে, তা'তে স্লাভিয়ানদের প্রতি দরদ যেন উথলে পড়েছিল। সেই সময় উইলসন আবার ফিউমে এবং শহর দুটোকে ইতালি থেকে বিচ্ছিন্ন করে মুক্ত শহর হিসেবে লিগ্ অফ নেসানের অধীনে আনার জন্য রীতিমতো ওকালতি করতে সুরু করে দিয়েছে।

পরের দিন অর্থাৎ ৮ই ফ্রেব্রুয়ারী তারিখে আমার পত্রিকার প্রথম পাতায় একটা প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় ঃ এইচ ই কাগোইয়া—শামুকের দেওয়া ঘৃণ্য বক্তৃতা।

গাব্রিয়েল ডি আনুনজিয়োও এফ এস নিটিকে এই নামেই সম্বোধন করতো। বলাবাহুল্য নামটাও চারদিকে বিশেষ জনপ্রিয়তা পেয়ে গিয়েছিল। হেডলাইনের পরে ছোট্ট একটা সম্পাদকীয় লিখি। শিরোনামা দেই ঃ দুর্দশাগ্রস্ত।

এই প্রবন্ধে প্যারিসের আলোচনার টানা পোড়ানির দুঃখময় ঘটনার বর্ণনার পরে প্রবন্ধটা শেষ করি—সত্য হলো নিটি আবার আগের জায়গায় ফিরে যাচ্ছে। ও প্যারিসে গিয়েছিল ওর সার্ট খুলে রেখে আসতে। একগুঁয়ে জেদী যুগোশ্লাভিয়ানদের কাছে কাগোইয়া শুধু নীচতা আর কান্না ছাড়া আর কিছু রাখতে পারেনি। কাগোইয়ার পুরো বক্তৃতাটাই হলো নীচতায় ভরা। ঘৃণ্যও বটে। অষ্ট্রিয়া বা সমস্ত জার্মানী ঢুঁড়েও এইরকম নিকৃষ্ট মন্ত্রী পাওয়া সম্ভব নয়। ইতালিতে কেউ একজন থাকলে নিটির পক্ষে নেতা বা মন্ত্রী হওয়া সম্ভব ছিল না। বহু বিভাগের ভারপ্রাপ্ত এই মন্ত্রী মহোদয় যে কোন মূল্যে শান্তি কিনতে প্রস্তুত। ত্রেন্ট এবং ত্রিয়স্তে উদ্ধারের জন্য কাগোইয়া যুগোশ্লাভিয়ার প্রতিরোধ বাহিনীকে অস্ত্র দিতেও প্রস্তুত। ১৮৬৬ সালের শান্তি চুক্তি এই অশিষ্টতার তুলনায় অনেক বেশি গৌরবের ছিল। পরের বারের প্যারিস যাত্রায় কাগোইয়া নিশ্চয়ই আবার অস্বীকৃত বস্তুকেই স্বীকৃতি দিয়ে আসবে। জোরা? ভালানো? কে জানে। তবে দিয়ে যে আসবে তা'তে সন্দেহ নেই। গর্জ্জিয়াকে ওদের হাতে তুলে দিতেও স্বীকার করে নেওয়াটা অসম্ভব কিছু নয়। তারসঙ্গে তা'হলে মনফানকোন এবং টাগলিয়ামেন্টো লাইনটাকেই বা অস্বীকার করা কেন? সম্ভবত এই মূল্যেই আমাদের যুগোশ্লাভিয়ার সঙ্গে বন্ধুত্ব কিনতে হবে।

এই নিদারুণ অখ্যাতির মধ্যে জীবন ধারণ করার চেয়ে জার্মানীর নোস্কার অধীনে বসবাস করা অনেক ভালো। ইতালির কাগোইয়ের চেয়ে তো বটেই।

আমাদের সামনে আগামী দিনগুলোয় পড়ে আছে শুধু অপমান আর লজ্জা; কাপেরেটো বা আংবা কারিমার চেয়ে অবস্থা যে অনেক খারাপ তা'তে সন্দেহ নেই। আমরা আমাদের হরিয়ে যাওয়া শক্তি নিশ্চয়ই উদ্ধার করবো; কিন্তু তারজন্য প্রয়োজন কোন একজনের মূল্যদান।

সরকারের অন্তর্দেশীয় এবং বৈদেশিক নীতির প্রতি কয়েকটা সংবাদপত্র তো তর্ক-বিতর্কের ঝড় তুলে দিয়েছিল। বিশেষ করে জাতীয় জীবনে সেইসব নীতির অস্থিরতা দেখে। ষ্টাম্পা সংবাদপত্রের মাথায় বসেছিল সেনেটার ফ্রাস্‌ষ্টি। কিছুদিনের মধ্যে বার্লিনে যার রাষ্ট্রদূত হয়ে যাওয়ার কথা। আমার কলমের জোরদার লক্ষ্য ছিল সেই ফ্রাস্‌ষ্টি। যেসব পরিকল্পনা ওরা নিয়েছিল, সেগুলোর ওপরে আমি ঝাঁপিয়ে পরি। ওদের পরিকল্পনা ইত্যাদি দেখে মনে হয় যে আমাদের পিতৃভূমির দেশটাকে যেন বন্ধক দেওয়ার জন্য ওরা উঠে পড়ে লেগেছে। এখানে মনে রাখা প্রয়োজন যে ফ্রাসষ্টি ইতালি মহাযুদ্ধে যোগ দিক, এটা মনে

প্রাণে কখনই চায় নি। ইতালির জীবনে যখন রক্তের স্রোত বয়ে চলেছে, ফ্রাস্‌ষ্টি একপাশে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সেই শোকাবহ দৃশ্য দেখেছে মাত্র। যখন যুদ্ধ বিজয়ের পর শত্রুপক্ষ ইতালির সঙ্গে শান্তি চুক্তি করতে বাধ্য হয়েছে, তখন ফ্রাস্‌ষ্টির অক্ষমতাই পুরো ব্যাপারটার ওপরে চাদর টেনে দিয়েছে।

করিয়ারে ডেলা সেরা নামের পত্রিকাটার সুখ্যাতি ছিল যে এতে উদারপন্থী জনগণের মতামত প্রকাশ করা হয় বলে। উইনসন এবং আল্‌বাতিনির কথামতো ফিউমে আর ডালমাটিয়ার ব্যাপারে সালিসির প্রস্তাবকেই সমর্থন করে। এই দুজনে আবার সালভেমিনি আর নিটির আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়েছিল। লা আবন্তি বরাবর কম্যুনিষ্ট মতবাদকেই সমর্থন জানিয়ে এসেছে। জনতার কাছে আমাকে টেনে নীচে নামিয়ে নেওয়ার জন্য যতোখানি নীচ প্রচার চালাতে হয়, তা'তে কসুর করে না। সবচেয়ে অবাক করা হলো এই শূন্য অক্ষম সমালোচনাকে আবার পপুলার পার্টি আর গীর্জার পাত্রীদের ক্লাব মন প্রাণ খুলে সমর্থন করতে শুরু করে। কিন্তু সবচেয়ে প্রয়োজনীয় হলো এইসব নিন্দাবাদ সোচ্চার হয়েছিল ফ্যাসিজিম আর ইতালির যুদ্ধজয়ের বিরুদ্ধে।

ধর্মঘটগুলো চরিত্রের দিক থেকে পরিবর্তিত হয়ে হিংস্র দাঙ্গা-হাঙ্গামা ছড়িয়ে দেয় চারদিকে। বিশেষ করে পুলিশ, মিলিটারী আর জনসাধারণের মধ্যে জায়গায় জায়গায় তুমুল সংঘর্ষ বাধে। অন্তর্বর্তী পার্লামেন্ট চলাকালীন সদস্যরা চেয়ার টেবিল ছেড়ে এসে মেজেতে দাঁড়িয়ে পরস্পর প্রচণ্ডরকমের মারামারি শুরু করে। ব্যাপারগুলো যে অত্যন্ত দুঃখের ছিল তা'তে সন্দেহ নেই। শুধু নাগরিকদের এবং সরকারের অপমান-ই এতে ডেকে আনে না, রাজনৈতিক জীবনের ওপরেও তার কালো ছায়া পড়ে।

অতি অল্প সময় অর্থাৎ মাস তিনেকের মধ্যে মন্ত্রী পরিষদ তিন তিনবার বিপদের মুখে পড়ে। কিন্তু নিটি প্রত্যেকবারই ক্ষমতায় ফিরে আসতে সমর্থ হয়। ব্যাপারটা হলো গণতন্ত্রকে সবসময়েই আপস রফা করে চলতে হয়। কখনো আদর্শগত কারণে বা দ্বৈতস্বার্থে অথবা বিরাট কোন ব্যাপারে; অর্থাৎ জাতি তখন দুর্দশাগ্রস্ত হয়ে পড়েছে। এটাকে কিন্তু কোনভাবেই মেনে নেওয়া যায় না। যে জাতি একটা রক্তাক্ত যুদ্ধে জিতেছে, সেই জাতিকে সামাজিক ভাবে নতুন করে তোলার প্রচেষ্টা কারোর মধ্যে নেই। যারজন্য বর্তমান পরিস্থিতির মোকাবিলা না করে বাস্তব দিক থেকেই মুখ ঘুরিয়ে বসেছে সমগ্র জাতি।

ফ্যাসিজিম—সমুদ্র প্রমাণ কাপুরুষতা, পরস্পরের স্বার্থে গোপনে বোঝাপড়া, কুয়াশায় আবছা হয়ে যাওয়া নিকট ভবিষ্যত, পাংশুরঙের আদর্শবাদের মধ্যে যেন মাথা উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা লাইট হাউস বিশেষ। নিজেরাই ওরা এইসব দুর্বলতার জন্য সংঘর্ষে মেতেছে। এই অন্ধ করা সমস্যাগুলো চাপা পড়ে গেছে এই সংঘর্ষের তলায়। বলাবাহুল্য নিটি সরকারের চরম দৃষ্টি ছিল আমার ওপরে। আমাকে লক্ষ্য করে ওর হিংস্র কুকুরগুলোকে যেন শিকল থেকে মুক্ত করে দিয়েছিল। আর অপরদিকে নিটি সরকারের পোষা সাংবাদিকরা তো আমার রাজনৈতিক মতবাদের বিরোধিতা করতে করতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। সোশ্যালিষ্টরা আমার মানসিক এবং দৈহিক শক্তির কাছে পরাজিত হয়ে একদিকে যেমন প্রতিহিংসা নিতে অপরদিকে তেমনি আমাকে সমাজচ্যুত করতে উঠে পড়ে লেগেছিল। অবশ্য এতে সফল না হয়ে নিরাপদ দূরত্বে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গর্জন করতো। তবে ওরা সদা সতর্ক যেমন থাকতো, তেমনি কঠোর বাস্তব থেকেও নিজেদের অনেক দূরে সরিয়ে রাখতো।

মিলানে অনেকদিন থেকেই শয়তান লুম্পেনগুলো সন্ধ্যাবেলায় জঙ্গলের রাজত্ব কায়েম করেছিল। সেইরকম এক সন্ধ্যায় আমি ধীরে ধীরে চুমুক দিয়ে পানীয় পান করতে করতে অপেক্ষা করছিলাম একটা কাফেতে। কাফে অফ পিজা ডেল ডুয়োমা। হঠাৎ দেখি শ'খানেক সোশ্যালিষ্ট লুম্পেন আমাকে ঘিরে ধরে এক নাগাড়ে গালাগাল দিয়ে চলেছে। ওরা আমাকে চিনে ফেলেছে। অনেক দিনের পুষে থাকা রাগের প্রতিহিংসা নেওয়ার জন্য আমাকে সম্ভবত মারধোর করে তার কিছুটা উসুল করার ইচ্ছে। চারদিকে তখন লোকজন জমায়েত হয়ে আমাকে রীতিমতো ভয় দেখাতে সুরু করেছে। এক সময় ব্যাপারটা এমন এক পর্যায়ে গিয়ে দাঁড়ায় যে কাফের মালিক আর ক্যাশিয়ার ভদ্রমহিলা ভয় পেয়ে ত্রস্তহাতে দোকানের সাটার টেনে দেয়। সেই বিশৃঙ্খল দিনগুলোয় যা স্বাভাবিক ছিল, ক্যাশিয়ার মেয়েটিও তাই করে। আমাকে কাফে ছেড়ে বেরিয়ে যেতে বলে কারণ ততোক্ষণে ওদের অস্তিত্বও বিপন্ন হয়ে পড়েছে। আমি মেয়েটিকে দ্বিতীয়বার আর একই কথা বলার সুযোগ দেই না। আর এই ধরনের হিংস্র জনতার মুখোমুখি হ'তে ভয় পাই নি কখনো। যতো বেশি লোক জমবে ততোবেশি নির্ভয় হওয়া উচিত। কারণ সেই জনতার মধ্যে দু'চারজন নিশ্চয়ই থাকবে যাদের মধ্যে সহানুভূতি থাকা অসম্ভব নয়। তবে বলতে পারবো না যে এই কাপুরুষগুলোর মুখোমুখি হ'তে হয়তো বা আমার মধ্যেও ভয়ের একটা আশংকা কাজ করছিল। আমি নেতাদের দিকে তাকিয়ে বলি, —আমার কাছ থেকে তোমরা ঠিক কি চাও? মারতে? তা'হলে শুরু করে দাও। তবে এর ফলাফলটাও চিন্তা করে নিও। যে কোন অপমান এবং ঘুষির বদলে তোমাদের প্রাপ্তিযোগও যে কম হবে না তা'ভালো করে চিন্তা করে নিও।

দলবদ্ধ সেই নেকড়ে গুলোর মুখের ছবি যেন এখনো আমার চোখের সামনে ভাসে। ওরা নিশ্চুপে দাঁড়িয়ে ছিল। হিংস্র দৃষ্টিতে পরস্পরের দিকে তাকাচ্ছিল। সামনের লোকগুলো কিছুটা দূরে সরে যায়। বুঝি ভয় পেয়েছে। আর তা' জমায়েত হওয়া জনতার মধ্যেও ছড়িয়ে পড়ে। বিশেষ করে সেই জনতা যদি কাপুরুষ হয়। যাইহোক লোকগুলো ছত্রভঙ্গ হয়ে আরো দূরে সরে যায়। তারপর নিরাপদ দূরত্ব থেকে শেষে খিস্তি খেউর ছুঁড়ে দেয় আমাকে লক্ষ্য করে।

এই ঘটনাটার উল্লেখ এই জন্য করলাম যে ফ্যাসিস্টদের জীবনে এই ধরনের ঘটনা হামেশাই ঘটে থাকে। কিন্তু স্মরণে রাখা দরকার যে বহু ক্ষেত্রে ব্যাপারটার সূচিমুখ অন্যদিকে ঘোরে। শেষ হয় গিয়ে মারধোর, ছুরি চালনা, গুলি, খুন-জখম, নিষ্ঠুর কার্যকলাপ, অত্যাচার এবং মৃত্যুতে।

এই সময়ে পরস্পর বিরোধিতার একটা সাড়া পড়েছিল সমস্ত ঘটনা প্রবাহের ওপরে। বিজয়ী জেনারেল দিয়াজ এবং নিটির সঙ্গে মতদ্বৈততা ক্রমশ প্রকট হয়ে উঠেছিল। দু'জনে দুই মেরুতে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল।

লন্ডন চুক্তিতে ইতালিকে যে আশ্বাস দেওয়া হয়েছিল তা' ভেঙে পড়ে। আদ্রিয়াতিক সমুদ্র উপকূল বরাবর অনিশ্চয়তার ছায়া ঘেরা ছিল। কূটনীতিকদের মধ্যে অমূলক গুজব ছড়িয়ে পড়েছিল। যেসব যুগোশ্লাভিয়ান আদ্রিয়াতিক সমুদ্রের উপকূলের ধারে কাছে বাস করতো, রোমের সঙ্গে হাত মিলিয়ে তারাও আমাদের জীবনে অশান্তি ডেকে আনে। ছাত্র, অধ্যাপক, শ্রমিক, সাধারণ নাগরিক এবং জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রতিনিধিত্ব করা সবাই

মন্ত্রী আর পেশাদার রাজনৈতিক নেতাদের কাছে হাতজোড় করতে শুরু করে। ইতালির জনজীবনের শ্রেষ্ঠ নাগরিকবৃন্দ ডালমাটিয়ার ব্যাপারে আবেদন নিবেদনও কম জানায় না। ডান মতবাদপন্থী ওরা সবাই ইতালির যুদ্ধে যোগদানের বাৎসরিক উৎসবের দিন পিতৃভূমির নামে শপথ নিয়ে তাদের দেশের প্রতি বিশ্বস্ততা জানায়।

তারপরে রাজধানীতে এমন একটা ঘটনা ঘটে যা এখনো আমাদের স্মৃতিতে জ্বলজ্বল করছে। সাধারণ মানুষের ভেতরেও এই ঘটনার তীব্র প্রতিক্রিয়া হয়েছিল। যারজন্য নতুন এক পুলিসের সৃষ্টি করা হয়। নিটি সরকারের নিরাপত্তার খাতিরে। তাদের বলা হ'তো রয়াল গার্ড। হঠাৎ একদিন প্যারাডের সময় সেই রয়াল গার্ডরা ঝড় তোলে। ওরা এলোপাথারি গুলি ছুঁড়তে সুরু করে। অনেকে সঙ্গে সঙ্গে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। জনা পঞ্চাশেক আহত হয়। ইতালিয়ানদের স্মৃতিতে রোমে এই ধরনের ঘটে যাওয়া অতীতের কোন ঘটনার স্মরণ ছিল না। অন্ততপক্ষে রোমের আকাশের নীচে এইরকম নৃশংস ঘটনা আগে কখনো ঘটে নি। ঘটনাটার পরিসমাপ্তি কিন্তু এখানেই ঘটে না। তখনো ক্রোধের বহিঃপ্রকাশ সম্পূর্ণরূপে ঘটে নি। যেসব ডালমাটিয়ানরা রোমে বসবাস করতো, সবাইকেই গ্রেপ্তার করা হয়। এমন কি মহিলারাও বাদ যায় না। খুব কম লোকই এই ঘটনার প্রতিবাদ করতে সক্ষম হয়। সেই সময় মারধোর করে মাটিতে শুইয়ে দেওয়া আর কর্তৃপক্ষের ওপরে তর্জন গর্জন সহ শাসানি যেন একটা ফ্যাসানে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। পার্লামেন্টে কয়েকজন ডেপুটি, যারমধ্যে ইতালির জাতীয় লেখক লুইগি সিসিলিয়ানি এবং অ্যাজিলবার্তো মারতিয়ারেও ছিল। কিন্তু তাদের উত্থাপিত বিতর্কত কোন প্রশ্নের প্রতিধ্বনি আর কারোর মুখে শোনা যায় না। পোপোলো দ্যা ইতালিয়াতে লেখার মাধ্যমে আমার সমকালীন চিন্তাধারা দূর-দূরান্তে ছড়িয়ে দেই। যে পদ্ধতিতে নিটি সরকার ক্রমাগত মানুষদের অবমাননা করে চলেছে, তার ওপরে ধর্মযাজকদের ঢঙে নিষেধাজ্ঞা ছুঁড়ে দেই। আমার এই গগনভেদী চিৎকার চেঁচামেচির কিছু প্রতিধ্বনি সিনেটে শোনা যায়; এই সেই সিনেট যেখানে সর্বকালেই মহৎ কিছু ব্যক্তি ইতালি জাতির মহত্ত্ব, সম্মান এবং অধিকার বজায় রাখার ব্যাপারে তৎপর ছিল।

একদল সিনেটর যাদের শিরোমণি হিসেবে জেনারেল্ল লিজিমো দিয়াজ নীচের সিনেটে বক্তব্য রেখেছিল ঃ

সিনেট দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছে যে গৌরবময় বিজয় এবং আমাদের লোকেদের উজ্জ্বল প্রতিরোধ করার কৃতিত্বকে সরকারী ভাবে শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে যে ভাবে ধ্বংস করে ক্রমাগত নীচের দিকে টেনে নামানো হচ্ছে, তা'তে লজ্জিত হওয়া ছাড়া উপায় নেই। যৌথ ভাবে পিতৃভূমির যে কোন উন্নতির প্রচেষ্টার মূলেই এটা আঘাত করেছে। যে কারণে শান্ত চিত্তে কোন নির্মাণ কাজও করা যাচ্ছে না। এটা কিন্তু ইতালির সংস্কৃতির বিপরীত। সর্বোপরি ২৪ শে মে যে রাজনৈতিক দেশপ্রেমযুক্ত ঘোষণা করা হয়েছিল, তা' নিদারুণভাবে লঙ্ঘিত হয়েছে। বিশেষ করে রোমের অতিথি ডালমাটিয়ান এবং ফিউমেনদের একতরফা গ্রেপ্তারের পরে। স্বাক্ষরকারীদের মধ্যে দিয়াজ ছাড়াও অন্যান্য নাম ছিল সেনেটার আতিলিও হোসতিস—যিনি বিদ্রোহী অ্যাডমিরাল থিওনের ওপরে ঐতিহাসিক গবেষণা করে বিখ্যাত হয়েছিলেন। তা'ছাড়া স্বাক্ষরকারীদের মধ্যে ইতালির সংস্কৃতি জগতের তাবড় তাবড় অনেক

নক্ষত্র-ই বর্তমান ছিল। সর্বসাকুল্যে স্বাক্ষরকারী ছিল চৌযট্টিজন। যাদের মধ্যে চারজন ছিল সিনেটের ভাইস প্রেসিডেন্ট।

বিশেষ এই প্রস্তাবে কিন্তু আভাস দেওয়া ছিল না। সোজাসুজি ভাষায় ইতালির বংশ পরম্পরা সভ্যতা এবং সংস্কৃতিকে জাগিয়ে তোলার আহ্বান জানানো হয়েছিল এই প্রস্তাবের মাধ্যমে। শৌর্যবীর্য ছাড়াও এই প্রস্তাবে ইতালির যুদ্ধ জয়ের বিরুদ্ধে যে অন্যায় প্রচার চলছিল, তাকে সোচ্চারে ঘৃণাও প্রকাশ করা হয়। অন্যান্য সবার মধ্যে এই প্রচার পর্বের নেতা তথা মধ্যমণি আরমানডো দিয়াজের প্রতি ঘৃণার বৃষ্টি বর্ষণ করা হয়েছিল। ভিত্তোরিও ভেনেটেরের গৌরব তুলে ধরে জেনারেল ইসমোতে ওকে রীতিমতো তুলো ধোনা করে। কারণ জেনারেল চোলের ওপরে এরা দেখেছে কেমন হীনভাবে প্রচারের মাধ্যমে সৈনিকদের আদর্শ, যুদ্ধ করার ক্ষমতাটাই কেড়ে নিয়েছে।

নিটি সরকার দলভাঙা একটা গোষ্ঠীর সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত তুচ্ছ সংসদীয় পদ্ধতির একটা অংশ বিশেষ; জাতির স্বার্থের দিকে না তাকিয়ে ভিক্ষাপাত্র হাতে কিছু রাজনৈতিক নেতার পেছনে ছুটছে, যারা ক্ষমতার গদী ছাড়া আর কিছু বোঝে না। আদর্শ, নীতি সবকিছু ওরা ইতিমধ্যেই বিসর্জন দিয়ে বসেছে। ওদের অধঃপতন প্রথম নয়। তিন তিনবার ঘটেছে এই একই জিনিষ।

যাইহোক জিয়োলিটি আবার তখ্তে ফিরে আসে।

সংসদ এবং রাজনৈতিক পদ্ধতি এতো লাঞ্ছনা গঞ্জনার এবং দোদুল্যতার পর প্রমাণ করে যে দেশের মানুষকে নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছে দেওয়ার ক্ষমতা এই সংসদীয় প্রণালীর নেই। এমন কি কোন্ পথে হাঁটলে সেই লক্ষ্য-পথের দিশা পাওয়া যেতে পারে, সেই রাস্তা বাত্লাতেও অক্ষম এই সংসদীয় প্রণালী। নিটি সরকারের তৃতীয় বারের পতনের পর জিয়োলিটি গদীতে আসীন হয়। জিয়োলিটি সম্পর্কে সম্ভবত এটুকু বলাই যথেষ্ট যে প্রধান মন্ত্রীত্বটাকে জিয়োলিটি পেশা হিসেবেই নিয়েছিল। ওর আবার এই দৃশ্যপটে উপস্থিত হওয়ার ব্যাপারটা আমাদের কাছে ছিল যে নিজ সরকারের দেউলিয়া অবস্থায় পতনের পর জিয়োলিটি রিসিভার হিসেবে সেই গদীতে বসেছে।

জিয়োলিটির ব্যক্তিগত জীবন নিয়েও তদন্তের প্রয়োজন ছিল যে ওর সেই জীবনে কতোটা সাধুতা সে বজায় রেখেছিল। কারণ তার রাজনৈতিক জীবনে ন্যায়পরায়ণতা বলে যে কিছু ছিল না তা'তে সন্দেহ নেই। সোজাসুজি বলতে গেলে জিয়োলিটির দক্ষতা ছিল ভাঙায়, গড়ায় নয়। ইতালির আদর্শ বহমান জীবন-প্রবাহে ওর বিশ্বাস ছিল বলে মনে হয় না। আমলাতন্ত্রের তৈরি এই মানুষটা ইতালির জীবনের সব সমস্যাগুলোকেই গণতান্ত্রিক পদ্ধতি এবং সংসদীয় প্রণালীর ছাঁচে কৃত্তিম উপায়ে ঢেলে সেইসব সমস্যার সমাধানের চেষ্টা করতো। যারজন্য ওর চরিত্রের সঙ্গে খাপ খাইয়ে যুদ্ধের সময় নিজেকে দৃশ্যপট থেকে সরিয়ে রেখেছিল। যুদ্ধ শেষ হ'তেই ব্যবসা লাটে তুলে দিয়েছিল—সেটা কিন্তু রক্তাক্ত পথে দেশকে টেনে নিয়ে গিয়েছিল। ইতালির জনসাধারণের যৌথ উদ্যোগে সেটা যেভাবে রক্ষা পেয়েছে নেহাৎ আদর্শের জোরে তা' আমাদের ইতিহাসের এক গৌরবময় অধ্যায়।

জিয়োলিটি মন্ত্রীসভার অভ্যন্তরীণ নীতি গুলোর সোচ্চারে ঘোষণার ব্যাপারটা ইতালির লোকজন ভালো মনেই গ্রহণ করে। আসলে নিটি সরকারের ডামাডোলের পরে ইতালির জনসাধারণ নতুন বৈমানিকের পথ নির্দেশের ব্যাপারটা বিনা প্রশ্নে মেনে নিতে রাজী ছিল

না। বরং বিরোধীতা করার ব্যাপারে যথেষ্ট তৎপর হয়ে উঠেছিল। ওদিকে আলবানিয়ান অধিবাসীদের আমাদের বিরুদ্ধে তেতে ওঠার জন্য বিদেশী দালাল এবং দেশের ভেতরের কিছু রাজনৈতিক নেতা ক্রমাগত উস্‌কানি দিতে থাকে। বারী থেকে মাত্র বারো ঘন্টা দূরত্বের এই চমৎকার দেশটা সব সময়েই আমাদের সভ্যতার অন্তঃপ্রবাহকে ধরে রেখেছে। ইতালির দৌলতেই আলবানিয়া সব না হলেও কিছুটা সভ্যতার চমক দেখেছে; তারাই আমাদের সৈন্যদের বিরোধীতা শুরু করেছে। ১৯০৮ সাল থেকে ভালোনাতে পয়ঃপ্রণালী এবং নাগরিকদের স্বাস্থ্য ও স্বাচ্ছন্দ দেখার জন্য আমাদের মিশন কাজ করেছে। ১৯১৪ সাল থেকে ইতালির সৈনিকরাও রয়েছে সেখানে। আমরা ওদের শহর, হাসপাতাল এবং চমৎকার রাস্তাঘাট নির্মাণ করে দিয়েছি। ওদের সুস্থ নাগরিক পরিবেশ দেবার জন্য কিন্তু ১৯১৬ সাল থেকে মাটিয়ান সৈন্যদল সেখানে গিয়ে ঘাঁটি গেড়েছে। আলবানিয়াতে আমাদের লক্ষ লক্ষ ইতালির মুদ্রা লিরে ব্যয় করেছি; হাজার হাজার সৈন্য সেই দেশটাকে তিলে তিলে গড়তে নিজেদের শক্তি নিঃশেষিত করে দিয়েছে। শুধু ছোট্ট সেই দেশটাকে একটা সুন্দর ভবিষ্যত এবং সুদৃঢ় ভিত্তির ওপরে স্থাপন করার জন্য।

আমি জানতাম এবং কতোবার বলেছি যে জিয়োলিটির কাছ থেকে আলবেনিয়ান সম্পর্কে কোন নির্দিষ্ট নীতি আশা করাটাই অন্যায়।

আভ্যন্তরিক অস্থিরতাই তাকে বিদেশ নীতি স্থির করার মানসিক শক্তি বা অবকাশ রাখে নি। সেই সময় বিদেশ মন্ত্রী ছিল স্কোরজা। সুতরাং আড্রিয়াটিক দেশগুলোর বিদেশ নীতির ব্যাপারে যে ডামাডোল অবস্থা হবে তা'তে আশ্চর্যের কি আছে। ইতিমধ্যে আমাদের সরকারের বুদ্ধিহীনতা এবং অযোগ্যতার দরুণ সেনাবাহিনীকে ভালোনা ছেড়ে আসতে হয়েছে।

পরাজয়ের আর এক পর্বে আমাদের প্রবেশ ঘটে। ১৯২০ সালে রেলের কর্মচারীরা ধীরে চলো নীতি গ্রহণ করে। যারজন্য ট্রেনে সৈন্যবাহিনী, ইতালির গুপ্ত রাজনৈতিক সভার সদস্য অথবা পুলিশের চলাচল যথেষ্ট পরিমাণে ব্যাহত হয়। অনেক সময় এই ধীরে চলার নীতি ধর্মযাজকদের ক্ষেত্রেও অনুসৃত হয়। এই নোংরা ক্ষমতার অপব্যবহারের বিরুদ্ধে আমি একলাই প্রতিবাদ জানাই। ইতালির জনগণ নিজেদের নির্বুদ্ধিতা এবং ক্ষমতা আর শৌর্য সম্পর্কে অজ্ঞ থাকার ফলে নিজেরাই তার ফল ভোগ করছিল। যারা এই আমলাতান্ত্রিক ব্যবস্থা এবং সরকারের নীতির বিরুদ্ধে সাহস করে রুখে দাঁড়িয়েছিল, তাদের অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়েছে।

ইতিমধ্যে ক্রিমোনার ষ্টেশন মাষ্টারকে ঘিরে একটা ঘটনা ঘটে। সিনিয়োর বারগনজোনী পিয়োসেনজা যাওয়ার পথে আটকে পড়া ট্রেনভর্তি সৈনিকদের ট্রেনটাকে ষ্টেশনে টেনে আনতে কর্মরত রেলওয়ে কর্মচারীদের আদেশ দেয়। পুরো ব্যাপারটাই আমার চোখের ওপরে ঘটে। বলাবাহুল্য এই আদেশ দেওয়ার ক্ষমতা ষ্টেশন মাষ্টারের ছিল। ঘটনাটা কিন্তু নিয়মমাফিক ব্যাপার। কিন্তু রেলওয়ে সিণ্ডিকেটে তখন সোশ্যালিষ্ট সদস্যদেরই দলভারী। তারা রেলওয়ে মন্ত্রকে গিয়ে দাবী জানাতে থাকে যে এই ঘটনার জন্য সেই ষ্টেশন মাষ্টার বারগণজোনীকে চাকরী থেকে বরখাস্ত করা হোক। কিন্তু মিলানের রেলওয়ে সিণ্ডিকেট ইউনিয়ানের এই প্রস্তাব নাকচ করে দিলে তেরো দিন লাগাতার ধর্মঘট ডাকা হয়। দু'লক্ষ অধিবাসীর শহর মিলানের তখন দমবন্ধ অবস্থা। যানজট, শহরতলী থেকে শহরের মধ্যে

আসা যাওয়ার পথ প্রায় বন্ধ এবং পৃথিবীর সঙ্গে সংযোগ বিচ্ছিন্ন। ছ্যাকড়া গাড়ি, মোটর ইত্যাদি ছাড়াও নেভিগলিও নদীতে ছোট ছোট নৌকো করে কোনরকমে যাতায়াত করে মিলান শহরের লোকজন।

মিলান অত্যাধুনিক শহর হলেও রাজনৈতিক সন্ত্রাসবাদের মূল কেন্দ্র ছিল। যে সৈনিক এই অব্যবস্থার গোড়া উৎপাটন করে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে পারতো, তাদের স্থানীয় প্রশাসনের অধীনে রাখা হয়। এমন কি সৈন্যদলের রুটি তৈরির প্রয়োজনীয় আটা-ময়দাটুকুর জন্যও স্থানীয় প্রশাসনের কাছেই তাদের হাত পাততে হ'তো। শহর মিলান সীমান্তের চারপাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা ষ্টেশনগুলোতে তখন মালের পাহাড় জমে গেছে। গুদাম মালিক এবং নিশিকুটুম্বদের দয়ায় পড়ে থেকে থেকে মালগুলোর অবস্থাও শোচনীয়। অধিকাংশ পচে গিয়ে খাদ্যের অযোগ্য হয়ে পড়েছে। ২৪ শে জুন সকালবেলায় ধর্মঘট শুরু হওয়ার তেরো দিন পরে রেলওয়ে ধর্মঘটী কর্মচারীদের ওপরে সশস্ত্র বাহিনী গুলি ছোঁড়ে। ওরা তখন বুঝতে পেরেছে যে মিলান শহরের বাসিন্দারা সহ্যের সীমা অতিক্রম করে গেছে। বেশ কিছু কর্মচারী নিহত হয়। তার চেয়েও অনেক বেশি লোক মারাত্মক ভাবে আহত হয়ে হাসপাতালে যায়। পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে ওরা কাজে ফেরাটাই বুদ্ধিমানের মতো কাজ হবে বলে স্থির করে, কিন্তু স্থানীয় প্রশাসন তখন মৃত। কবরে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে।

জিয়োলিটি মন্ত্রীসভা তখন অর্থনৈতিক টানা পোড়ানির মধ্যে হাবুডুবু খাচ্ছে। জিয়োলিটির ধারণা ছিল যুদ্ধের লাভ আর উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত সম্পদের ওপরে উঁচু হারে রাজস্ব চাপিয়ে দিয়ে অর্থনৈতিক ডামাডোলে বিপর্যস্ত ক্রুদ্ধ সোশ্যালিষ্টদের শান্ত করতে পারবে। এটা কিন্তু সম্পূর্ণ সোশ্যালিজিমের প্রভাব সম্পন্ন চিন্তাধারা। তবে এই ব্যবস্থায় উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত সম্পদের মালিকদের তাদের ন্যায্য পাওনা থেকেই বঞ্চিত করা হবে। এই প্রচেষ্টার কালো ছায়া শুধু অর্থনীতির ওপরেই নয়, আদর্শ এবং সমাজের ওপরেও পড়তে বাধ্য। ধনতন্ত্র একক ভাবে কিন্তু শিশু স্তরেই রয়ে গেছে। তবে ধনের সদ্ ব্যবহার কিন্তু সমাজের আশা শুধু পূরণ করে না, সেই সমাজকে সামাজিক ভাবে উন্নতি এবং সভ্যতার দিকেও দ্রুত এগিয়ে নিয়ে যায়।

আন্তর্জাতিক বৈদেশিক নীতিতে বিদেশ মন্ত্রী কাউন্ট স্ফোরজা শুধু স্পা'র চুক্তিপত্র নয়, ভোলোনা এবং আলবানিয়ার সংযুক্তি যা প্রটোকল অফ তিরানা নামে খ্যাত এবং সার্বিয়ানদের সঙ্গে তুর্কীদের সম্পাদিত দুর্বল চুক্তিতেও স্বাক্ষর করে। ফিউমের টানাপোড়ানির ব্যাপারটার ফয়সালার ব্যাপারে আগ্রহী হয়ে ওঠে। আর সবশেষে সম্পাদন করে রাপালের চুক্তিপত্র।

লন্ডন চুক্তির দৌলতে ডালমাটিয়াকে ইতালির হাতে প্রত্যার্পণ করা হয়েছিল। মনে হয় পুরো ব্যাপারটাতেই কোথাও কোন একটা গোপন মোচড় ছিল, কিন্তু তার যৌক্তিকতা ছিল না। যার জন্য কোনরকম তর্ক-বিতর্কও চুক্তিপত্রটাকে ঘিরে করা যায় নি। পুরনো দিনের ভদ্রলোক সিনেটার সিয়ালইয়া গভীর আক্ষেপে তাই বলেছিল যে লন্ডন চুক্তি কখনোই কার্যকরী করা যায় নি। আর যাদের জন্য করা সম্ভব হয় নি, তারা কিন্তু ইতালিয়ান।

আমি তখন বিশ্বাস করতে শুরু করেছি যে ভাবেই হোক বৈদেশিক নীতির এই অবক্ষয় বন্ধ করতে হবে। যারজন্য শুধু আমাদের ফ্যাসিষ্ট প্রতিষ্ঠানকেই কাজে লাগাই না, পোপোলো দ্য ইতালিয়ানকেও জোর কদমে ব্যবহার করতে শুরু করি। কয়েকটা বাঁধকে উঁচু

করতে চেষ্টা করলেও ময়লা জলের স্রোত-প্রবাহ ধরে রাখা অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। জনসাধারণ বেশ ভালোরকম কম্যুনিজিমের দিকে ঝুঁকেছিল। ভাগ্যে যা-ই থাকুক না কেন। এ কথা অস্বীকার করে লাভ নেই যে লেনিনের ক্ষমতা পৌরাণিক যুগের নায়কদের থেকে কম ছিল না। রাশিয়ার একনায়কতন্ত্রীরা জনসাধারণের ওপর রীতিমতো কর্তৃত্ব করতো। লেনিন জনসাধারণকে মোহবিষ্ট করে রেখেছিল। যেন সম্মোহিত হওয়া একদল পাখির ছানা। এর কিছু দিন পরেই রাশিয়াতে মন্বন্তরের কালো ছায়া নেমে আসে। আমাদের যে মিশন রাশিয়াতে বলশেভিজিমের ফলাফল প্রত্যক্ষ করতে গিয়েছিল, তারা ফিরে এসে স্বচক্ষে দেখা রাশিয়ার দুরবস্থার কথা জানালে ইতালির জনসাধারণের মোহভঙ্গ ঘটে। বুঝতে পারে যে রাশিয়া সর্বসুখের নন্দন কানন নয়। মরীচিকা মাত্র। শেষ পর্যন্ত লেনিন একটা প্রচার-প্রতীক আর রাজনৈতিক ভাসা ভাসা নেতা হিসেবে জনসাধারণের মনে স্থান পায়।

ইতালির বিমানক্ষেত্র বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। এয়ারোপ্লেনগুলো পাটে পাটে খুলে ফেলেছিল। তবে ব্যক্তিগত বিমান চালনার ব্যাপারে অবশ্য চেষ্টা চরিত্র করা হচ্ছিলো। তখনকার সবচেয়ে বড় দুভার্গ্যজনক দুর্ঘটনাও ঘটেছিল এই সময়। ভেরোনা শহরের আকাশে। ভিয়েনা ফেরত উড়ানের সময় বিরাট বড় একটা এয়ারোপ্লেন শহরের ওপরে ভেঙে পড়ে। এই দুর্ঘটনায় ষোল জন মারা যায়, পাইলটসহ। মৃতদের মধ্যে মিলানের কয়েকজন সাংবাদিকও ছিল। এই দুঃখজনক ঘটনা সমস্ত ইতালির ওপরেই বিষাদের একটা দীর্ঘ কালো ছায়া টেনে দেয়। কিন্তু অবাক বিস্ময়ে দেখি কর্তৃপক্ষ এই দুর্ঘটনার পরেও বিমান চালনার ব্যাপারে যেমন বিলম্বিত আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছে, তেমনি বাকী কয়েকটা এয়ারোপ্লেনের মোটর, পাখা ইত্যাদি খুলতে দিচ্ছে।

ঠিক এই সময় পাইলট হওয়ার জন্য এয়ারোপ্লেন চালানো শিখতে আমার ইচ্ছে যায়। ভিয়েনা ফেরত যে প্লেনটা দুর্ঘটনায় পড়ে ধ্বংস হয়—সেই প্লেনটা চালাচ্ছিলো আমার জন্মস্থানের প্রতিবেশী লেফ্‌টটেনান্ট রিডল্‌ফি। ফোর্লির গীর্জা প্রাঙ্গণে রিডল্‌ফির মৃতদেহ বয়ে এনে কবর দেওয়া হয়। আমি তখন কয়েকজন রাজনৈতিক বন্ধুর সঙ্গে বিশ্রামের জন্য ফোর্লিতে ছিলাম। নিজের জেলাতে কিন্তু আমাকে সাদরে অভ্যর্থনা জানানো হয় নি। বরং নিরুত্তাপ এবং বিরোধিতাই করা হয়েছে। কিছুটা আক্রমণাত্মক ও বটে। রিডল্‌ফির মৃত্যুর ঠিক পরে বিমান চালনা শেখার প্রচেষ্টাটা মনে হয় মাঠেই মারা যায়। সেই দিনগুলোতে বস্তুতান্ত্রিক মূল্য না থাকলেই যে কোন কর্ম বা প্রচেষ্টাকে মূল্যহীন বলে ধরা হ'তো। মানুষের হৃদয়ও তখন ধূসর ছিল। যারজন্য গাব্রিয়োল ডি আনুনজিয়োর ফিউমের স্থায়িত্বের প্রস্তুতি মানুষের মনে কোন দাগ কাটতে পারে নি।

কিন্তু বলাবাহুল্য আমি আমার প্রচেষ্টা থেকে দূরে সরে আসি নি। ক্রমাগত বিমান চালনা শেখার প্রচেষ্টাটা চালিয়ে গেছি। পোপোলো দ্য ইতালিয়ার কর্মচারীদের নিয়ে মান্তুয়ার আকাশে বেশ কিছুক্ষণ বিমান উড়িয়েছি। আসলে আমার পেছনে একটা ইচ্ছাশক্তি-ই কাজ করেছে যে ইতালির আকাশ থেকে বিমান ওড়ার সম্ভাবনা যাতে মুছে না যায়। বরং যে কোন মূল্যে ব্যাপারটার আরো উন্নতি ঘটানোর প্রয়োজন। প্রত্যেকবারে আমি ব্যক্তিগতভাবে সবার সামনে একটা উদাহরণ তুলে ধরি এবং বলাবাহুল্য বন্ধু-বান্ধবরা শুধু তা' পছন্দ-ই করে না, প্রশংসাও করে।

মোহিত হওয়া লোকগুলোর উল্লাস আর সরকারের দুর্বলতা দু'য়ে মিলে সেপ্টেম্বরের প্রথমদিকে ধাতুর কাজ হওয়া বিভিন্ন কারখানায় উশৃঙ্খলা বাড়তে শুরু করে। তা'তেই বোঝা যায় যে বলশেভিজিয়ামরা ইতিমধ্যে সক্রিয় হয়ে উঠেছে। কারখানার উৎপাদনের ওপরে এই মতবাদ যথেষ্ট পরিমাণে ছায়া ফেলে। শ্রমিকরা তাদের ছেলেমানুষী চিন্তাধারায় ধরে নেয় উচ্চপদস্ত কর্মচারীরা তাদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করছে; ওরা ধরে নেয় যে কারখানার পরিচালন ব্যবস্থা ওদের হাতে তুলে দিলে ওরা তা'সুচারুরূপে করতে পারবে। ওরা নিজেরাই যেমন উৎপাদন করতে সক্ষম, তেমনি প্রসেস আর উৎপাদিত সামগ্রী বিক্রী করতেও পারদর্শী। সত্যি বলতে সবার মধ্যে এই চিন্তাধারা কাজ না করলেও বেশির ভাগ শ্রমিক ক'টা ছোরা ছুরি ছাড়া আর কিছুই উৎপাদন করতে পারে নি। প্রায় একুশ দিন এইভাবে নিস্ফলা কাটে। কারখানাগুলোর চাকাও ঘোরে না।

ব্যাপারটা ঘটতে থাকলে কারখানার ম্যানেজার, মালিক এবং অন্যান্য কর্মচারীরাও দৃশ্যপট থেকে সরে দাঁড়ায়, উৎপাদিত সামগ্রির ওপরে দেওয়া ট্রেডমার্ক ইত্যাদি সরিয়ে ফেলা হয়। শুধু ছাদের ওপরে আর কারখানার দরজায় লাল কাপড়ের ওপরে শেক্‌ল আর হাতুড়ী আঁকা পতাকা ওড়ে। বলাবাহুল্য এটা সোভিয়েট রাশিয়ার প্রতীক। কী ভীষণ উল্লাসে শ্রমিক দলের তখন ফেটে পড়ার অবস্থা। প্রতিটি প্রতিষ্ঠানে সোশ্যালিষ্ট—কম্যুনিষ্টরা একটা করে কমিটি গড়ে। সরকারী আইন অনুযায়ী। যারা এই আন্দোলনের বাইরে থাকে, টেলিফোনের সাহায্যে তাদের রীতিমতো ভীতি প্রদর্শন করে চলে। আমরা অর্থাৎ পোপোলো দ্য ইতালিয়া এই নোংরা সোভিয়েত তামাসার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করি।

কারখানাগুলো দখলের সঙ্গে সঙ্গে অত্যন্ত হিংস্র কার্যকলাপও শুরু করে। পিত্‌মন্টের পুরনো রাজধানী তুরিণ, যা দীর্ঘদিন গৌরবোজ্জ্বল রাজপরিবার এবং মিলিটারী ট্রাডিসানের জন্য বংশ পরম্পরায় দীর্ঘদিনের ঐতিহ্যবাহী; লাল পতাকাবাহীর দল সেখানেও সমস্ত শক্তি নিয়ে যথাসময়ে খুঁটি গেড়ে বসে। একজন জাতীয়বাদী দেশপ্রেমিক মারিও সোনজিনি যে প্রথম ফ্যাসিজিমে দীক্ষিত হয়েছিল—তাকে শ্রমিকরা গ্রেপ্তার করে। অদ্ভূত বিপ্লবের নামে তার ওপরে অকথ্য অত্যাচার চালায়। নির্যাতিত মুমূর্যু অবস্থায় গুলিতে ঝাঁঝরা করে ওর মৃতদেহ একটা নালায় ছুঁড়ে ফেলে দেয়। সেই শ্রমিকদের মধ্যে দয়ালু একজন খৃষ্টান মৃতদেহটাকে তুলে এনে ধাতু গলানোর ফার্নেসে ঢুকিয়ে দেয়। ব্যাপারটা কিছুটা থিতিয়ে আসে কারণ কারখানাগুলোও ততোদিনে ধুঁকতে শুরু করেছে, তখন কিছু লোক ভাবে মেরে পিটে শহীদদের শেষ করে দেওয়াটাই সঙ্গত। জীবনের বাকী দিনগুলো আর ওদের বাঁচিয়ে রেখে লাভ কি। সোনজিনির একমাত্র অপরাধ ছিল যে ও ফ্যাসিষ্ট। অন্যান্য অনেক ফ্যাসিষ্টের কপালেও একই দশা ঘটে। এই অমানুষিক নিষ্ঠুর কাজ পুরুষ এবং মহিলা উভয়ের তরফ থেকে করা হ'তো। যেন পুরুষ এবং মহিলা উভয়কেই এই বিষয়ে খোলা লাইসেন্স দিয়ে দেওয়া হয়েছে। চরম নিষ্ঠুর এই ঘটনাটার সম্পর্কে লা আবন্তি লেখে ঃ একজন জাতীয়তাবাদী ফ্যাসিষ্ট হলে এমন দু'একটা ঘটনা জীবনে ঘটতেই পারে। ঘটনা প্রবাহের সূচিমুখ গ্রেপ্তার হলে পরে গুলি করে হত্যাতেই গিয়ে শেষ হবে। এটাই হলো গড়পড়তা ওদের জীবনের নিয়তি।

ইতালির বিভিন্ন শহরের কারখানাগুলো দখলের অর্থই হলো দাঙ্গাহাঙ্গামা আর বিক্ষোভ প্রদর্শন। মনফালকোন, মিলান এবং অন্যান্য শহরে এই দাঙ্গার কারণে অনেকে মারা যায়।

বিদেশের কাছে আমাদের কৃতিত্বের মোমবাতিটাকে যেন এক ফুঁয়ে নিভিয়ে দেওয়া হয়। এমন কি শান্তি স্থাপনের পর জাতির পুনর্বাসনের জন্য যদি এতোটুকু চিন্তাও কেউ করতো। যে কেউ এক নজরে বুঝতে পারতো যে সমগ্র জাতির হৃদপিণ্ড প্রায় বন্ধ হয়ে গিয়ে ধ্বংসের খাদের ঠিক সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। ছাপাখানাগুলো থেকে বন্যার মতো লিরে ছাপা হয়ে বেরুতে থাকে। ভয়াবহ মুদ্রাস্ফীতির হাত থেকে বাঁচার তাগিদে লিরের ব্যাপক ব্যবহার এবং প্রচার তখন নিতান্তই প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। যাতে জাতির অর্থনৈতিক বুনিয়াদ পুরোপুরি ধ্বংস হ'তে না পারে। সেই অশুভ দিনগুলোর ফলাফল হিসেবে দীর্ঘ দশ বছর পরেও তার বোঝা আমাদের বয়ে বেড়াতে হচ্ছে।

এই কৃত্রিম উপায়ে অর্থনৈতিক চাহিদা পূরণের চেষ্টা ধ্বংসকেই আরো তাড়াতাড়ি ডেকে নিয়ে আসে। মেডার নামক চেম্বারের একজন সদস্যর সঙ্গে আলোচনার সময় আমি আমার পত্রিকায় এই সম্পর্কে প্রকাশিত অনেকগুলো প্রবন্ধের কথা উল্লেখ করি। আমি জোর দিয়েই বলতে পারি যে সেই অন্ধকারাচ্ছন্ন দিনগুলোতে কেউ ইতালির জনসাধারণকে পরিষ্কার কোন পথ দেখাতে পারে নি। অর্থনীতির পথটা তখন ধ্বংসের দিকে দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে। বৈদেশিক নীতির মতোই একই সুতোয় ঝুলছে। স্বোরজা এখন আগের মতো একের পর এক আত্মত্যাগ করে চলেছে। রাপেলোতে ওর পদার্পণের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ফিউমে আলাদা হয়ে একটা পরিত্যক্ত শ্মশান—শহরে পর্যবসিত হয়। যেন পুরো শহরটাই কাঁটার শয্যায় শুয়ে রয়েছে।

৪ঠা নভেম্বর, ইতালির যুদ্ধ বিজয়ের বাৎসরিক উৎসবের সময় মনে হয় যেন ইতালির জনসাধারণ জাগতে শুরু করেছে। রোম আর মিলান শহরে জাতীয়তাবাদী দেশপ্রেমিকের দল রীতিমতো বিক্ষোভ সমাবেশ করে। সমগ্র ইতালি-ই এই বিজয় উৎসবে যোগ দেয়। আমিও ওদের সঙ্গে এই উৎসব পালন করতে মিশে যাই।

কিন্তু ব্যাপারটা ছিল সাময়িক, ক্ষণস্থায়ী। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে কয়েকটা দুঃখজনক ঘটনা ঘটে। বোলোনিয়াতে প্যালেস ডি আক্যুরসিও, ফেরারেতে প্যালেস এসষ্টানজে আর ফিউমের রক্তাক্ত খৃষ্টমাস স্মরণ করিয়ে দেয় যে আমাদের দুঃখের দিনের শেষ হয় নি।

বোলোনিয়াতে মুষ্টিমেয় ক'জন ফ্যাসিষ্ট ছিল। যাদের নেতৃত্ব দিয়েছিল আরপিনেট্। আমরা খবর পেয়েছিলাম যে সোশ্যালিষ্টরা সেই লাল শহরে নিজেদের তৈরি করার ব্যাপারে তখন ব্যস্ত। শুধু শহরে কেন, সারা উপত্যকা জুড়েই ওরা তখন শহর বোলোনিয়াতে ওদের নিজেদের সরকার প্রতিষ্ঠার জন্য জাঁকজমক ব্যবস্থাদি করতে তৎপর। উপত্যকার পুরোটা না হলেও অধিকাংশ জায়গায় তখন লাল পতাকা উড়ছে। ২১শে নভেম্বর শুধু সিটি হল প্যালেসের মাথায় নয়, উঁচু উঁচু বাড়ির মাথাতেও লাল পতাকা উড়নোর ব্যবস্থাও করে বোলোনিয়ার সোশ্যালিষ্টরা। উপত্যকার বসবাসকারী অন্যান্য সোশ্যালিষ্টদের শুভেচ্ছা আর অভিনন্দন জানানোর জন্য, শহরটা তখন সোশ্যালিষ্টদের হাতে চলে গেছে। ওরা সোভিয়েত দেশের সংবিধান এখানেও চালু করার জন্য উঠে পড়ে লেগেছে। সেই শহরের সরকারের বিরুদ্ধে তখন মাত্র কয়েকজন যুদ্ধ ফেরত সৈনিক আর ফ্যাসিষ্ট সেই জমায়েতে উপস্থিত ছিল। ওদের উপস্থিতি কম্যুনিষ্টরা ব্যাপারটাকে ভালো চোখে দেখে না। চ্যালেঞ্জ হিসেবে নেয়।

মার্শালা রাস্তার ওপরে বোলোনিয়া ফ্যাসিষ্ট দলের অফিস থেকে বেশ কয়েকটা দল যে

কোন মূল্যে জনসাধারণের প্রতি এই আদেশ ঠেকানোর কাজে নেমে পড়ে। দুপুরের পরেই ফ্যাসিষ্টদের ওপর অপমান আর প্রতিহিংসা ছড়াতে থাকে। ফ্যাসিষ্ট প্রতিষ্ঠান ফ্যাসিও প্ল্যাকার্ড সেঁটে দেয় সারা শহরে যে অপমান বা প্রতিহিংসার বুলডেজার চালিয়ে ওদের রোখা যাবে না। সঙ্গে সঙ্গে মহিলা এবং ছোটদের ঘরের দরজা বন্ধ করে ভেতরেই থাকতে বলে। কারণ বোলোনিয়ার রাস্তা হয়তো বা আর এক নিদারুণ ঘটনার সাক্ষী হ'তে পারে। আরাপিনাটির নেতৃত্বে ফ্যাসিষ্টদের এই দৃঢ় প্রতিজ্ঞা এবং একরোখা মনোভাব সোশ্যালিষ্টদের দমিয়ে দেয়। ওরা বুঝতে পারে যা ইচ্ছে তা' আর করা যাবে না; ছোট বড় সব নেতাদের প্রাণে ভয় ধরে যায় যে আরো এগোলে পৈতৃক প্রাণটাই না শেষপর্যন্ত হারাতে হয়। এখানে বলতে আপত্তি নেই যে কাপুরুষতা আর ভয় সব সময়ই ইতালির সোশ্যালিষ্টদের পায়ে পায়ে জড়িয়ে ধরেছে।

যখন প্রায় তিরিশজন ফ্যাসিষ্টের ছোট্ট একটা দল ইনডিপেনডেনজা ষ্ট্রীট দিয়ে যেতে চেষ্টা করে, খোলা জায়গায় জড়ো হওয়া সোশ্যালিষ্টদের মধ্যে হুড়োহুড়ি পড়ে যায়। জমায়েত হওয়া চরম বিশৃঙ্খল এই সোশালিষ্ট জনতা এলোমেলো শ্লোগান দিতে দিতে সেই খোলা জায়গা ছেড়ে পালাতে শুরু করে। সেই ভীত জনতার একাংশ সিটি হলের ভেতরে ঢুকে প্রাঙ্গণে জড়ো হয়। ওরা নিজেদের এমনভাবে ঘিরে রাখে যেন সিটি হলের উঠোনটা মুহূর্তে একটা দুর্গ হয়ে ওঠে। নিজেদের ছায়াকেই ওরা ভয় পেতে শুরু করে। পলায়ণ উন্মুখ সবাইকে ওরা ফ্যাসিষ্ট বলে মনে করে। ওদের দৃঢ় ধারণা ছিল যে ফ্যাসিষ্টরা সিটি হল আক্রমণ করবে; তাই সিটি হলের ওপরে উঠে হাতের বোমা নীচে জড়ো হওয়া ভীত সন্ত্রস্ত সোশ্যালিষ্টদের ওপরেই নিক্ষেপ করে। এই হাত বোমাগুলো ওরা সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিল ফ্যাসিষ্টদের আক্রমণ করার জন্য।

ব্যাপারটা নীচের জনতার মধ্যে আরো বেশি করে আতঙ্ক ছড়ায়। অনেকেই জমায়েত টমায়েত ছেড়ে দৌড়তে শুরু করে। সোশ্যালিষ্ট প্রতিষ্ঠানের হাতে ধরা টিকিট ছিঁড়তে ছিঁড়তে।

প্যালেস এবং প্যালেসের উঠোনে যখন এইসব ধুন্ধুমার কাণ্ডকারখানা ঘটে চলেছে, তখন সিটি হলের মধ্যে সংঘটিত হচ্ছে এক করুণ নাটক। কাউনসিলের লাল সদস্যরা ফ্যাসিষ্টদল সিটি হল আক্রমণ করেছে ভেবে হুড়মুড় করে বহির্গমনের দরজার দিকে একযোগে দৌড়োয়। কিছু সদস্য ভাবে কম্যুনিষ্ট জনতার মধ্যে গিয়ে আত্মগোপন করাটাই সম্ভবত অধিক নিরাপদ। আর বাকীরা ছোটে রক্ষণশীল সদস্যদের ছোট্ট দলের দিকে। এইবারে কিন্তু হলের ভেতরে প্রথম গুলির শব্দ শোনা যায়। হলের গার্ডরা ধরা পড়ার ভয়ে মেজেতে শুয়ে পড়ে। মুষ্টিমেয় কয়েকজন কাউনসিলার যাদের মধ্যে ছিল অ্যাডভোকেট জিওদানী আর অ্যাডভোকেট ওভিগলিও, বিয়াগি, কলিভা, ম্যানারসি—যারা ভয়তাড়িত না হয়ে নিজেদের জায়গায় অটুট হয়ে বসেছিল। হঠাৎ কেউ একজন গুলি ছোঁড়ে। ওভিগলিও সেই ছোঁড়া গুলির হাত থেকে অলৌকিক ভাবে রক্ষা পায়। কিন্তু দ্বিতীয় বারের ছোঁড়া গুলিতে লেফ্‌টানেন্ট জিওদানী নিহত হয়। যুদ্ধের এই বীরকে কিন্তু কম্যুনিষ্ট লালের· দল রীতিমতো ঘৃণা করতো। ইতিমধ্যে এই দাঙ্গা-হাঙ্গামা বাধানোর পেছনের নায়করা এক নাগাড়ে বোমা ছুঁড়ে চলেছে। দেখে শুনে মনে হয় লোকগুলো পাগল হয়ে গেছে। বোমাগুলো ছুঁড়ছে কিন্তু জমায়েত সোশ্যালিষ্টদের ওপরে। কিন্তু তাদের ধারণা যে জমায়েত হওয়া লোকগুলো ফ্যাসিষ্ট। বীভৎস এই হত্যাকাণ্ড, নারকীয়ও বটে।

এই ঘটনার অল্প কিছুদিন পরেই ফেরারেতে ঠিক একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হয়। ঐতিহাসিক এসটেনসী দুর্গে সোশ্যালিস্টরা নিজেদের দলের শক্তি প্রদর্শনের জন্য জমায়েত হয়েছিল। একদল ফ্যাসিস্ত যখন সেই জমায়েতের দিকে এগোচ্ছিল, হঠাৎ সামনে থেকে গুলি বর্ষণ শুরু হয়। ফ্যাসিস্টদের মধ্যে তিনজন মারা যায়; অনেকে আহত হয়। ফেরারে তখন লাল। শুধু ফেরারে শহর নয়, প্রদেশের সমস্ত মিউনিসিপ্যাল-ই তখন সোশ্যালিস্টদের হাতে। ফেরারে তখন অতীব সংকটের মধ্যে দিন গুজরান করছে। বোলোনিয়া চমৎকার প্রদেশ এসটেনসি'র শহর হলেও অবস্থা একই রকমের। অনেকেই তখন ভেবেছে এইসব করুণ ঘটনাগুলো হলো বিপ্লবের প্রস্তাবনা। কিন্তু কি সেই বিপ্লব?

আপার ইতালির পো উপত্যকার ফ্যাসিস্ট নেতাদের আমি শহর মিলানে ডেকে পাঠাই। সংখ্যায় যদিও তারা খুব বেশি নয়, তবে বুঝতে অসুবিধা হয় না যে ওরা যে কোনরকম বিপদ বা ঝুঁকির মুখোমুখি হ'তে প্রস্তুত। হঠাৎ যেমন আমি বুঝতে পারি, ওদেরও তেমন বোঝাই যে খবরের কাগজের প্রপাগাণ্ডা অথবা উদাহরণ দিয়ে আমরা বৃহত্তর কোন সাফল্য অর্জন করতে পারবো না। সন্ত্রাসবাদ দিয়েই এই সন্ত্রাসকে দমন করতে হবে।

আমি যেন বৈপ্লবিক এক চিন্তাধারায় বুঝতে পারি যে ঐতিহাসিক এক প্রতিষ্ঠান-ই ইতালিকে রক্ষা করবে। হ্যাঁ, এই ধ্বংসের হাত থেকে। ন্যায্য এবং ন্যায়পরায়ণ একটা শক্তি-ই এই বে-সামাল পৃথিবীতে হয়তো বা অবশ্যম্ভাবী।

আমাদের গতকালের গণতন্ত্র মারা গেছে; সেই মৃত গণতন্ত্রের ইচ্ছাপত্রও পড়া শেষ। সেই ইচ্ছাপত্রে বিশৃঙ্খলা ছাড়া ভবিষ্যত বংশধরদের জন্য আর কিছুই রেখে যাওয়া হয় নি।

।। ফ্যাসিজিমের উদ্যান ।।

ইতস্তত এই দাঙ্গা-হাঙ্গামার পেছনে গভীর একটা নৈতিক রহস্য ছিল।

ইতালির উচ্চ শ্রেণীর লোকেরা কিন্তু নিজেদের এই দাঙ্গা-হাঙ্গামার মধ্যে জড়ায় নি। লিবারেল পার্টি তো সব কিছু সোশ্যালিস্টদের হাতে তুলে দিয়েছে।

শ্রমিক এবং কৃষকশ্রেণীর মধ্যে তখনো অজ্ঞতার অন্ধকার গভীরভাবে ছেয়ে ছিল। চেয়ারে বসে বসে শুধু উপদেশ দিয়ে এই অগ্নিরেখা নির্বাপিত করা সম্ভবত ছিল না। এই সংঘর্ষকে মেনে নিয়ে সেই রণক্ষেত্রে আরো উন্নত ধরনের সংঘর্ষ সংগঠিত করে তবে এই শয়তানি শক্তির মোকাবিলা করা যেতো।

আমাদের সঙ্গীসাথীরা কিন্তু যুদ্ধ কি তা' ভালোভাবেই জানতো। ওদের মধ্যে থেকেই সংগ্রাম করার জন্য এই প্রতিষ্ঠানের জন্ম হয়েছিল। অনেকেই আবার এই প্রতিষ্ঠানে যোগ দিতে এসেছিল ইতালির বিভিন্ন ইউনিভার্সিটি থেকে। এইসব ছাত্রের দল পার্টির আদর্শে উদ্‌বুদ্ধ হয়ে লেখাপড়া ছেড়ে দিয়েই চলে এসেছিল।

গতকালের কাপুরুষতা এবং বিশ্বাসঘাতকতাকে ঝেড়ে ফেলে দিয়ে নিশ্চিত ছিলাম যে এই যুদ্ধে আমরা জিতবোই। তবে তারজন্য পথ তৈরি করতে হবে। আর এই পথ যাবে সংঘর্ষ, কুরবানি আর রক্তের মধ্যে দিয়ে। জনসাধারণ যে শৃঙ্খলা, ন্যায়পরায়ণতা চায়— সেই ন্যায় এবং শৃঙ্খলাকে আমাদের যেভাবেই হোক প্রতিষ্ঠা করতে হবে। তবে সবচেয়ে

কঠিন কাজ হলো বিরুদ্ধ পক্ষের প্রচারের মোকাবিলা যথাযথভাবে করা। জলে দুধ মেশানো আর শুধু আর কথার পর কথা সাজানো এই প্রচার সর্বস্ব সরকারকে সবার সামনে তুলে ধরতে হবে। নির্লজ্জ সংসদীয় আর সাংবাদিকতার বিরুদ্ধে প্রচার-যুদ্ধে জিততে হবে।

আমরা একহাতে যেমন উদ্ধারের কাজে নামি, অপর হাত লাগাই শেষদিনে পুনরুত্থানের কাজে। চারদিকে মৃতের পাহাড়—কিন্তু দিগন্তে তখন নজর দিলে দেখা যাবে ইতালির অন্ধকার আকাশে ভোরের সূর্য না উঠলেও আলোর ইসারা উঁকি মারছে।

মর্মান্তিক ১৯২১ সাল ফিউমের বিয়োগান্ত নাটকের সঙ্গে সঙ্গে শেষ হয়ে গেছে। রাপালো চুক্তির দৌলতে ফিউমে তখন ইতালির থেকে বিচ্ছিন্ন; কিন্তু ফিউমে ইতালির প্রতিরোধ এতো তীব্র ছিল যে সেই অতীতে এতো তীব্রতা অন্তত প্রতিরোধের ক্ষেত্রে আর কখনো দেখা যায় নি। ডি আনুনজিয়ো তো প্রকাশ্যে ঘোষণা করে কোন মূল্যেই সে শহর ছেড়ে যাবে না। কারণ এই শহর এতো অত্যাচার নির্যাতন সহ্য করেও প্রাণবন্ত এবং ইতালির আত্মা এই শহরে অত্যন্ত সজীব।

আমিও কিন্তু তখন প্রতিটি দিন এই নাটকের মধ্যে দিয়েই অতিবাহিত করেছি। প্রচারের প্রথম দিন থেকেই আমি আর ডি আনুনজিয়ো একসঙ্গে কাজ করে গেছি। প্রায় বছর খানেকের ওপর হয়ে গেল ওর কাছ থেকে নিয়মিত ভ্রাতৃসুলভ চিঠি পেয়েছি। আর এই চিঠিগুলো আমাকে ফিউমের প্রতি এক অদ্ভুত আকর্ষণে আকর্ষিত করেছে। যেদিন থেকে সেই প্রায় ধ্বংসস্তূপে পরিণত হওয়া শহরে লোকজন বসবাস করতে শুরু করেছে, কবি সেইদিন থেকে আমাকে জানিয়েছে যে কবর থেকে শহরটার পুনরুত্থানের জন্য সে সংগ্রাম করে যাবে।

১৪ই সেপ্টেম্বর, ১৯১৯ সালে আমাকে পাঠানো ডি আনুনজিয়োর চিঠিতে কিছু প্রমাণ পাওয়া যেতে পারে। চিঠিটা আমার খবরের কাগজে প্রকাশের জন্য পাঠানো হয়েছিল। বলাবাহুল্য যথেষ্ট বলিষ্ঠ এবং পুরুষোচিত।

প্রিয় মুসোলিনি,

অত্যন্ত তাড়াতাড়িতে দু'লাইনের এই চিঠিটা আপনাকে লিখছি। ঘন্টার পর ঘন্টা আমাকে কাজ করে যেতে হচ্ছে। হাত এবং চোখে রীতিমতো বেদনা বোধ করছি। আমার সাহসী ছেলে গ্যাব্রিলিনোর মারফত্ আপনাকে পাণ্ডুলিপিটা পাঠাচ্ছি। যদি সংশোধনের প্রয়োজন হয়, করলে বাধিত হবো। সংগ্রামের এটা প্রথম পর্ব; বলাবাহুল্য আমার নিজের ভঙ্গীতে এই সংগ্রামের শেষ আমি দেখতে চাই। তবে আপনার সংশোধন যে যথেষ্ট সাহসের সঙ্গে করা হবে তা'তে আমার কোন সন্দেহ নেই। দয়া করে ছাপার সময় সাদা বিরতি দিলে বুঝতে পারবো কোথায় শব্দগুলো ছেড়ে যাওয়া হয়েছে। তারপর দু'জনে মিলে ভেবেচিন্তে যা করার, করবো।

আমি আবার আপনাকে লিখবো। আপনার কাছেও যাবো। আপনার সুসামঞ্জস্য পূর্ণ এবং নির্দিষ্ট লক্ষ্যে ছোঁড়া ঘুষিগুলো যথেষ্ট প্রশংসার দাবী রাখে। আমাকে আপনার হাত ধরতে দিন।

আপনার

গাব্রিয়েল ডি আনুনজিয়ো

জুলাই থেকে ডিসেম্বর ফিউমের পরিস্থিতি আরো জটিল হয়ে দাঁড়ায়। স্থির সংকল্পে দৃঢ়

ডি আনুনজিয়ো আর জিওলিটি কাউন্ট স্কোরজার রাপালো চুক্তির প্রতিরোধে পুরো শহর অবরোধ করে। সেই অবরোধের ফলাফল হয় ভয়াবহ। সুতরাং সরকার সৈন্যদলের সাহায্যে সেই অবরোধ ভেঙে শহরের দখল নিতে বদ্ধপরিকর হয়। ওরা এই সৈনিক অভিযানের জন্য খৃষ্টমাসের সময়টাকে বেছে নেয়। কারণ তখন পর পর দু'দিন কোন সংবাদপত্র প্রকাশিত হয় না। ইতালিয়ান সৈন্য ইতালির একটা শহরের ওপরেই হামলে পড়ে। মুষ্টিমেয় কয়েকজন লিজিয়েন অর্থাৎ প্রাচীন রোমের সৈন্যদের মতো বীর, দৃঢ়চেতা ইতালিয়ান ডি আনুনজিয়োর যোদ্ধাদের ওপরে যতো জোরে সম্ভব আঘাত হানে। ভাইয়ের রক্তে রাস্তা লাল হয়ে যায়। বেশ কিছু ইতালিয়ান নিহত হয়। মর্মান্তিক এই ঘটনায় সমগ্র ইতালি তীব্র আঘাতে স্তব্ধ এবং বিমর্ষ হয়ে পড়ে। তারপরেই আসে ইতালির জনসাধারণের মনে তীব্র অনুশোচনা, ফিউমের ব্যাপারে। বোঝাপড়ার একটা পরিবেশ এবং পরিস্থিতি মাথা উঁচু করে ওঠে। একটা সূত্রও উঁকি মারে। ডি আনুনজিয়ো তার সমস্ত কর্তৃত্ব নাগরিক একটা কমিটিকে হস্তান্তর করে শহর ফিউমে ছেড়ে চলে যায়। অজেয় বিশ্বস্ততার সঙ্গে দীর্ঘ ষোল মাস ধরে ফিউমে ঘাটি গেড়েছিল ডি আনুনজিয়ো। আমি তখন যা লিখেছিলাম তা' কিন্তু প্রতিটি ইতালিয়ানের মনে প্রতিধ্বনিত হয়েছিল।

বাগাড়ম্বার এবং তাঁতের মাকুর মতো কথার নাচানাচির নাটক কিন্তু নিখুঁত ছিল। হ'তে পারে মর্মন্তুদ কিন্তু ত্রুটিহীন। একদিকে দেশ শাসনের ঠাণ্ডা কারণগুলো, অপরদিকে উষ্ণ আদর্শের লড়াই। যারা সেই লড়াইয়ের প্রয়োজনে নিজেদের জীবন পর্যন্ত উৎসর্গ করতে রাজী ছিল। আমাদের পছন্দের জন্য ডাকা হলে আমরা অস্বস্তি এবং অপরিপক্ক দুর্বল ছোট্ট দল হলেও আদর্শের স্বপক্ষে দাঁড়াই।

কয়েকদিন পরে ৪ঠা জানুয়ারী, ১৯২১ সালে লিজিয়েন অফ রেন্‌চি শীর্ষক মৃত্যুর ভবিষ্যতবাণী সম্পর্কে একটা প্রবন্ধ লিখি; আমি যতো প্রবন্ধ লিখেছি তারমধ্যে এই প্রবন্ধটার সম্পর্কেই লোকে সবচেয়ে বেশি আগ্রহ প্রকাশ করেছিল। প্রবন্ধটার শেষ হয়েছিল নীচের শব্দগুলো দিয়ে।

মহাযুদ্ধের শেষ বলি হলো ওরা। এবং তাতেই শেষ হয় নি। ইতালির ত্রিবর্ণ রঞ্জিত পতাকা ওদের সম্বর্ধনা জানাবে। ইতালির পবিত্র মাটির নীচের কবরে ওরা চিরশান্তিতে শায়িত। ওদের কবর হলো মন্দির। আস্তে আস্তে একদিন ওদের সমস্ত শাখা-প্রশাখা বিলুপ্ত হয়ে যাবে। কবরের নীচে শায়িত মৃতদেহগুলো সাক্ষী থাকবে যে ফিউমে আর ইতালি এক। একই মাংসে গড়া, একই আত্মা। রক্ত দিয়ে যা চিরদিনের জন্য লেখা হয়েছে— কূটনৈতিকদের কলমের কালি তা' কখনোই মুছে দিতে পারবে না।

জয় হোক রোন্‌চি লিজিয়েনের, দুচের নেতা ডি আনুনজিয়োর—বেঁচে থাকলে নিশ্চয়ই ফিরে আসবে; তবে মৃত্যুতে তো ফিরে আসা সম্ভব নয়। ওরা বরফে আচ্ছাদিত নেভোসো'র পাহাড়গুলোর চূড়ায় শান্তিতে ঘুমিয়ে থাকবে।

সন্ত্রাসবাদের প্রয়োজনীয়তা ইতিমধ্যেই স্বীকৃতি পেয়েছে। আমাদের প্রত্যেকে এটাকে স্বীকারও করে নিয়েছে। এখন শুধু নির্দিষ্ট কার্যক্রম বেছে নিয়ে কাজ শুরু করে দেওয়া। স্কোয়াড দাঙ্গাহাঙ্গামার জন্য প্রয়োজনীয় গোষ্ঠী তৈরির ব্যাপারটা আমি আগে ভাগে মনে মনে ঠিক করে রেখেছিলাম। আর এই ব্যাপারে সেই গোষ্ঠীগুলোকে সীমা বেঁধে দিয়ে পরিষ্কার নির্দেশও দিয়ে দিয়েছিলাম। ওরা অত্যন্ত শৃঙ্খলার সঙ্গে প্রতিশোধ নেওয়ার কাজ শুরু করে।

আমাদের সন্ত্রাসবাদ প্রচণ্ড রকমের হওয়া প্রয়োজন। তবে এই দলকে শুধু ভদ্র হলেই চলবে না, বিশ্বস্ততাও থাকা দরকার। লিজিয়েন অফ গারবল্ডির মতো। তবে এই সন্ত্রাসবাদীদলের সেন্ট্রাল কমিটি অবশ্যই চালিত হবে আমার নির্দেশ অনুযায়ী। শুধু সেন্ট্রাল কমিটি-ই নয়, স্থানীয় দলপতিবৃন্দ এবং তাদের সন্ত্রাসবাদ শাখাকেও তা' মেনে নিতে হবে। ইতালির সমস্ত প্রদেশ এবং শহরেও তা' সমানভাবে প্রযোজ্য হবে। বিভিন্ন ইউনিভার্সিটি থেকে সাহসী এবং পরিশ্রমী ছাত্ররাই এই দলে যোগ দিয়েছিল। ইতালির ইউনিভার্সিটিতে প্রচুর সংখ্যায় উজ্বল ছাত্র তখন বর্তমান ছিল; তারা পড়াশোনা ছেড়ে দিয়ে রাজনৈতিক জীবন বেছে নিয়ে ফ্যাসিজিম মতবাদ গ্রহণ করে। এই উৎসুক ছাত্রের দল শুধু নিজেদের অস্তিত্বের কথা স্মরণে না রেখে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল, সেইসব বেইমানদের বিরুদ্ধে যারা দেশের সঙ্গে জেনে শুনে বেইমানী করেছে। পরে আমি এইসব দুঃসাহসিক ছেলেদের অ্যাড অনোরম সম্মানে সম্মানিত করি। নিজের জাতিকে রক্ষা করার জন্য হাসি মুখে ওরা দেশের মাটিতে নিজেদের রক্ত ঢেলে দিয়েছে। ওদের মধ্যেই ছিল সব বিষয়ে শ্রেষ্ঠ নব্য যুবক, যারা শৃঙ্খলাবদ্ধ উপায়ে সন্ত্রাসের দ্বারা সোশ্যাল কম্যুনিষ্ট মাকড়সার দলকে নির্মূল করে ইতালির জনসাধারণকে সেই বিষাক্ত জীবাণুর হাত থেকে বাঁচিয়েছে। যেখানেই দেখেছে জনসাধারণকে বিরক্ত করা, র‍্যানসাম, ব্ল্যাকমেলিং, উৎপীড়নের মাধ্যমে অর্থ তোলা। বিশৃঙ্খলতা—সেখানেই ফ্যাসিষ্ট স্কোয়াড প্রতিরোধে নেমেছে। আমাদের এই যুদ্ধের পোযাক ছিল কালো রঙের সার্ট। দুঃসাহসিকতার প্রতীক।

স্বাভাবিক ভাবেই লিবারেল—ডেমোক্র্যাটিক সরকার ফ্যাসিষ্ট আন্দোলনের পথে যতোটা সম্ভব বাধা দিতে শুরু করে। আর এই বাধা দেওয়ার কাজে নিযুক্ত করে গার্ডইয়া রেজিয়া অর্থাৎ রয়াল গার্ডদের। রয়াল গার্ডরা অন্ধভাবে জাতীয়তাবাদকে ঘৃণা করতো। কিন্তু আমরা, যাদের সাহস, ক্ষমতা এবং পারদর্শিতা ছিল এই রয়াল গার্ডদের মুখোমুখি হওয়ার, তারা ফাঁদ পেতে চোরাগুপ্তা আক্রমণ এবং মৃত্যু কোন কিছুকেই ভয় করতো না। আমাদের যখন জেলে ধরে নিয়ে যেতো, দীর্ঘদিন সেই কারাগারের অন্তরালে কাটিয়ে অপেক্ষা করতাম কখন বিচারের জন্য কোর্টে তুলবে। সৈন্যদের ওপরে অলক্ষ্যে আমার প্রভাবকে নিজেরই রহস্যময় বলে মনে হ'তো। ছেলেরা ভাবতো ইতালিকে যারা ভুল পথে চালিত করেছে, তাদের প্রতি প্রতিশোধ নেবার জন্যই আমার এই জীবন উৎসর্গকৃত। মৃত্যুর মুখে যারা, তারা বলতো সাদা চাদরের বদলে আমাদের মৃতদেহ যেন কালো সার্টে মোড়া হয়। বলতে আপত্তি নেই যে বুঝতে পারতাম মৃত্যুর ঠিক আগে ওদের চিন্তা ঘিরে থাকতো প্রিয় স্বদেশ আর দুচেকে ঘিরে। নিজেকে ধরে রাখতে পারতাম না। অস্থির হয়ে পড়তাম। প্রেম আর জীবনের সংগীত যেন ওদের মধ্যে বর্ণময় হয়ে ওঠে। হৃত যৌবন ফিরে আসে। সেই সঙ্গে ফিরিয়ে নিয়ে আসে ইতালির হারিয়ে যাওয়া দুঃসাহসিকতা এবং দৃঢ়তা। লাগামছাড়া পুরুষোচিত সৌন্দর্য ইত্যাদি মিলে মিশে সোশ্যালিষ্টরা ভয়ে রীতিমতো কাঁপতে শুরু করে। লিবারেলদের দ্ব্যর্থব্যঞ্জক কথাবার্তা দূরে সরে গিয়ে কবিতার মতো যুদ্ধের ভাষা, একটা জাতির জাগরণের মধুর ডাক অনেকগুণ বেশি হয়ে পুনরুত্থানরত সমগ্র জাতির কানে বাজে। জেগে ওঠার শক্তি জোগায়।

আমাদের মধ্যে প্রচুর সংখ্যায় মারা যায়। তবে লালের দল যারা বরাবর ভাসা ভাসা কাজ করে এসেছে বা কথাবার্তা বলেছে, তারা কিন্তু আমাদের রাজনৈতিক সততায় বুঝতে পারে ফ্যাসিজিমের তরফ থেকে ওদের বিপদ ঘনিয়ে আসছে। সেই কারণে যতো ভাবে

সম্ভব আমাদের বাধা দিয়ে নিরস্ত করার চেষ্টা করে। ওরা ফাঁদ পেতে ঔৎ পেতে আরো সতর্কতার সঙ্গে যেমন একদিকে অপেক্ষা করে, তেমনি বন্য জানোয়ার ধরার মতো চোরাগুপ্তা জালও পাতে অত্যন্ত ধূর্ততার সঙ্গে। প্রত্যেক দিন রাস্তায় এবং গ্রামের দিকে খোলা জমিজমা পরস্পরের ভয়াবহ সংঘর্ষে রক্তে ভিজে যায়। বিশেষ করে রোববার, ছুটির দিনগুলোয় বা কোন উৎসবের জমায়েতে আক্রমণ যেন জোরদার হয়ে পড়ে।

আমি কিন্তু আমাদের সন্ত্রাস প্রয়োজনের মধ্যেই শুধু সীমাবদ্ধ রাখি নি, প্রতিটি লেফট্‌টেনান্ট এবং অধীনস্থরা যাতে আমার এই নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলে তারদিকে সুতীক্ষ্ম নজর রেখেছিলাম। ওরা দুঃখ এবং হতাশার সঙ্গে আমার নির্দেশ মেনে নিতো। আসলে ওদের মন তখন আচ্ছন্ন ছিল সঙ্গীদের নৃশংস হত্যায়। কিন্তু তবু বদলা নেওয়ার পরিবর্তে আমার আদেশকে মানতো। আমার কর্তৃত্বকে স্বেচ্ছায় এবং সম্পূর্ণরূপে ওরা স্বীকার করে নিয়েছিল। যদি ইচ্ছে করতাম, যে কোন সময় কম্যুনিষ্টদের বিরুদ্ধে ঘোর সংঘর্ষ শুরু করে দিতে পারতাম। ছেলেরা কিন্তু তা'তে আনন্দে লাফিয়ে উঠতো। কিন্তু ওরা আমাকে দেখতো ওদের সর্বাধ্যক্ষ রূপে, যার কোন পরিবর্তন হ'তে পারে না। আর আমার কথাই ছিল ওদের কাছে আইন বিশেষ।

ইতিমধ্যে এমন কিছু ঘটনা ঘটে যা আমাকে শুধু বিস্মিত করে না, আগের চেয়েও বেশি করে ব্যাপারগুলোকে ভাবতে এবং বিশ্লেষণ করতে শেখায়। আর আমার ভেতরে দায়িত্ব বোধটাকেও বাড়িয়ে তোলে। এই ঘটনা প্রবাহগুলোর মধ্যে একটা ঘটনা আমার স্পষ্ট মনে আছে। ছেলেটার বয়েস খুব বেশি হলে বছর কুড়ি হবে; নাম ছিল কাউন্ট নিকালো ফস্‌কারী। নৃশংসভাবে একটা কম্যুনিষ্ট গুণ্ডা ওকে ছোরা মেরেছিল। দু'দিন প্রচণ্ড যন্ত্রণায় কষ্ট পেয়ে ছেলেটা মারা যায়। সেই ক্ষতের যন্ত্রণায় মৃত্যুর মুখোমুখি হয়েও সে সবসময় আমার একটা ছবি হাতের কাছে রাখতো। এবং বার বার বলতো যে সে আনন্দিত এবং এই মৃত্যুর মুখোমখি হ'তে তার এতোটুকু ভয় নেই। কারণ সে আমার কাছে শিখেছে কী করে বীরের মতো মৃত্যুবরণ করতে হয়।

আমি শক্ত হাতে পুরা ব্যাপারটাকেই রাজনৈতিক সংঘর্ষের রূপ দিয়েছিলাম। কারণ আমার ধ্যান-ধারণা ছিল যে সংঘর্ষটা ভদ্রতার বেড়া পেরিয়ে না যায়। আমি জনসাধারণের পরস্পরের অন্তর্দ্বন্দ্বের ব্যাপারটা গভীর দুঃখের সঙ্গে অনুভব করতাম। কিন্তু চরম রাজনৈতিক জটিলতায় যখন ধনুকটা প্রয়োজনের চেয়ে অনেক বেশি বেঁকে গেছে, তখন হয় তীরটা মাথার ওপর দিয়ে উড়ে যাবে না হয় ধনুকের ছিলা ছিঁড়বে। কয়েক মাসের সন্ত্রাসবাদের ফলে গত পঞ্চাশ বছর ধরে চলা সংসদীয় ফাঁকা খণ্ড যুদ্ধে আমরা জয় লাভ করি। শুধু তা-ই নয়, রাজনৈতিক ঘূর্ণিবর্তের জটিলতা, স্বার্থপরতা এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যক্তিগত আশা-আকাঙ্খা গুলোও সরকারের গোলক ধাঁধায় হারিয়ে যায়। সরকার যেন প্লেট ভর্তি জ্যাম; মাছিগুলোকে আকর্ষণের জন্য-ই যেন সেই সরকারের অস্তিত্ব বজায় রাখা হয়েছিল।

১৯২১ সালে সরকারের ছত্রছায়ায় বিরোধী পক্ষের সঙ্গে একটা রাজনৈতিক সমঝোতায় আসার চেষ্টা করি। ব্যাপারটা সোশ্যালিষ্ট এবং লিবারেলদের ধারণার অতীত ছিল। আমার এই বিনয় মাখানো শিষ্ট প্রস্তাবে অপরপক্ষের ব্যাঙ্‌গুলো লাফালাফি শুরু করে। যেন হঠাৎ ওরা ভূমিকম্পের কাঁপন অনুভব করতে শুরু করেছে। আমার এই সাময়িক যুদ্ধ বা সংঘর্ষ বিরতির প্রস্তাবে সোশ্যালিষ্টরা স্বাক্ষর করলেও কম্যুনিষ্টরা এগিয়ে আসে না। বরং কম্যুনিষ্টরা

খোলা সংঘর্ষ-ই জারী রাখে। আর সোশ্যালিষ্টরাও যতোরকম উপায়ে সম্ভব ওদের মদত জুগিয়ে যায়। একটা শান্তি প্রচেষ্টা এইভাবে অঙ্কুরেই বিফল হয়। আসলে সোশ্যালিজিম তখন ইতালির জীবনটাকেই বিষিয়ে দিয়েছে। দুর্নীতিগ্রস্থ করে তুলেছে। সব সময় অপর তরফে কিছু প্রতিদ্বন্দ্বী থেকে যায়; সুতরাং স্বল্প বিরতির পরে আবার সংঘর্ষের শুরু হয়। বাক্যের সঙ্গে ব্যাকরণগত সম্পর্কহীন পদের দেখা সব সময়ই পাওয়া যায়। এখানেও তার ব্যতিক্রম ঘটে না। চূড়ান্ত পর্যায়ে না ওঠা পর্যন্ত এই পরস্পর সংঘর্ষ আর থামে না। তবে দ্বিতীয়বার এই সংঘর্ষের সূত্রপাত কিন্তু শেষ হয়ে গিয়ে ১৯২১ সালের বিরাট রাজনৈতিক যুদ্ধের সৃষ্টি করে।

সেই বছরের ভয়াবহ তুমুল কলহের বিবরণ দেওয়ার প্রয়োজন বোধ করি না। সেইসব ঘটনা আজ অতীতের গর্ভে বিলীন হয়ে গেছে। কিন্তু মানসিক বিপর্যস্ত করা আলো আমার সঙ্গীদের মনে বহুবর্ষকালব্যাপি প্রজ্বলিত থাকবে। আর ওদের হৃদয়ের অন্তিম গহিনে হারিয়ে যাওয়া সঙ্গীদের অক্ষয় স্মৃতির শিখা জেগে থাকবে চিরদিন। ফ্যাসিষ্ট লিজিয়েনদের পক্ষে কখনো এবং কোন পরিস্থিতিতেই তা' ভোলা সম্ভব নয়। বিজয় যখন সুনিশ্চিত নয়, তখনো অনেকে মারা গেছে। তবে ঈশ্বর তাদের আত্মাকে নিশ্চয়ই পুরস্কৃত করবে, যারা তাদের দৃঢ় বিশ্বাসের তাগিদাতে মহৎ অক্ষরে রক্ত দিয়ে নিজেদের সৎ প্রচেষ্টার কথা সবাইকে জানিয়ে গেছে।

১৯২১ সালের প্রথম মাসগুলোয় পো উপত্যকায় দাঙ্গা-হাঙ্গামা প্রচণ্ডভাবে ছড়িয়ে পড়ে। ফ্যাসিষ্টদের মৃতদেহ নিয়ে শোকযাত্রার সময়েও সোশ্যালিষ্টরা গুলি ছুঁড়তে ইতস্তত করে নি। রোমে এই ঘটনা ঘটেছে। এই সময়ে লেগহর্ণে সোশ্যালিষ্টদের কংগ্রেস চলছিল। মতভেদের জন্য গীর্জার মধ্যেই যেন বিচ্ছেদ ঘটে যায়। এটাই ইতালিতে স্ব-শাসিত কম্যুনিষ্ট পার্টি গঠনে সাহায্য করে—যা পরবর্তীতে ইতালির রাজনৈতিক জীবনে অতি ঘৃণ্যভাবে নিজেদের প্রকাশ করেছিল। আমি কেন, সবাই জানতো এই নতুন কম্যুনিষ্ট পার্টি গোপন করার চেষ্টা করলেও ওরা শুধু মস্কোর উৎসাহে এবং সাহায্যেই গঠিত হয়েছিল এমন নয়, ওদের কাজকর্মের নির্দেশও আসতো মস্কো থেকে। হানা দেওয়া অন্যান্য দেশের মতো আমাদের ওপরেও ওরা আক্রমণ চালিয়েছিল।

ইতালিয়ানদের প্রিয় শহর ত্রিয়স্তে; যে শহর এতোদিন ধরে ফ্যাসিষ্টদের উৎসাহের শিখা উজ্জীবিত করে রেখেছে, সেই শহরেই ফ্যাসিষ্টদের এই মহাসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ত্রিয়স্তে ফ্যাসিষ্টদের সর্বোচ্চ নেতা ছিল জিয়োন্তা। ইতালিয়ান চেম্বারের সদস্য ছাড়াও প্রথম থেকেই মনে প্রাণে পুরোপুরি ফ্যাসিষ্ট। জিয়োন্তা খুব ভালোভাবেই জানতো বিভিন্ন পরিবেশ এবং পরিস্থিতিতে কি ভাবে স্লাভদের প্রবেশ পথের মাঝে অবরোধ দিতে হয়। তা'ছাড়া শহর ত্রিয়স্তেতে যারা কর্তৃত্ব করে বেড়াতো, তাদের মূর্খামীও জিয়োন্তার অজানা ছিল না। বরং তাদের ও হাড়ে হাড়ে চিনতো। সেই বিশাল জমায়েত হয়েছিল রোসেটি থিয়েটারে। আমিও সেই জমায়েতে বক্তৃতা দিয়েছিলাম। সেই বক্তৃতায় আমাদের দলীয় আদর্শের ভিত্তিগুলো শুধু ফ্যাসিষ্টদের জন্যই তুলে ধরিনি, যারা এই নতুন ইতালির রাজনৈতিক পটভূমিকা সম্পর্কে আগ্রহী—তারাও যাতে আমাদের আদর্শগুলো বুঝতে পারে। পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জড়িয়ে গিট বেঁধে যাওয়া আমাদের বৈদেশিক নীতি যা অবিরত ইতালিয়ানদের বিরক্ত করে চলেছে,

সেই সম্পর্কেও বিস্তারিত বক্তব্য রাখি। আর তারপরেই দাবী জানাই যে স্কোরজা আর জিওলোটি যে রাপেলো চুক্তিতে সই করে ফিউমেকে ইতালি থেকে বিচ্ছিন্ন করেছে, সেই চুক্তি পুরোপুরি বাতিল করতে হবে। এই চুক্তির জন্যই আমাদের এই অধঃপতন, যা আমাদের কর্দমাক্ত এক জলাভূমির দিকে প্রতিনিয়ত টেনে নিয়ে চলেছে। এই অস্বীকৃতির দায়-দায়িত্ব পুরোটা শেষ মুহূর্তের রফাকারীদের ঘাড়ে চাপিয়ে দিলে চলবে না। সংসদ-ই এই অস্বীকৃতির জমি তৈরী করেছিল যা ক্রমে ক্রমে ছড়িয়ে পড়েছিল আমাদের সাংবাদিকতায়। এমন কি আমাদের ইউনিভার্সিসিটির এক অধ্যাপক এই ব্যাপারে একটা বইও প্রকাশ করেছিল। অবশ্যই সেই বইটা অধ্যাপকের নিজের লেখা নয়। অনুবাদ মাত্র। যাইহোক জাগাব্রিয়া নামক সেই অধ্যাপকের চিন্তাধারা অনুসারে ডালমাটিয়া নাকি ইতালির অংশ ছিল না।

এইসব অজ্ঞতার মধ্যেই ডালমাটিয়ার ট্রাজিডি নিহিত ছিল। যা ভুল বিশ্বাস আর অবিবেচনা প্রসূত। আমরা আমাদের ভবিষ্যত কর্মধারার মাধ্যমে এই দুর্ভাগ্যজনক ভুলগুলোকে মুছে দেবো। আমরা ভালোবাসবো, রক্ষা করবো এবং কাছে টানবো ইতালির অবিচ্ছেদ্য অংশ ডালমাটিয়াকে।

চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়ে গেছে। এই চুক্তিকে নাকচ করার পথ বেছে নিতে হবে কতোগুলো কারণের মাধ্যমে। অবশ্য যে কোন একটা কারণই এই স্বাক্ষরিত চুক্তি বাতিল করার পক্ষে যথেষ্ট। প্রধান কারণ দু'টো হলো, হয় বিদেশী কোন শক্তির হঠাৎ আক্রমণ, না হয় ইতালিতে গৃহযুদ্ধ। কিন্তু দু'টো কারণের একটা ঘটাও সম্ভব নয়। পাঁচ বছর ধরে রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের পর তথাকথিত এই শান্তি চুক্তির বিরুদ্ধে রাস্তায় লোকজনকে উত্তেজিত করা অসম্ভব ব্যাপার। কারোর পক্ষেই এই ধরনের অলৌকিক কোন কাজ করা সম্ভব নয়।

আজ হয়তো বা সেই চুক্তির বিরুদ্ধে বিদ্রোহের আওয়াজ তোলা যেতে পারে। কিন্তু ১৯২১ সালের নভেম্বরে চুক্তি ভালো বা খারাপ যা-ই হোক না কেন, নব্বইভাগ ইতালির জনসংখ্যা যখন সেই চুক্তি মেনে নিয়েছে—সুতরাং সেই ব্যাপারে জনসাধারণকে উস্‌কে দিয়ে সেই চুক্তির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা সম্ভব ছিল না।

ফিউমের ব্যাপারটা নিয়ে ইতালিতে যে অনিশ্চয়তার বাতাবরণের সৃষ্টি হয়েছিল, যার জন্য চুক্তির বিরুদ্ধে যে কোনরকমের বিদ্রোহ ব্যর্থ হ'তে বাধ্য। সেইসব পরিবেশ এবং পরিস্থিতির চুলচেরা বিচার বিশ্লেষণ করার পর ১৯২১ সালে আমি ফ্যাসিষ্টদের কিছু রাজনৈতিক কার্যক্রম স্থির করি।

ইতালিকে মুক্ত করার সংগ্রামে যারা বদ্ধপরিকর, সেই ফ্যাসিষ্টদের জিজ্ঞাস্য হলো ঃ প্রথমত, এই তথাকথিত শান্তি চুক্তিগুলোকে আবার পরীক্ষা করে দেখতে হবে। এবং চুক্তিগুলোর যে অংশ কাজে প্রয়োগ করা সম্ভব নয় অথবা নতুন কোন যুদ্ধ লাগলে চুক্তির যে অংশগুলো ইতালির জনসাধারণের মনে ঘৃণার সৃষ্টি করবে।

দ্বিতীয়ত, ফিউমের সঙ্গে ইতালির অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সংযোজন এবং ডালমাটিয়ার দেশগুলোয় যে সব ইতালিয়ান বসবাস করছে, তাদের ইতালির অভিভাবকত্বের ছত্রছায়ায় নিয়ে আসা।

তৃতীয়ত, পশ্চিমদিকের অর্থনৈতিক শক্তিশালী দেশগুলোর কাছ থেকে ইতালিকে বিচ্ছিন্ন করে দিতে হবে, যাতে ইতালি তার নিজের দেশের উৎপাদন শক্তি বাড়াতে পারে।

চতুর্থ, অষ্ট্রিয়া, জার্মানী, বুলগেরিয়া, তুর্কী, হাঙ্গেরী ইত্যাদি দেশ এবং জাতির প্রতি নতুন করে সম্পর্ক স্থাপনের আহ্বান জানাতে হবে; তবে সেই আহ্বানের সময় নিজেদের মর্যাদা যথাযোগ্যতার সঙ্গে বজায় রাখা প্রয়োজন। তার সঙ্গে উত্তর এবং দক্ষিণের সীমান্ত রক্ষা করার জন্য তীক্ষ্ণ নজর রাখারও দরকার।

পঞ্চম, পূবের কাছের এবং দূরের দেশগুলোর সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তুলতে হবে। সোভিয়েতের কবলের দেশগুলোকে বাদ দিলে চলবে না।

ষষ্ঠ, উপনিবেশ স্থাপনের অধিকার এবং প্রয়োজন দু'টোই আমাদের রয়েছে।

সপ্তম, আমাদের ইউনিভার্সিটিগুলোয় ট্রেনিং দিয়ে বিভিন্ন দেশে আমাদের কূটনৈতিক যোগ্য ব্যক্তি পাঠানোর প্রয়োজন। যাতে তারা অতীত কূটনৈতিক পদ্ধতির শুধু সংশোধন করতেই সক্ষম না হয়, নতুন করে বিভিন্ন জাতি এবং দেশের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্কও স্থাপন করতে পারে।

অষ্টম, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক এবং দ্রুত যোগাযোগ ব্যবস্থার মাধ্যমে ভূমধ্যসাগরীয় এবং প্রশান্ত মহাসাগরীয় দেশগুলোয় আমাদের উপনিবেশ গড়ে তোলার একান্ত প্রয়োজন।

জ্বলন্ত বিশ্বাসের প্রতি অটুট আস্থা রেখে আমার বক্তব্যের উপসংহার টানি।

—নিয়তি। হ্যাঁ, আমি নিয়তি-ই বলবো। রোম আবার পশ্চিম ইউরোপের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে দাঁড়াবে। এসো আমরা আমাদের ভবিষ্যত বংশধরদের মধ্যে এই জ্বলন্ত বিশ্বাস প্রজ্জ্বলিত করে দেই ভবিষ্যতে ইতালিকে বাদ দিয়ে বা উপেক্ষা করে যাতে মানবত্বের কোন ইতিহাস লেখা সম্ভব না হয়।

১৯২১ সাল হলো মহাকবি দান্তের শতবার্ষিকী বছর। আমি এই মহামানবের নাম ভেবে স্বপ্ন দেখি—আগামীকালের ইতালি হবে ধনী এবং মুক্ত। সমুদ্র এবং আকাশে ইতালির সৈন্যদল একছত্র অধিকার লাভ করবে; জয়ধ্বনি উঠবে আমাদের জাতির স্মরণে। পৃথিবীর সর্বত্র·আমাদের লাঙল সোনার ফসল ফলাবে।

পরে লামবারডিয়ান ফ্যাসিস্ট সমাবেশে আমি ফ্যাসিস্টদের এই যুদ্ধের ফলাফলের হিসেবে আগামী কয়েকটা ঘটনার ছবি ওদের সামনে তুলে ধরি। মিলানে ফ্যাসিস্ট বন্ধুদের জমায়েতে বলি, এই কষ্টদায়ক এবং ক্লান্তিকর কাজের মধ্যে দিয়ে ফ্যাসিজিম মানুষদের উৎসাহকে এমনভাবে প্রজ্জ্বলিত করেছে যাতে আগামী দিনগুলো উজ্জ্বল হয়ে উঠতে পারে। যা আমাদের জাতিকে শাসন করবে।

আমার এইসব বক্তব্যের কারণে ইতিমধ্যে ইতালির মানুষের মনের পটভূমিকা আইনি এবং সন্ত্রাসবাদের পথে ক্ষমতা দখলের ইচ্ছার অঙ্কুরোদগম হ'তে শুরু হয়।

সোশ্যালিস্ট এবং কম্যুনিস্টরা নিয়ত ওদের নিজেদের মতবাদ নিয়ে তর্ক-বিতর্কের ঝড় তুলতো। যাতে তারা একের থেকে অপরকে বেশি ফ্যাসিস্ট বিরোধী বলে জনসাধারণের কাছে তুলে ধরতে পারে। কম্যুনিস্টদের মধ্যে বিবেকের দংশন বলতে কিছু নেই। ওরা প্রতিদিন-ই আইন ভাঙে এবং নিজেদের উপদেষ্টাদের প্রতি মূর্খের মতো কটাক্ষ করে।

ফ্লোরেন্সে দেশপ্রেমিকদের মিছিলের সময় কম্যুনিস্টরা ঝাঁপিয়ে পড়ে। বোমা পড়ে সেই মিছিলে। বিশেষ করে দলছাড়া ফ্যাসিস্টদের তাড়া করা হয়। সেই সময় বারোটা নামে অতি অল্প বয়েসের একজন ফ্যাসিস্টকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করা হয়। হতভাগ্য ছেলেটা তখন

আরনো নদীর ওপরের সেতুতে দাঁড়িয়েছিল। সেই অবস্থায় কম্যুনিষ্টরা ওকে ধরে নির্দয় ভাবে মারতে মারতে ওর শরীরটাকে যেন কাগজের মণ্ড করে ফেলে। তারপর সেতুর পাশ থেকে ওর প্রায়-মণ্ড রক্তাক্ত শরীরটাকে আরনোর জলে ছুঁড়ে দেয়। প্রাণ বাঁচানোর তাগিদে মৃতপ্রায় ছেলেটা রেলিংয়ের রড ধরে ঝুলে থাকলে কম্যুনিষ্টরা ওর হাতের আঙুলগুলোকে এমনভাবে পিযে দেয় যে হাতের মুঠো আল্‌গা হয়ে গিয়ে ছেলেটা জলে পড়ে ডুবে যায়। ওর মৃত দেহটা জলের ঘূর্ণিবতে পড়ে স্রোতের টানে কয়েক মুহূর্তের মধ্যে তলিয়ে যায়।

এই একটা ঘটনাতেই প্রমাণিত হয় যে ইতালিতে কম্যুনিষ্টরা কি রকম ভয়ানক প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়ে উঠেছিল। এই ঘটনাও যেন যথেষ্ট প্রতিহিংসার উদাহরণ নয়। শীঘ্র অ্যামফলির নৃশংস ঘটনাটা ঘটে। যেখানে দু'জন কম্যুনিষ্ট গুণ্ডা গুলিভর্তি কারবাইন নিয়ে হাজির হয়। সেই হতভাগ্য মৃতদেহগুলোকে দেখলে পরে বোঝা যায় অধঃপতিত কম্যুনিষ্টরা কী সাংঘাতিক রকমের প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়ে উঠেছিল। জঙ্গলের আদিবাসীদের মতো অবস্থা সেই মৃতদেহগুলোর। গুলিতে ঝাঁঝরা হয়ে যাওয়া মৃতদেহগুলোর পরণে এক টুক্‌রো কাপড়ও ছিল না।

এইসব ঘটনাগুলো কিন্তু শুধু একটা প্রদেশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। ক্যাসল মনফেরাটোতেও এই ধরনের ফাঁদে ফেলে নৃশংস ঘটনা ঘটেছিল। মৃতদেহগুলোর মধ্যে বৃদ্ধ দু'জন সারদেনিয়ান ঢুলিও ছিল; একজন অতি সাহসী ফ্যাসিষ্ট বন্ধু মারিয়া ডি ভিচিও সাংঘাতিকভাবে আহত হয়। শহর মিলানে দলছাড়া ফ্যাসিষ্টদের আলাদা করে তবে ওদের ওপরে কম্যুনিষ্ট গুণ্ডারা গোপনে আক্রমণ চালায়। আমাদের একজন প্রিয়তম বন্ধু অতি অল্পবয়স্ক অ্যাল্‌ডো সেটিকে বীভৎসভাবে আদিম উপায়ে হত্যা করা হয়।

কিন্তু ২৩ শে মার্চের ঘটনাটা যেন নৃশংসতা এবং বীভৎসতার সর্বোচ্চ সীমা ছাড়িয়ে যায়। শহরের ডায়না থিয়েটারে কম্যুনিষ্টরা একটা শক্তিশালী বোমা ফাটায়। থিয়েটার হল ভর্তি শান্ত নাগরিকরা তখন অপেরা দেখছিল। এই আকস্মিক বোমা বিস্ফোরণে কুড়িজন তৎক্ষণাৎ মারা যায়। পঞ্চাশজন দর্শক মারাত্মকভাবে আহত হয়। মিলানের প্রতিটি শহরবাসী এই ঘটনার প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য উন্মত্ত হয়ে ওঠে। এই গণরোষ প্রশমিত করার কোন পথ-ই আর অবশিষ্ট থাকে না। ফ্যাসিষ্টরা দলবেঁধে গিয়ে আবন্তি পত্রিকা অফিস শুধু ভাঙচুর করে না, জ্বালিয়েও দেয়। হ্যাঁ, এই নিয়ে দু'বার ফ্যাসিষ্টরা আবন্তি অফিসে আগুন ধরায়। অন্যান্য ফ্যাসিষ্টরা ওয়াকার্স চেম্বার ভাঙচুরের চেষ্টা করলেও মিলিটারী দিয়ে সেই আক্রমণ রুখে দেওয়া হয়।

ফ্যাসিষ্টদের আক্রমণের জন্য দলটা শহর ছেড়ে শহরতলীতে ঘাঁটি গাড়া কম্যুনিষ্ট এবং সোশ্যালিষ্টদের ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে। ছদ্মবেশী ফ্যাসিষ্টদের সশস্ত্র আক্রমণে ওরা ঘাঁটি ছেড়ে সাধারণ নাগরিকদের সঙ্গে মিশে যায়। রাজনৈতিক দলগুলোর ক্ষমতা বলতে কিছু ছিল না। তাই চারদিকের দাঙ্গা-হাঙ্গামা আর বিশৃঙ্খলা, কি করে বন্ধ করবে। ২৬ শে মার্চ তারিখে লামবার্ডির সমস্ত ফ্যাসিষ্টদের জমায়েত করে সুশৃঙ্খলভাবে মিলানের প্রধান প্রধান রাস্তা গুলো ধরে মার্চ পাষ্ট করাই। হ্যাঁ, ফ্যাসিষ্টদের শক্তি সাধারণ জনসাধারণকে দেখানোই এই মার্চ পাষ্টের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। শেযপর্যন্ত নাগরিকদের জীবন-দিগন্তে শৃঙ্খলা কিছুটা হলেও আনতে সমর্থ হই। জনসাধারণও নিরাপত্তা বোধ করে হাঁফ ছেড়ে বাঁচে। ভালো কাজ

করার উৎসাহটা যেন আবার ফিরে আসে। এই ফ্যাসিষ্টদের অনুপ্রেরণা ছিল ডায়নার শহীদ আর খুন হয়ে যাওয়া ফ্যাসিষ্টরা। ইতালির যুবকদের নির্দেশিত পথে রোমান লিটারিওর নামে জনগণের মধ্যে একত্রিত হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দেয়। এই যুবকরাই যুদ্ধ জিতেছে, আবার সত্যিকারের ভালো কাজের পুরস্কারও ওরাই একদিন পাবে—এই আশাতেই বুক বেঁধে ওরা কাজে নেমে পড়ে।

ডায়নাতে বীভৎসভাবে বোমা মেরে হত্যা করার প্রতিবাদে যে বিশাল শোক মিছিল বের হয় তা' নিকট-ভবিষ্যতে ভোলা সম্ভব নয়। সেইদিন থেকেই নাশকতামূলক শক্তিগুলোকে ধ্বংস করার কাজে ফ্যাসিষ্টদল আত্মনিয়োগ করে। তাদের বেড়াল-তাড়া করলে ওরা গর্তে ঢুকে পড়ে আত্মগোপন করে। কিছু লুকোয় ওয়াকার্স চেম্বারের কয়েকটা দুর্গে আর বাকীরা জেলার ক্লাবগুলোতে।

আমার দিনগুলো তখন অতি কর্ম ব্যস্ততায় কাটতো। পোপোলো দ্য ইতালিয়ার কাজ ছাড়াও প্রত্যেকদিন সকালে আমাকে রাজনৈতিক কর্মধারা সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে নির্দেশ দিতে হতো। শুধু শহর মিলানোর জন্যই নয়, ইতালির অন্যান্য মুখ্য শহরগুলোতেও যেখানে ফ্যাসিষ্টরা রাজনৈতিক ভাবে পা ফেলতে পেরেছে। ফ্যাসিষ্ট পার্টিকে আমি শক্ত হাতে পরিচালনা করি; অস্বীকার করার উপায় নেই যে এই সময় বেশ কিছু কড়া আদেশ আমি দিয়েছিলাম। বিভিন্ন প্রদেশ থেকে শহর মিলানে আসা আগতরা আমাদের প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধে যা কথাবার্তা বলতো, তারজন্য আমি সর্বদা আমার কান খোলা রাখতাম। শত্রুদের কার্যকলাপের ওপরেও তীক্ষ্ণ নজর থাকতো আমার। ফ্যাসিষ্টদের উদ্দেশ্যের প্রতি আমার স্বচ্ছতা ছিল সতত প্রবাহমান নদীর জলের মতো টলটলে, পরিষ্কার। আন্দোলনের প্রয়োজনে দলকে যতোটুকু স্বাধীনতা দেওয়ার প্রয়োজন, তা' দিতে আমি কখনো কার্পণ্য করি নি। ফ্যাসিজিমে বিশ্বাসের মতো পবিত্র এবং খাঁটি জিনিষে কখনো কোনরকম ভেজাল মেশানো তো দূরের কথা, চেষ্টাও করি নি। পুরনো জিনিষপত্র অর্থাৎ ব্যবসা, বিনিময় প্রথা, কোয়ালিশন, সংসদীয় বোঝাপড়া এবং ইতালির উদারতাবাদের হিপোক্র্যাসি দিয়ে ফ্যাসিজিমের জ্বলন্ত যৌবনকে এতোটুকু দাবিয়ে রাখার চেষ্টা করি নি। আমার জীবনের নিত্য সঙ্গী অনেক উত্থান-পতনের মধ্যে দিয়ে আমাকে যেতে হলেও আকাশে ওড়ার তীব্র বাসনাটাকে অবদমিত করতে পারি নি। সেই সময়ে নাটকীয়তার সুখ-দুঃখের অনেক মোচড় থাকলেও রোজ সকালে সাইকেলে চেপে যাতায়াতে আঠারো মাইল পথ ভেঙেছি স্রেফ উড়ান শেখার তাগিদে। এই বিষয়ে আমার শিক্ষক ছিল জিয়ুসিপে রাডিয়ালি। বলাবাহুল্য উঁচুদরের না হলেও মোটামুটি কিন্তু সাহসী বৈমানিক ছিল এই রাডিয়ালি। আমার তীব্র উড়ান শেখার আকাঙ্খা দেখে উৎসাহের সঙ্গে উড়ান বিষয়ক কঠিন ব্যাপারে শিক্ষা দিতো এই বৈমানিক।

একদিন সকালে রাডিয়ালির সঙ্গে বিমানে বসেছি। প্রথম উড়ানটা ভালোভাবেই কাটে। দ্বিতীয়বার উড়ানের সময় মোটরটা হঠাৎ কোন কারণে বন্ধ হয়ে যায়। ঠিক নেমে আসার জন্য তখন তোড়জোড় শুরু করেছি। একটা পাখার ওপর ভর দিয়ে কিছুটা নীচে নামলেও প্রায় চল্লিশ মিটার উঁচু থেকে বিমানটা আছড়ে মাটিতে পড়ে। পাইলটের কপালে অল্প চোট লাগে। আমার মাথায় লাগা আঘাত সারতে প্রায় দু'সপ্তাহ সময় নেয়। বিমান ক্ষেত্রেই

প্রাথমিক চিকিৎসার পর পোর্তচ ভেনিজিয়ার ওয়ারডিয়া মেডিকাতে ডাক্তার লিওনার্দো পালিরি বিস্তারিত চিকিৎসার ভার নেয়। যে ঘটনাটায় আমার জীবন সংশয় হ'তে পারতো, বন্ধু ডাক্তার আমব্রোজিয়ো বিন্দার যত্নে যেন বুঝতেই পারি নি যে এতো বড় একটা দুর্ঘটনা ঘটে গেছে।

যাইহোক এই ঘটনা থেকে বুঝতে পারি যে ইতালির জনগণের বিরাট একটা অংশ আমার ব্যাপার স্যাপার গুলোকে অনুসরণ করছে। প্রায় সারা দেশ জুড়েই আমার কার্যকলাপের সমর্থনে উষ্ণ সাড়া মেলে। কয়েকটা দিন বিশ্রামের পরে আমি আবার আমার নিত্য নৈমিত্তিক কাজকর্ম শুরু করি। বিশেষ করে পোপোলো দ্যা ইতালিয়ার। কারণ ততোদিনে আমি ভালো করে বুঝে গেছি যে আমার কার্যকলাপের প্রতি ইতালির জনসাধারণের অকুণ্ঠ শ্রদ্ধাও রয়েছে।

যেদিন ডায়নার হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়, পিয়োমেবিনোর সন্ত্রাসবাদীর দল মিলানে একজন আততায়ীকে পাঠায় আমাকে হত্যা করার জন্য। আততায়ী আমার বাড়িতে এসে বেল বাজিয়ে কেউ সাড়া দেওয়ার অপেক্ষা না করেই সোজা সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে আসে। লোকটা শুধু অপরিচিত-ই নয়, অদ্ভুত ধরনেরও বটে। আমার মেয়ে এড্ডা দরজা খুলতে যায়।

অপরিচিত লোকটা আমার খোঁজ করে। ওকে পোপোলো দ্যা ইতালিয়ার অফিসে যেতে বললেও লোকটা নীচে নেমে গিয়ে ফোরো বোনাপার্টের বিরাট পার্কে আমার জন্য অপেক্ষা করে। আমাকে আসতে দেখে প্রথমে দ্রুত পায়ে এগোলেও শেষে আস্তে হেঁটে এসে আদেশ দেওয়ার স্বরে আমাকে দাঁড়াতে বলে জিজ্ঞাসা করে যে আমি-ই প্রফেসার মুসোলিনি কিনা। আমি যখন উত্তর দেই,—হ্যাঁ। লোকটা বলে যে আমার সঙ্গে তার বিস্তারিত কিছু আলোচনার প্রয়োজন।

লোকটার অদ্ভুত ব্যবহার আর কুৎসিত কদাকার চাউনি দেখেই বুঝতে অসুবিধা হয় না যে এক বোকার পাল্লায় পড়েছি। লোকটার মুখের ওপরেই বলে দেই যে রাস্তায় দাঁড়িয়ে কারো সঙ্গে আমি আলাপ আলোচনা করি না। পোপোলো দ্য ইতালির অফিসে এলে আলোচনা হ'তে পারে। সত্যি কথা বলতে কি আধ ঘন্টা পরে লোকটা পোপোলো দ্য ইতালিয়ার অফিসে এসে হাজির হয়। পরিচিত হ'তে। আমি সঙ্গে সঙ্গে রাজী হই। ম্যাসি—সেই যুবক ছেলেটার জ্বলন্ত দৃষ্টি হঠাৎ আমার মনে পড়ে যায়। আমার সামনে আসার সঙ্গে সঙ্গে যুবকটি কেমন যেন জড়ো সড়ো হয়ে পড়ে। যুবকটি বলে যে সে আমার সঙ্গে কথাবার্তা বলতে চায়। ওর ব্যবহারটাই এতো অদ্ভুতরকমের ছিল যে ওকে আমি পরিষ্কার ভাবে বলতে বলি যে ও আমার কাছ থেকে ঠিক কি চায়।

কয়েক মুহূর্ত ইতস্তত করার পর যুবকটি বলে যে পিয়ামবিনো সন্ত্রাসবাদী দল শেষপর্যন্ত ওকেই বেছে নিয়েছে। হ্যাঁ, মুসোলিনিকে বেরেটা পিস্তল দিয়ে নৃশংসভাবে হত্যা করার জন্য। কিন্তু পরবর্তীতে ওর মনে এই কাজের ব্যাপারে দ্বিধা আসার জন্য সে সোজাসুজি আমার কাছে শুধু কথাবার্তাই বলতে চায় নি, যে অস্ত্র দিয়ে আমাকে হত্যা করবে—সেটাও আমার হাতে তুলে দিয়ে সহানুভূতি প্রার্থনা করে। আমি ওর কথা মন দিয়ে শুনলেও কোন কথা বলি না।

ওর হাত থেকে রিভালবারটা নিয়ে আমি পত্রিকার হেড ক্লার্ক তথা টেলিফোন অপারেটর সান্‌তা ইলিয়াকে ডেকে সেই অসুখী লোকটাকে ওর হাতে সঁপে দেই, যাতে ওর স্বপ্নভঙ্গের হতাশাটা কাটিয়ে উঠতে পারে। তারপর সান্‌তা ইলিয়াকে ওকে সঙ্গে নিয়ে ত্রিয়েস্থাতে গিয়ে ফ্যাসিষ্ট জুন্‌তার হাতে তুলে দিতে বলি। কিছুক্ষণ পরেই পুলিশ পিয়োমবিনোর সেই সন্ত্রাসবাদীকে গ্রেপ্তার করে। কি করে এত দ্রুত পুলিশ খবর পেলো সেটাই বিস্ময়ের ব্যাপার। মিলানের পুলিশের এই একটাই কাজ দেখেছি যাতে ওদের গোয়েন্দা বিভাগের প্রশংসা করতেই হয়। তবে ডায়নায় ডিনামাইট দিয়ে যারা ধ্বংসের কাজ চালিয়েছিল তাদের কিন্তু পরবর্তী দু'মাসের মধ্যেও হদিশ করতে পারে নি।

অনেকেই আমার মৃত্যুর পরে শোকসভায় উপস্থিত হওয়ার আকাঙ্ক্ষা জানালেও তাদের সেই আশা পূর্ণ হয় না। আসলে ঘৃণার চেয়ে অনেক শক্তিশালী হলো প্রেম ভালোবাসা। আমি সব সময়েই অনুভব করতাম যে মানুষ এবং ঘটনাবলীর ওপরেও সদা সর্বদা একটা শক্তি কাজ করছে।

জিয়োলিটি তৎকালীন সংসদীয় পরিস্থিতিতে অত্যন্ত অস্বস্তিকর অবস্থায় ছিল। ইতালির রাজনৈতিক দিগন্তে তখন একটা নক্ষত্র জ্বলজ্বল করছে; সেটা হলো ফ্যাসিজিম। কাউন্‌সিলের প্রেসিডেন্ট সুযোগ বুঝে এই অস্বস্তিকর অবস্থার হাত থেকে রেহাই পেতে মে মাসেই ভোট ডাকে।

সোশ্যালিষ্ট কম্যুনিজিমের বিরুদ্ধে জোট বাঁধা দলগুলো প্রাথমিক আলাপ আলোচনার পর স্থির করে যে ওরা একত্রিত হয়ে নির্বাচনে লড়বে। এবং এই একত্রিত দলগুলোকে বলা হবে ন্যাশানাল ব্লক।

এই ন্যাশানাল ব্লক বা একত্রিত সমস্ত দলগুলোর মধ্যে ফ্যাসিজিম-ই একমাত্র দল ছিল যা শুধু উৎসাহে ভরপুর ছিল না, অন্যদেরও বুঝিয়ে সুঝিয়ে স্বমতে আনতে সক্ষম ছিল। সমস্ত দলগুলোই কিন্তু চরিত্রগতভাবে রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক ব্যাপারে নাশকতা মূলক কাজকর্ম করে চলতো। সোশ্যালিষ্ট পার্টি প্রথম থেকেই কম্যুনিষ্ট পার্টি থেকে নিজেদের আলাদা করে রেখেছিল। কিন্তু পোপুলার পার্টি বরাবরই যাজকীয় ধর্মীয় চরিত্র মেনে চলেছে এবং একাই নির্বাচন ক্ষেত্রে নেমে পড়ে। ওরা পল্লী পুরোহিতদের ধর্মীয় দিকটাকে অবলম্বন করে রাজনৈতিক ফয়দা তুলতে সচেষ্ট হয়।

আমাদের দলের সত্যিকারের পারদর্শিতা বুঝতে আমি ইতালির বিভিন্ন প্রদেশ পরিভ্রমণ করতে শুরু করি। এপ্রিল মাসে বোলোনিয়াতে উপস্থিত হলে প্রচণ্ডরকমের সাদর অভ্যর্থনা লাভ করি। এখানে মনে রাখা প্রয়োজন যে বোলোনিয়া সোশ্যালিজিমের দুর্গবিশেষ আর সমগ্র পো উপত্যকার রাজনৈতিক ব্যারোমিটারও বটে। বোলোনিয়া বর্ণাঢ্য মিছিল মিটিংয়ের মাধ্যমে আমাকে শুধু অভ্যর্থনা-ই জানায় না, বিভিন্ন জামায়েতের বক্তৃতায় ইতালির পুন জাগরণের ব্যাপারটাকেও তুলে ধরে। হ্যাঁ, উজ্জ্বল ভাবে। আকুরসিয়ো রাজপ্রাসাদের নৃশংস ঘটনাগুলো তখনো সবার স্মৃতিতে জেগে রয়েছে। বরং দগদগে সেই স্মৃতি মানুষকে পথ খুঁজে নিতে বাধ্য করেছে। আর তাই সেই জনসাধারণের মধ্যে ফ্যাসিজিম চরম জনপ্রিয়তা পেয়েছিল এবং যুবকেরা মন, প্রাণ, আশা এবং বিশ্বাস সব একত্রিত করে আমার পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল।

বোলোনিয়া থেকে আমি যাই ফেরারে। এই শহরেও সোশ্যালিজিম বেশ শক্ত ঘাঁটি গেড়েছিল। এবং সেখানেও আমার জন্য শৌর্যের এক অবিস্মরণীয় প্রদর্শনী অপেক্ষা করছিল। কৃষিক্ষেত্রের মাঝখানে অতিসুন্দর এই শহর দু'টো। বোলোনিয়া আর ফেরারে। সেই দিনগুলোয় আমার যৌবনের উত্তাপ দিয়ে মানুষের শৌর্য-বীর্য, মানসিকতা, তাদের চিন্তাধারার গতি-প্রকৃতি এবং সেই অঞ্চলের শ্রমিকবর্গের স্পৃহা ইত্যাদির পরিমাপ করতে পারতাম। বুঝতে পারতাম যদিও তাদের চিন্তাধারার স্রোতটা মাঝখানের কোন জায়গায় হারিয়ে গেছে, তবে লাল দলের প্রচার কিন্তু ওদের সেই হঠাৎ হরিয়ে যাওয়া চিন্তার স্রোতকে এতোটুকু প্রভাবিত করতে পারে নি। ফল্গুস্রোতের মতো প্রবাহিত ওদের চিন্তাধারার প্রশংসয় করতে হয়। কারণ সেই স্রোত কিন্তু শত্রুর প্রচারের বিপক্ষে দুর্ভেদ্য প্রাচীরের মতো কাজ করে গেছে। হ্যাঁ, যেটাকে ইতালি জাতির সৌভাগ্য-ই বলা যেতে পারে।

যাইহোক এই নির্বাচনী যুদ্ধ চলে মাসখানেক ব্যাপি। সেই সময় আমি তিনটে বক্তিতা দিয়েছিলাম। একটা বোলোনিয়ায়, দ্বিতীয়টা ফেরারেতে আর তৃতয়টা মিলানের প্লেস বোরোমিয়তে। ১৯১৯ সালের রাজনৈতিক নির্বাচনের ঠিক বিপরীত ঘটনা ঘটে এবারে। শুধু মিলানেই নয়, বোলোনিয়া এবং ফেরারেতেও বিপুল জনগণ আনন্দ উচ্ছ্বাসে ফেটে পড়ে। হ্যাঁ, আমাদের কার্যাবলীর তারিফে। বলাবাহুল্য নির্বাচন ক্ষেত্রে এই ঘটনার দ্বারা ফ্যাসিজিম এক দীর্ঘ পদক্ষেপ ফেলতে সমর্থ হয়।

১৯১৯ সালের নবেম্বর মাসের নির্বাচনে আমি চার হাজারের বেশি ভোট পাই নি। কিন্তু ১৯২১ সালের নির্বাচনে এক লক্ষ আটাত্তর হাজার ভোট পেয়ে তালিকার শীর্ষদেশে আমার নাম জ্বল জ্বল করে। আমার এই নির্বাচনী জয়ে বন্ধু-বান্ধব, সহকর্মি এবং সহকারীদের মধ্যে আনন্দের বান বয়ে যায়। বিশ্বাসী সহ সম্পাদক জিউলানি, জিয়ানি, রোচা, মর্গানি প্রভৃতির কাছে ১৯১৯ সালের ঘটনার পরে বিমর্ষ এবং হৃতদ্যম সহকর্মীদের বলেছিলাম যে আগামী দু' বছরের মধ্যে আমি এই ঘটনার প্রতিশোধ নেবো। আমার সেই ভবিষ্যৎ-বাণী অক্ষরে অক্ষরে ফলে যায়। জনসাধারণ নতুন এক নৈতিক আবহাওয়ায় নিঃশ্বাস নিতে শুরু করে। ফ্যাসিষ্টরা খুব বেশি সংখ্যায় সংসদে যেতে না পারলেও স্বল্প কয়েকজনের দাপটে ইতালির সামনে নতুন এক দিগন্তের উন্মোচন হয়।

মন্টেসিটোরিও অর্থাৎ সংসদে ভবনে চেম্বারের আইন অনুযায়ী ফ্যাসিষ্টরা নিজস্ব দল গঠন করে। সংসদে ফ্যাসিষ্টরা দলে ছিল মাত্র পয়ত্রিশ জন। সংখ্যায় দলটা ছোট হলেও গঠিত হয়েছিল সাহসী এবং কুশলী সদস্যদের দ্বারা।

সোশ্যালিষ্ট দলের সদস্য সংখ্যা কিন্তু কম ছিল না। তবে সেই দলের মধ্যে একজন ছিল মিসিয়ানো। লোকটার বুদ্ধিশুদ্ধি বলতে কিছু ছিল না। যুদ্ধ ক্ষেত্র থেকে পালিয়ে আসা লোকটাকে সম্ভবত এই কারণেই তুরিন আর নেপলস্ জেলাগুলোর ডেপুটি হিসেবে নির্বাচিত করা হয়েছিল। সোশ্যালিষ্ট দলের মধ্যে মিসিয়ানোর ভাবমূর্তি কিন্তু তেমন বড় গোছের কিছু ছিল না। কারণ দল পরিচালনার ক্ষেত্রে নীতি, সংস্কৃতি বা ত্যাগ প্রভৃতি কোন কিছুতেই ওর অবদান বলতে কিছু ছিল না। সোজাসুজি লোকটাকে কাপুরুষ বলাটাই বোধহয় ঠিক হবে। শত্রুর ভয়ে ট্রেঞ্চ পালিয়ে আসা লোক। যুদ্ধ পালিয়ে আসা বলেই সম্ভবত যুদ্ধকে ঘৃণা করা সোশ্যালিষ্ট দল ওকে শান্তির জিগিরে সামনে তুলে ধরে। এই ঘৃণ্য

মানুষটা যুদ্ধে নিহত বা আহত, সাহসী সৈন্যদল অথবা যুদ্ধক্ষেত্রে পিতা হারানো অনাথ ছেলেমেয়েদের সামনে যেন মূর্তিমান একটা অপমান বিশেষ। এই ন্যাক্কারজনক অবস্থাটাকে কোন সভ্য সংস্কৃতি সম্পন্ন সংসদ-সদস্যই বোধহয় মেনে নিতে পারতো না। ফ্যাসিষ্টদের এমন ভাবে শিক্ষা দেওয়া হয়েছিল যাতে ওরা নেতার কথা অক্ষরে অক্ষরে পালন করে এবং তারজন্য যে কোনরকম পরিস্থিতির মুখোমুখি হওয়ার জন্য তৈরি থাকে। একদিন সহ্যের ক্ষমতার বাইরে গিয়ে মিসিয়ানোকে সংসদ-ভবনের দরজার বাইরে ছুঁড়ে দেয়। ওকে সংসদ ভবনের ভেতরে আর ঢুকতে দেওয়া উচিত হয় নি। এই বিষয়ে ফ্যাসিষ্ট দল যে শৌর্যের পরিচয় দিয়েছিল, তার তুলনা নেই। এটা কিন্তু ওদের ভুল নয়, পরিকল্পনার ছকের মধ্যেই ছিল। মন্টেসিটোরিওর বাতাস যেন নির্মল হয়ে ওঠে। আর সেই পরিষ্কার বাতাসে নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হয় না।

সেই অধিবেশনে আর কয়েকবার মাত্র বলেছিলাম। যতোদূর মনে আছে বার পাঁচেক হবে। তবে আমার সেই বক্তৃতাগুলোয় বাস্তবতাকেই তুলে ধরতে চেয়েছিলাম। হ্যাঁ, ইতালির জীবনধারার স্বার্থকে বড় করে দেখিয়েছিলাম। সংসদীয় অকিঞ্চিৎকর তর্ক-বিতর্কগুলোকে এবং সংসদীয় রাজনীতির টিনের তরোয়াল ঘোরানোর ব্যাপার-স্যাপার গুলোকে একপাশে ঠেলে ফেলে দিয়ে।

১৯২১ সালের ২১ শে জুন তারিখের বক্তৃতায় আমি জিয়োলিটি মন্ত্রীসভার বৈদেশিক নীতির কঠোর সমালোচনা করি। উত্তর ইতালির আপার এডিজে নিয়েও বাস্তব অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে প্রশ্ন তুলি। সরকারের দুর্বলতা এবং নতুন প্রদেশের দায়িত্বে অযোগ্য লোকগুলোর অক্ষমতাও বুঝিয়ে বলি। এদের মধ্যে একজন ক্রিয়েদেরো ঝুটা উদারপন্থী মতবাদের ত্রিকোণ ত্রিভুজে এবং রাজনৈতিক দিগ্‌দর্শনের কাঁটায় রীতিমতো ফেঁসে গিয়ে ত্রিশঙ্কু অবস্থায় ঝুলছে। সে সেই রাজমিস্ত্রীগুলোর কাজের দ্বারা এদিক ওদিক দেখে কোনরকমে জোড়াতালি দিয়ে বৈদেশিক এবং আন্তর্জাতিক চিন্তাধারাগুলোকে পার করে দিচ্ছে। যেহেতু জিয়োলিটি সরকার সমস্ত দেশের এবং ক্রিয়েদেরো আপার এডিজের দুর্দশার জন্য দায়ী, তাই এদের বিরুদ্ধে আমি ভোট দেই। ইতালির সংসদে ছদ্মবেশে বসা জার্মান ডেপুটিদের উদ্দেশ্যে আরো বলি যে আমরা বর্তমানে যে ব্রেনার পাস দখল করে বসে আছি, কোন মূল্যেই সেই ব্রেনার পাসের দখল ছাড়া হবে না। ফিউমে আর ডালমাটিয়াকেও আবার তুলে ধরি আমার বক্তৃতায়। স্কোরজার ঘৃণিত লজ্জাজনক বৈদেশিক নীতির জন্যই আমাদের দেশকে এমন চরম অপমানিত হ'তে হয়েছে এবং ইতালিকে ধ্বংসের পথে নিয়ে গেছে—তার উল্লেখ করতেও ভুলি না।

আমাদের অন্তর্দেশীয় রাজনীতি নিয়েও আমি আমার বক্তব্য রাখি। সোশ্যালিষ্ট এবং কম্যুনিষ্টদের একেবারে উলঙ্গ করে দিয়ে ফ্যাসিজিমের মুখোমুখি হ'তে বলি ওদের। ভাগ্যের পরিহাস-ই বলতে হবে যে অন্যান্য কম্যুনিষ্টদের মধ্যে ছিল গ্রাজিয়াদেই, যে অতীতে সোশ্যালিষ্ট সংস্কারক হিসেবে বরাবর আমার বিরোধিতা করে এসেছে। সত্যি বলতে কি আমি ওদের মুখোস খুলে দেওয়ার জন্য আরো বলি দলকে ক্ষমতায় বসাতে; ব্যক্তিগত লাভের জন্য ওরা একসময় নিজেদের থাবা সুবিধে মতো দলের মধ্যে ডুবিয়ে বসে থাকে।

বক্তৃতাগুলোর মূলত উদ্দেশ্য ছিল ফ্যাসিষ্ট হিসেবে আমাদের বিরোধিদের নীতিগুলোকে

ধূলিসাৎ করা। অবাক হয়ে দেখি বক্তৃতাগুলো অনেকের মনেই গভীর দাগ কেটেছে। সংসদ ছাড়িয়ে চারদিকেই আমার বক্তৃতার প্রতিধ্বনি ওঠে। শেষপর্যন্ত জিয়োলিটি সরকারের সর্বনাশ ডেকে আনে। এবং একদিন সেই জিয়োলিটি সরকার মূর্খ শিকার করা মাতাল পাখির মতো মুখ থুবড়ে পড়ে।

সংসদীয় এই যুদ্ধে কিন্তু আমি একা যোদ্ধা ছিলাম না। সমস্ত দল আমার পাশে দাঁড়িয়ে দক্ষতার সঙ্গে এবং ভীষণভাবে এই যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিল। ইতিমধ্যে ফ্যাসিষ্ট প্রদেশের ডেপুটি ফেডারজোনি জিয়োলিটি সরকারের বৈদেশিক মন্ত্রী কাউন্ট স্কোরজার সমস্ত কার্যকলাপের তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে পরীক্ষা-নিরিক্ষা করতে শুরু করে। বিশেষ করে আড্রিয়াটিক নীতিগুলোর। বলাবাহুল্য সংসদীয় ব্যাপারে এই পরীক্ষা-নিরিক্ষা এক নাটকীয়তার সৃষ্টি করে। ফ্যাসিজিমের আলো পড়তেই এই গোপন অথবা প্রকাশ্য চুক্তিগুলোয় অনেক খুঁত নজরে পড়ে। কারণ সংসদের সমস্ত চুক্তি সম্পর্কে জানার বা আলোচনা করার সম্পূর্ণ অধিকার রয়েছে।

সংসদের অনেক উত্থান-পতনের পর শেষপর্যন্ত জিয়েলিটি সরকারের পতন হয়। রঙ্গমঞ্চে সোশ্যালিষ্ট বেনামী ডেমোক্র্যাট হিসেবে উপস্থিত হয়ে নানারকম কূট সমালোচনাপূর্ণ যুক্তি তর্ক খাড়া করে। মানুষটা আপ্রাণ চেষ্টা করেছিল অন্তর্দেশীয় শান্তিবাদ সংস্থাপনের জন্য। ফ্যাসিষ্ট এবং সোশ্যালিষ্টদের মধ্যে একটা বোঝাপড়ার সেতু বাঁধারও চেষ্টা করে। ঠিক যে মুহূর্তে বেনামী রাজনৈতিক বোঝাপড়ার একটা বাতাবরণ তৈরিতে ব্যস্ত—ঠিক সেই সময় সারজানার বীভৎস হত্যাকাণ্ডের নৃশংস ঘটনাগুলোর খবরাখবর আসতে শুরু করে। প্রায় আঠারো জন ফ্যাসিষ্টকে খুন করা হয়। তারপরে আসে মোডেনার হত্যাকাণ্ড। যেখানে রয়ালগার্ডরা ফ্যাসিষ্ট মিছিলে গুলি ছোঁড়ে। দশজন ফ্যাসিষ্ট মারা যায়, প্রচুর সংখ্যায় আহত হয়। অন্তর্দেশীয় নীতি তখনো প্রতিষ্ঠিত হ'তে পারেনি। মৃদু আলোড়ন তুলেছে মাত্র। আমি কিন্তু নেতা, সাংবাদিক এবং রাজনীতিজ্ঞ হিসেবে আমার কাজ অক্লান্ত ভাবে করে চলেছি।

কয়েকটা ঘটনাপ্রবাহ নিয়ে সিসোটি স্কোজমের সঙ্গে আমাকে দ্বৈত সমরে অবতীর্ণ হ'তে হয়। সন্দেহ নেই যে সিসোটির সুদীর্ঘ হাত ইতালির রাজনৈতিক পটভূমিকা গড়তে যথেষ্ট সাহায্য করেছে। অনেক আক্রমণ ও প্রতি-আক্রমণের পরে ডাক্তাররা এই যুদ্ধ বন্ধ করে দেয়। কারণ সিসোটির হার্ট অ্যাটাক। এই দ্বৈত সমরের ঠিক আগে কয়েকটা সংসদীয় ব্যাপার নিয়ে মেজর বাসেজিওর সঙ্গেও কম বাগবিতণ্ডা হয় নি।

আমার মনে হয় তরবারী চালানোর ব্যাপারে আমার কিছুটা হলেও দক্ষতা ছিল; আর সেই সঙ্গে ছিল সাহস। যারজন্য যে কোন দ্বন্দ্ব যুদ্ধে সফল হ'তে পেরেছি। তবে চরিত্রে শিভাল্‌রী থাকার জন্য আত্মসম্মান এবং আভিজাত্যের সঙ্গে নিজেকে যথাসময়ে সরিয়ে নিতে পেরেছি।

শেষে ১৯২১ সালের নভেম্বর মাসে রোম শহরে সারা ইতালির ফ্যাসিষ্টদের এক মহাসম্মেলন ডাকি। কারণ ততোক্ষণে সেই মুহূর্ত এসে গেছে যখন চরিত্রগত ভাবে ফ্যাসিষ্ট আন্দোলনকে শুধু রাজনীতির শক্ত ভিতের ওপরেই দাঁড় করালে চলবে না, কেন্দ্র এবং স্থানীয় ফ্যাসিষ্ট দলগুলোকেও জোরদার করার প্রয়োজন হয়ে পড়ে।

প্রথমদিকে দাঙ্গা-হাঙ্গামার মাধ্যমে নিজেদের প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে সেই ব্যাপারে দলের ভিত্ পাকা হলেও বর্তমানে দলের সংগঠন ক্ষমতাকে বাড়ানোর প্রয়োজন হয়ে পড়ে। রোমের আগুসটুসের সমাধিক্ষেত্রে যে কনসার্ট হলটা গড়ে উঠেছে—সেখানেই এই সম্মেলনের ব্যবস্থা করা হয়। কারণ সেই সম্মেলনে দলের সংগঠন এবং ভবিষ্যত পরিকল্পনার ছক তৈরি করা হবে বলে।

সবদিক থেকেই স্মরণীয় এই সম্মেলন। মন থেকে অনেক ধন্যবাদ জানাই যারা ফ্যাসিজিমের আকর্ষণে এই সম্মেলনে জড়ো হয়েছিল। আর তারচেয়েও চিত্তাকর্ষক ছিল দ্রুত এবং গঠনমূলক আলোচনা সমূহ। এই ঘটনার দ্বারা ফ্যাসিজিমের কর্মশক্তি আর পৌরুষত্ব ইতালির জনগণের কাছে প্রমাণিত হয়। সেই জমায়েতে আমার রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণও সবার একছত্র প্রশংসা পায়। ইতালির সংগ্রামী যুবকরাও ততোদিনে তাদের মধ্যে পরিবর্তন এনে ফেলেছে। ওরা ফ্যাসিষ্ট ন্যাশানাল পার্টির কেন্দ্রীয় এবং সুপ্রিম কাউনসিলের নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করার জন্য তখন তৈরি। আর প্রত্যেক অঞ্চলে স্থানীয় ফ্যাসিষ্ট কার্যালয়ের প্রতিষ্ঠার কাজও ইতিমধ্যে পাকা হয়ে গেছে। এই অবসরে পার্টি থেকে ব্যক্তিগত চরিত্র এবং ইচ্ছাকে দূরে সরিয়ে দেই। প্রথম থেকে এইগুলো কিন্তু ইচ্ছানুযায়ী পার্টির সঙ্গে জড়িয়ে ছিল। কিন্তু আমি তখন মনস্থির করে ফেলেছি যে দলকে স্বশাসিত একটা চরিত্র দিতেই হবে। তবে দলের মধ্যে যতোই স্বশাসন দেবার চেষ্টা করি, ততোই বুঝতে পারি আমার সোজাসুজি নির্দেশ ছাড়া এই পার্টি জয়ী হয়ে বর্তমানে যেখানে এসে দাঁড়িয়েছে, সেখানে পৌঁছতেই পারতো না। প্রতিটি পদক্ষেপে দলের আমার নির্দেশ, উপদেশ এবং হৃদয়ের উত্তাপের প্রয়োজন।

রোমের এই সম্মেলন ফ্যাসিজিমের ভিত্তিভূমি কতোখানি দৃঢ় তা' সবার কাছে তুলে ধরে। কিন্তু আমার কাছে ব্যক্তিগত শক্তির প্রকাশও বটে এই সম্মেলন। তবে কিছু অবাঞ্ছনীয় ঘটনাও ঘটে। রোম শহরে কয়েকজন মারা যায়। রোমের শ্রমিকশ্রেণী আমাদের বিরোধিতাও কম করে না। তবে কংগ্রেস বা সম্মেলনের কাজকর্ম পুরোপুরি চুকিয়ে রোমের রাস্তায় রাস্তায় ফ্যাসিষ্টদের মিছিল বের হয়। এই মিছিলগুলো প্রায় প্রত্যেকের কাছে বিজ্ঞাপনের মতো কাজ করে যে ফ্যাসিষ্ট পার্টি তার পরিপূর্ণতা লাভ করেছে; এবং যে কোন সংগ্রামের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষা করার মতো ক্ষমতাও ফ্যাসিস্ট পার্টি বর্তমানে রাখে।

এই সমস্ত অসুবিধার মধ্যেও বোনোমী মন্ত্রীসভা শান্তিস্থাপনের আপ্রাণ চেষ্টা করে চলে। তবে সময় এবং ঘটনাপ্রবাহগুলো যে অন্ধকারময় ছিল তা'তে সন্দেহ নেই। ১৯২১ সালটা পার করা এতো সমস্যা-শংকুল এবং কষ্টসাধ্য ছিল যে সব রাজনৈতিক নেতাই এই পরিবেশ আর পরিস্থিতির মুখোমুখি হ'তে গিয়ে রীতিমতো কাঁপতে শুরু করতো। দূর থেকে দিগন্তে একটা আশার রূপোলী রেখা দেখা গেলেও ভারী মেঘের নীচে তা' তখন ঢাকা পড়ে গেছে।

তবে এই ধূসর বছরের শেষাশেষি উজ্বল এক মহা প্রভাত অপেক্ষা করছিল। অবশ্য অর্থনৈতিক দুঃখের ছায়াতে সেই প্রভাতের রশ্মি সারা ইতালিতেই তখন ঢাকা পড়ে গেছে। বান্কা ইতালিয়ানা ডি স্কোন্টোর ধ্বংস এই অর্থনৈতিক বিপর্যস্ত অবস্থাই ডেকে আনে। বিশেষ করে বান্কা ব্যাংকের পতনে দক্ষিণ ইতালির মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অবস্থা শোচনীয় হয়ে

ওঠে। কারণ মূলত ওরাই ওদের উপার্জনের সঞ্চিত সব অর্থ এই ব্যাংকে জমা রেখেছিল। যুদ্ধের সময় এই বিশাল ব্যাংকটা গড়ে উঠেছিল এবং সন্দেহ নেই যে অত্যন্ত পারদর্শিতার সঙ্গে এই প্রতিষ্ঠান অক্লান্তভাবে ইতালির জনগণের সেবা করে গেছে। কিন্তু যুদ্ধ শেষের বিরাট বোঝা বহন করার ক্ষমতা এই আর্থিক প্রতিষ্ঠানটার ছিল না। দক্ষিণ এবং আপার ইতালির বিরাট শ্রমিক সম্প্রদায়ের নিবিড় স্বার্থ জড়িত ছিল এই আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে। তারাও হুমড়ি খেয়ে একেবারে হাঁটু গেড়ে ভেঙে পড়ে। যুদ্ধ শেষের ইতালির অর্থনীতির বনিয়াদের এই অসন্তোষজনক পতন কি অজ্ঞতা, বোকামী, দোষ বা চিন্তাহীনতার জন্য? কে জানে।

সন্দেহ নেই আমাদের দেশকে গড়ে তোলার ক্ষমতা অন্যান্য বিদেশীদের তুলনায় একেবারে ধুলিসাৎ হয়ে যায়। তার সঙ্গে যোগ হয় অন্তর্দেশীয় অব্যবস্থা। পৃথিবীর চোখে আমাদের ধনী হওয়ার জন্য যে অর্থনৈতিক ব্যবস্থার প্রয়োজন—সেই ব্যবস্থার অপরিণামদর্শিতা স্পষ্ট হয়ে ধরা দেয়।

এই পতনোম্মুখ অর্থনৈতিক দুরবস্থা এবং তর্কের নামে চিৎকার চেঁচামেচি থেকে ফ্যাসিজিম নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখে। অতীতের মূল্যায়ন না করে ফ্যাসিষ্টরা সতর্কতার সঙ্গে ভবিষ্যত-জাতির অর্থনৈতিক পলিসি বা নীতি কি হওয়া উচিত তা' নিয়ে দূরদৃষ্টি এবং বিজ্ঞতার সঙ্গে চিন্তাভাবনা করতে শুরু করে।

জীবনে এই প্রথম জনসাধারণের অর্থনৈতিক বিশাল সমস্যার মুখোমুখি আমাকে হ'তে হয়।

আমার কাছে এটা একটা নতুন ধরনের এরোপ্লেন বিশেষ ছিল। তবে সেই বিমান ক্ষেত্রের ধারে পাশে কোন ইনসষ্ট্রাকটারকে খুঁজে পাই নি, যার সাহায্যে এই প্লেনটাকে আমি উড়াতে পারি।

।। ক্ষমতা জয়ের পথে ।।

অর্থের সঠিক ব্যবহার এবং ধনের সহজ প্রবাহ, জাতির ব্যাংকিং ব্যবস্থার উন্নতি—এই গুলোকে কোনরকমেই অবহেলা করা চলে না। বরং জাতি এবং দেশ গঠনে অর্থনৈতিক বিশৃঙ্খলা থেকে অর্থ ব্যবস্থাকে টেনে তোলাটা অত্যন্ত প্রয়োজন।

সশব্দে বিশাল অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান বান্‌কা ইতালিয়ানা ডি স্কোন্টোর ভেঙে পড়া প্রমাণ করে যে আমাদের অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় প্রচণ্ডরকমের গলদ ছিল। যুদ্ধের পরে জলের মতো ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে যায় যে অধিকাংশ ব্যাংক এবং শিল্প-প্রতিষ্ঠান-ই ভেতরে ভেতরে ফাঁপা অবস্থায় ছিল। কোনরকমে জোড়াতালি দিয়ে চালিয়ে যাচ্ছিলো। হয় এগুলো তুলে দেওয়ার প্রয়োজন, না হয় জোরদার অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলে তার সঙ্গে এই দুর্বল প্রতিষ্ঠানগুলোর একত্রিকরণের দরকার।

কিন্তু এই ব্যবস্থায় রুখে দাঁড়ায় একদল পুঁজিপতি। মধ্যবিত্তরা তুরীয় মনোভাব গ্রহণ করে। সঙ্গে সঙ্গে এটাও স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে আমাদের শিল্পপতিদের অর্থনৈতিক উন্নতির

প্রয়োজনে কোনরকম পরিকল্পনাই নেই। কিন্তু আমাদের দরকার শক্ত ধনতান্ত্রিক বনিয়াদ; কষ্টার্জিত অভিজ্ঞতা। আরো লক্ষ্য করি এই ঘটনার ঘূর্ণিচক্রে কে সঠিক এবং কারা ঠিক নিজেদের এই ঝড়ের মধ্যে রক্ষা করতে শেষপর্যন্ত সক্ষম হবে। হ্যাঁ, যখন ওদের ওপরে প্রচণ্ডরকমের চাপ আসবে।

অন্যান্য জাতিরা কিন্তু আমাদের এই অর্থনৈতিক ডামাডোলের ব্যাপারটা সাপের মতো ঠাণ্ডা দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করতে থাকে এবং আমাদের এই অন্ধকারাচ্ছন্ন অর্থনৈতিক ভবিষ্যতকে নিয়ে অবতারদের মতো বাণী দিতে সুরু করে। ইতালির সরকার তখন অর্থনৈতিক বিশৃঙ্খলার মধ্যে দিশাহারা। এই পরিস্থিতিতে ঠিক কি করা উচিত ভেবে না পেয়ে দেদার টাকা ছাপতে শুরু করে। আর পরিস্থিতি এমনিতেই তো খারাপ ছিল। সেই খারাপ পরিস্থিতি দেদার টাকা ছাপার দৌলতে আরো ঘোরালো এবং শোচনীয় হয়ে দাঁড়ায়।

১৯২২ সালের জানুয়ারী মাসে যৌথ শক্তিবর্গের সম্মেলন হয় দক্ষিণ ফ্রান্সের কান্‌সে। সন্দেহ নেই ভোজ উৎসবটা দারুণ জমেছিল। সঙ্গে ফ্রান্সের বিখ্যাত অতিথিপরায়ণতা তো ভোজ উৎসবটাকে আরো জমিয়ে দিয়েছিল। পোপোলো দ্য ইতালিয়ার রিপোর্ট লেখার জন্য আমিও সেখানে গিয়েছিলাম। এই উৎসব সাময়িক হলেও জনগণের চিন্তাভাবনার থেকে আমার মনকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যায়। যারজন্য ঘরের অবিরত খচ খচ করা কাঁটাগুলোর হাত থেকে রেহাই পেয়ে আন্তর্জাতিক সমস্যার চারিত্রিক দিকটার প্রতি নজর দিতে সক্ষম হই।

কান্‌সে যাওয়ার আমার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল দায়িত্ব সম্পন্ন বিখ্যাত নেতাদের সাক্ষাৎকার নেওয়া। বিভিন্ন রকমের আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে ইতালির জনগণের চিন্তাধারা ঠিক কি ছাপ ফেলেছে—সেটার প্রতি-ই আমার নজর ছিল। জেনোয়ার সম্মেলনেই কান্‌সে পরবর্তী সম্মেলন করার প্রস্তাব উঠেছিল। ইতালির উচিত ছিল ততোদিনে নিজের নীতি ঠিক করার। আর সেই নীতি এমন হওয়া উচিত ছিল যা আমাদের ঐতিহাসিক এবং রাজনৈতিক প্রয়োজনগুলোর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করতো না।

এই সমস্ত চিন্তাভাবনা করেই আমি কান্‌সে যাওয়ার উদ্যোগ নেই। প্রয়োজনীয় খরচ পত্তরের জন্য আমি দশ হাজার লিরে জোগাড় করি। আমার ভাই আরনাল্‌ডো সেগুলোর বদলে ফরাসী দেশের মুদ্রা পাঁচ হাজার দু'শো ফ্রাঁ নিয়ে আসে। যদিও বিদেশী মুদ্রার সমস্ত রীতিনীতি আমি কঠোরভাবে মেনেছিলাম, তবে এই ছোট্ট অভিজ্ঞতাটাই আমার মনে দীর্ঘস্থায়ী ছাপ ফেলেছিল। আমার সমস্ত দৃষ্টিকোণ যেন এই একটা ব্যাপারেই খুলে যায়। ইতালির মুদ্রামান ফ্রান্সের তুলনায় প্রায় অর্ধেক। সন্দেহ নেই যে ব্যাপারটা কবরে যাওয়ার মতো সাংঘাতিক। অপমানকরও বটে। একটা বিজয়ী জাতির পক্ষে এর থেকে লজ্জাস্কর ব্যাপার আর কি হ'তে পারে। অর্থাৎ আমরা দেউলিয়ার দিকে দ্রুত এগিয়ে চলেছি। এবং এই অবস্থা থেকে ফ্যাসিজিমের মাধ্যমেই দেশকে টেনে ওপরে তুলতে হবে। আমাদের পক্ষে এটা একটা সুবর্ণ সুযোগও বটে। এই অবস্থা কাটাতে দেশের সরকার, কোন রাজনৈতিক দল বা পার্লামেন্ট মরীয়া হয়ে কোন ব্যবস্থাই নেয় নি। দানবীয় মুদ্রাস্ফীতির দরুণ এবং অনেকেই এই অস্থির কৃত্রিম ব্যাপারটাকেই আমাদের উন্নতি বলে মনে করেছে।

কান্‌সের সম্মেলন কিন্তু তেমন কিছু গুরুত্ব পায় নি। জেনোয়া সম্মেলনের নান্দীমুখ বলা

চলে। পরিবেশটাই বে-মানান এবং বেঢপ ছিল। আন্তর্জাতিক জমায়েতগুলো অবশ্য একের পর এক নিয়ম মাফিক হয়ে চলে। পুরো ব্যাপারটাই যে ক্লান্তিকর ছিল তা'তে সন্দেহ নেই। আর কান্‌সে প্রচুর সংখ্যায় যে রিসর্টগুলো রয়েছে, তা'তে চিত্ত বিনোদনের পক্ষে জায়গাটা আদর্শ। সম্মেলনগুলো গুরুত্ব হারিয়ে পত্র-পত্রিকার হাসির খোরাক হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু কান্‌স প্রবাসের দিনগুলো ব্যক্তিগতভাবে আমাকে ঘটনা প্রবাহগুলোর মূলে গিয়ে বিচার বিশ্লেষণের সুযোগ দেয় এবং সেই বিচার বিশ্লেষণের উপসংহারও টানতে পারি।

কান্‌স সম্মেলন চলাকালীন হঠাৎ ফ্রান্সের মন্ত্রীসভায় জটিলতা দেখা দেয়। সম্মেলন শুরুর দিকে মন্ত্রী ব্রিয়াঁদের সাক্ষাৎকার নিয়েছিলাম। চেম্বার অফ ডেপুটিদের ভোটের অপেক্ষা না রেখেই ব্রিয়ান্দ পদত্যাগ করে মন্ত্রীসভার থেকে। ১৯২২ সালের ১৪ই জানুয়ারীর একটা প্রবন্ধে আমি আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির মধ্যে তীক্ষ্ণ মত পার্থক্যের কথা লিখেছিলাম। সেই প্রবন্ধের উপসংহার টেনেছিলাম ঃ অসংখ্য অমীমাংসিত সমস্যার স্তূপ, প্রশ্ন আর পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বিতা ইত্যাদি যেন অসীমে গিয়ে পৌঁছায়। ফরাসী দেশের জটিলতা সম্পর্কে জ্ঞান আহরণটাকে আমি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় শিক্ষা বলে মনে করি। সাধারণ জনগণ যারা নৈতিক এবং অর্থনৈতিক দিক থেকে বিপর্যস্ত, তাদের হৃদয়ের গভীরে গিয়ে এই শিক্ষা সমূলে টান দেবে। এইসব তথাকথিত ভদ্রলোকদের হয় চেতনা নেই, নয়তো ক্ষমতাবিহীন শিথিল প্রকৃতির মানুষ ওরা। শান্তিস্থাপনের হয় ইচ্ছে নেই, নয়তো বা অক্ষম। এই চেতনা বা অর্থনৈতিক দুরবস্থা থেকে ইউরোপকে টেনে তোলা না গেলে নিশ্চিত ইউরোপ এই অযোগ্য লোকগুলোর হাতে পড়ে টুক্‌রো টুক্‌রো হয়ে নিছক একটা উপনিবেশে পরিণত হবে। অপর দুটো মহাদেশ কিন্তু ইতিহাসের দিগন্ত বেয়ে ইতিমধ্যে অনেক উঁচুতে উঠে গেছে। ইউরোপের দিগন্তে ঝুলে থাকা এই দুরবস্থার ছবিটার সঙ্গে আমাদের দেশের অন্তর্দেশীয় সমস্যাগুলো মিলে মিশে আমাকে আরো পীড়িত করে তোলে।

দুই ইতালির তরফ থেকেই সাংবাদিক, রাজনীতিবিদ এবং ডেপুটি হিসেবে মুখপাত্রের কাজ চালিয়ে যাই। বলাবাহুল্য ইতালির জনগণের মধ্যে ফারাকটা তখন অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমার মনে হয় একদল গোলামী থেকে মুক্ত। যারা অভিজাত, গর্বিত, দেশের প্রতি বিশ্বস্ত এবং রক্তাক্ত যুদ্ধে বিজয়ীদের উপাসক। তারা ঠিক ব্যাপারে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারে এবং ইতালির মহৎ ব্যক্তিদের অনুগামী। অপরদিকে আরো এক ইতালি বর্তমান—যাদের আভিজাত্য, পরম্পরা. প্রভৃতিতে এতোটুকুও পরোয়া নেই। সম্ভবত ব্যাপারটা বোঝে না বা বুঝতে চায় না। গোলামী মনোবৃত্তি সমার্থক এই ইতালির জনগণের অংশ শুধু শীতল-ই নয়, একগুঁয়েও বটে। আভিজাত্যহীন এই মানুষগুলো বীরের মতো দেশের জন্য প্রাণ দিতেও কুণ্ঠিত।

হাজার ক্লেশ এবং অসংখ্য সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে কিন্তু এই দু'ই ইতালি-ই এক অপরিবর্তনীয় গন্তব্যস্থলের দিকে এগিয়ে গেছে। মুখোমুখি এই সংঘর্ষ কখনো বা রূপ নিয়েছে রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের—যার শেষ হয়েছে ফ্যাসিষ্ট এবং তার শত্রুদের শত্রুতার মাধ্যমে। এই দুই পরস্পর বিপরীত মেরুর চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করার জন্য কয়েকটা প্রতিরূপ ঘটনাকে বেছে নেওয়া যাক।

উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে পিস্‌টোইয়ার ঘটনাটা। সাহসী লেফ্‌টেনান্ট

ফেডেরিকো ফ্লোরিও যে শুধু অসম সাহসের সঙ্গে যুদ্ধ-ই করে নি, ফিউমে ডি আনুনজিয়োর সঙ্গীও ছিল। তাকে নিঃসঙ্গ সন্ত্রাসবাদী ক্যাফিরিও লুকাসী নৃশংসভাবে হত্যা করে। একজন বীর্যশৌর্যময় পুরুষকে মাটিতে পেড়ে ফেলে নিতান্তই একটা কাপুরুষ। এই অন্যায় অপরাধগুলোই ফ্যাসিষ্টদের হৃদয়ে প্রতিহিংসার আগুন জ্বালিয়ে দেয়। আমাদের সেই শহীদের শেষ কথাগুলো ছিল সরল কিন্তু হৃদয় বিদারক ঃ আমি অত্যন্ত দুঃখিত যে দেশের জন্য আর কিছু করা আমার পক্ষে সম্ভব হবে না।

না। ধৈর্য ধরা অসম্ভব। আর আমি ভেতরে ভেতরে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ি যে এই ধরনের প্রাণের উৎসর্গতা শুধু ফ্যাসিষ্টদের পরস্পরকে কাছেই টানবে না, দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হ'তেও সাহায্য করবে।

নিরেট জমাট বাঁধা সিমেন্ট—আমি এই এই নামেই আমার পত্রিকাতে একটা প্রবন্ধ লিখি। এইসব ঘটনা ফ্যাসিষ্টদের শক্ত বাঁধনে বাঁধে। সেই বাঁধন যেমন শক্ত, তেমনি পবিত্রও বটে। মৃতদের সঙ্গে আমরা এই বন্ধনেই বাঁধা। সংখ্যায় তারা শ'য়ে শ'য়ে। যুবক, বয়স্ক সবাই তাদের মধ্যে রয়েছে। ইতালির ইতিহাসে এমন কোন দল নেই বা আন্দোলন হয় নি যার সঙ্গে ফ্যাসিজিমের তুলনা করা যেতে পারে। এমন কোন আদর্শ নেই, হ্যাঁ, ফ্যাসিষ্টের মতো—যার পেছনে এতো যৌবনের রক্ত এবং আত্মত্যাগ রয়েছে।

ফ্যাসিজিম যদি একটা দৃঢ় বিশ্বাস না হয়, তবে কেন এবং কিভাবে এই লিজিয়েনদের মধ্যে এতো বৈরাগ্য, দুঃখ-কষ্ট সহ্য করার ক্ষমতা এবং সাহস এলো। একমাত্র বিশ্বাস; হ্যাঁ যে বিশ্বাস সর্বোচ্যতায় গিয়ে ঠেকেছে—সেই বিশ্বাসীদের মুখ থেকেই ফেডেরিকো ফ্লোরার মতো কথাগুলো বের হয়। নৃশংস অত্যাচারে যখন তার দেহ শুধু রক্তশূন্য-ই নয়, বিবর্ণ বাদামী হয়ে গেছে। ফ্লোরার এই কথাগুলোই হলো দলিল, বাইবেলের পবিত্র বাক্যবিশেষ। সহজ সরল শুনতে হলেও বাইবেলের নীতিপূর্ণ একটা অধ্যায় যেন কথাগুলো।

ইতালির সমস্ত ফ্যাসিষ্টরা নীরবে এই কথাগুলো যে শুধু গ্রহণ করবে তাই নয়, ধ্যানমগ্নও হবে কথাগুলোর চিন্তায়। তাদের এগিয়ে নিয়ে যাবে আগামীর দিকে। স্থির লক্ষ্যে পৌছবার ব্যাপারে ওরা থাকবে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, অচঞ্চল। কোন বাধাই তাদের বাধা দিতে পারবে না।

সেই মৃতের হৃদয় থেকে উৎসারিত বাণী-ই হলো আমাদের কাছে আদেশ। শহীদের হৃদয় থেকে যা উচ্চারিত। সেই কথাগুলো শুধু পবিত্র-ই নয়। মানুষকে তা' অক্ষয় লক্ষ্যে পৌছে দেয়।

ফ্যাসিষ্টদের সম্মেলন, মিছিল, দেশপ্রেম প্রভৃতি প্রত্যেকটি সৎ কাজের পেছনের প্রেরণা হলো এই শহীদের দল। ফ্যাসিষ্ট আদর্শের অদৃশ্য নাইট ওরা। অদৃশ্য থাকলেও আমরা যখন প্রেরণার জন্য ওদের আহ্বান করতাম, প্রত্যেকে যেন সাড়া দিতো আমাদের সেই ডাকে। প্রত্যেক নাম উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে আমরা শুনতে পেতাম—উপস্থিত। এটা সহজ সরল একটা পারলৌকিক ক্রিয়া। কিন্তু মূল্যবোধ এবং শ্রদ্ধায় জড়ানো।

বিপরীতপন্থী দু'টো পরস্পর বিরোধী রাজনৈতিক ধারা বিশেষ করে দু'ই সিনেটার ক্রিয়েদারো আর সালতার কার্যকলাপে পরিষ্কার হয়ে ফুটে ওঠে। যারা সীমান্ত প্রদেশে সরকারের তরফ থেকে হাই কমিশনার হিসেবে কাজ করছিল। ওরা যারা ইতালিয়ান নয়,

তাদের কাছে সব সময় কুণ্ঠার সঙ্গে ক্ষমা ভিক্ষা করতো ওদের শরীরে ইত্যালির রক্ত প্রবাহিত বলে। সীমান্ত প্রদেশের জার্মান ভাষা-ভাষীদের কোন কার্যকলাপকেই এই দু'জন সিনেটার দোষের চোখে দেখতো না। ধীরে ধীরে এই দাসত্ব এবং কাপুরুষ মনোবৃত্তির জন্য রক্ত ঢেলে দেওয়া বীরদের গর্ব শুধু ক্ষুণ্ণ-ই হয় না, আমরা আমাদের ন্যায্য দাবীগুলোও আদায় করতে পারি না। ১৯২১ সালের জুনমাসে পার্লামেন্টের সব সদস্যের উপস্থিতিতে আমি ক্রিয়েদারো আর সালতার কাজকর্মের চরম নিন্দা করি। কিন্তু সিনেটার দু'জন তাদের ধ্বংসমূলক কাজকর্ম চালিয়ে-ই যায়। ফ্যাসিষ্টদল ওদের এই জঘন্য কাপুরুষচিত কাজকর্মের রীতিমতো প্রমাণও দাখিল করে পার্লামেন্টে। ওরা এই দুই গভর্নরের বিরুদ্ধে নিন্দায় সোচ্চার হয়ে ওঠে। ১৯২২ সালের ১৭ই জানুয়ারী, ফ্যাসিষ্টরা নতুন প্রদেশগুলোর সেন্ট্রাল অফিস বন্ধ করে দেওয়ার দাবী জানায়। এই ব্যাপার নিয়ে ফ্যাসিষ্টদের সম্মেলন হয়েছিল ত্রিয়স্তে। তবে কিছুদিনের মধ্যে কিন্তু সেই কম্বুকণ্ঠের দাবী নিজের পথ খুঁজে নেয়। সত্যি বলতে কি এই সিনেটার দু'জনকে ডেকে পাঠিয়ে সরকার অন্য দু'জনকে সেই প্রদেশগুলোর হাই কমিশনার নিযুক্ত করে। কিন্তু নব নিযুক্ত হাই কমিশনারের ভুল ত্রুটিও বেশ কিছু সময় ধরে ইতালিকে উদ্বিগ্ন করে রাখে। কালো সার্টের দল কিন্তু সম্পূর্ণ অন্য স্রোতে সীমান্ত প্রদেশের ব্যাপার স্যাপারগুলোকে ঘুরিয়ে দিতে পারতো। ব্রিনার এবং নেভোসের দেওয়া বাঁধা সময়ের মধ্যে।

সেই তিক্ত তর্ক-বিতর্ক, ঝগড়াঝাঁটির দিনগুলোয় যখন ইউরোপের আকাশ মুহুর্মুহু বজ্রপাতের শব্দে মুখর, পঞ্চাদশ পন্টিফ বেনেডিক্‌ট, জিয়োকোমো ডেলা চেসিয়া যে জেনোয়ার অত্যন্ত অভিজাত পরিবার থেকে এসেছিল, তার মৃত্যু হয়। ১৯২২ সালের ২২শে জানুয়ারী। সেই যুদ্ধের টালমাটালের সময় শক্ত হাতে সে গীর্জাকে শাসনে রেখেছিল। হ্যাঁ, দশম পিউসের পরে। এখানে বলা বোধহয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে ভেনিসের দশম পিউস অত্যন্ত দয়ালু হৃদয়সম্পন্ন ছিল। যাইহোক জিয়োকোমা কিন্তু সেই সময় আধুনিকতার নামে তুচ্ছ রাজনৈতিক এবং ধর্মীয় ব্যাপারগুলোর ওপরে জোরদার আক্রমণ চালিয়েছিল।

তবু পঞ্চদশ বেনেডিক্‌ট কিন্তু আমাদের কাছে সুখকর কোন স্মৃতি রেখে যেতে পারে নি। চেষ্টা করেও ১৯১৭ সালের স্মৃতিকে বিস্মৃতির গর্ভে নিয়ে যাওয়া যায় নি। জনগণ যখন দুঃখ-কষ্টের ব্যূহ ছিন্ন ভিন্ন করে বেরিয়ে আসায় সচেষ্ট, তখনই রাশিয়ায় জারের পতন হয় এবং পূব সীমান্তে সৈন্যদের বিদ্রোহ করে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ার জন্য রাশিয়ার বিপ্লবও মুখ থুবড়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ে। পন্টিফের হতাশা জড়ানো স্বরে যুদ্ধ সম্পর্কে বক্তব্য ছিল—অপ্রয়োজনীয় নরহত্যা। যারা একটা বিশ্বাসে বিশ্বাসী হয়ে নিজেদের প্রাণ উৎসর্গ দিয়ে চলেছে, সেই সময়ে এই উক্তি তাদের মনে প্রচণ্ড রকমের আঘাত হানে। বিশেষ করে যাদের কাছে এই যুদ্ধ ইতিহাসের শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে ঘটে যাওয়া অন্যায়গুলোর শিকড় সুদ্ধ উপড়ে ফেলবে। যার অস্তিত্ব এতো গভীরে যে অন্য কোন উপায়েই সমূলে তা' উৎপাটিত করা সম্ভব নয়। তা' ছাড়া এই যুদ্ধকে তো আমরাই সাদরে ডেকে এনেছি। ক্যাথলিক গীর্জা নিজেদের প্রয়োজন ছাড়া যুদ্ধকে কখনো সমর্থন জানায় নি। পোপের এই দ্ব্যর্থক কাজকর্ম সত্ত্বেও কিছু হিংসুটে লোকজন আছে যারা চিন্তা এবং কর্মের ব্যাপারে ইতিমধ্যেই দেউলিয়া

খাতায় নাম লিখিয়েছে; ইতিহাসের প্রতিফল সম্পর্কেও অন্ধ। তারাই লাভের অংশ তাদের দিকে বেশি পরিমাণে টানার জন্য ক্রমাগত চেষ্টা চালিয়ে যায়।

কিন্তু এই ধরনের মনোবৃত্তি এবং তার বহিঃপ্রকাশ ইতালিয়ানদের কাছে অন্য রকমের মূল্য বোধ তুলে ধরে। যা সম্পূর্ণ ভিন্ন স্বাদের। এর দ্বারাই বোঝা যায় ইতালি কি ধরনের অস্বাভাবিক একটা অবস্থার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছিলো। অর্থাৎ রোমে পন্টিফ যখন এইসব ফতেয়া দিয়ে চলেছে—জনগণ তখন রক্তক্ষয়ী সংগ্রামে রত। সেইজন্য পঞ্চদশ বেনোডিক্টের মৃত্যু এবং তার উত্তরাধিকারের ব্যাপারটা সেই মুহূর্তে ভবিষ্যতের প্রেক্ষাপটে নিতান্ত জরুরী হয়ে পড়ে।

আমাদের দেশে একটা প্রবাদ আছে যে খুব জটিল কোন ব্যাপারকে সহজ সরল এবং সোজা ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব। কথাটা হলো—যখন পোপ মৃত, আরেকজনকে তার সিংহাসনে বসিয়ে দিলেই তো সব সমস্যার সমাধান। ব্যাপারটা এতো সহুজ আর সোজা যে কোন মত প্রকাশের অবকাশই এখানে নেই। তবে সেন্ট পিটারের সিংহাসনে বসে অ্যাপোথলিসের যুবরাজ হয়ে পৃথিবীকে যীশুখৃষ্টের পবিত্রবাণী শোনানো আর নির্বাচিত পরিষদে আলোচনার শেষে উপসংহার টানার ব্যাপারটা মোটেই এক নয়। বর্তমানে ইতালিতে চার্চ আর সরকারের মধ্যে এমন একটা সম্পর্ক গড়ে উঠেছে যে তাকে কি ভাবে মূল্য দেওয়া যেতে পারে; তা'ছাড়া পোপ নির্বাচনের জন্য প্রধান ধর্মযাজকদের যে গুপ্তসভা অনুষ্ঠিত হয়, তার ফলাফল জানার জন্য সবাই যে উদ্‌গ্রীব থাকবে তা'তে আর সন্দেহ কি। সারা পৃথিবীর ক্যাথলিকদের নজর পড়ে রোমের দিকে। ইউরোপের প্রত্যেকটি বিচারালয়ের মধ্যে তিক্ততার আলোড়ন ওঠে; গোপনে স্পর্শকাতর জায়গাগুলোতে প্রভাব বিস্তারের কাজ চলে। পরস্পর পরস্পরকে দাবিয়ে রাখারও চেষ্টা করে।

সারা পৃথিবীর কূটনৈতিক কর্মচারীবৃন্দ আর দর্শকরা তো ব্যাপার স্যাপার দেখে হতভম্ব। সেন্ট পিটার চার্চের প্রাঙ্গণে নির্বাচনের সময় সমস্ত রোম-ই যেন ভীড় করে দাঁড়ায়।

ইতিমধ্যে পঞ্চদশ বেনেডিক্টরের কার্যকলাপের রেশ কতোটা রাজনীতিতে পড়তে পারে তাই নিয়ে তুমুল বিতর্ক বেঁধে যায়। তার উত্তরাধিকারীকে নিয়ে অনেক ভবিষ্যত বাণী-ই হ'তে শুরু করে। সাংবাদিকরা এই বিষয় নিয়ে এতো মেতে ওঠে যে থামার কোন লক্ষ্মণ-ই দেখা যায় না। যারজন্য অনেক গভীর সমস্যার সমাধানের ব্যাপারে ভাসা ভাসা চেষ্টা করা হয় মাত্র।

যাইহোক বোনোমী মন্ত্রীসভার পতনের কারণ যেমন অন্তর্দেশীয় ব্যর্থ রাজনীতির ফল, তেমনি বান্‌কা ইতালিয়ানা ডি স্কোন্টোর পতন হয়েছিল জাতীয় পার্লামেন্টে পোপ পঞ্চদশ বেনেডিক্টাকে নিয়ে উৎসব করার জন্য।

আমি বরাবর ফ্যাসিষ্টদের বুঝিয়ে এসেছি যে পোপকে সবসময় ইতালির আভিজাত্যের প্রতীক এবং ধর্মীয় আদর্শকে জীবনের প্রথম সারিতে বসানো উচিত। তাই গীর্জার বিরুদ্ধে যে কোন সমালোচনাকেই আমি নিন্দা করে এসেছি। আর এই ধরনের প্রচেষ্টা শুধু আমাদের নৈতিক দিক থেকে নীচে টেনে নামায় নি, ইতালিয়ানদের ধর্মীয় দিক থেকে রকমারী চিন্তাধারা এসে বিপর্যস্তও করেছে। আর আমাদের শুধু দুর্নীতিগ্রস্ত-ই করে নি, পাপীও করেছে। অ্যাংলো স্যাক্সান দেশগুলো কিন্তু এই পাপ থেকে মুক্ত।

আমি বরাবর ইতালিতে সরকার এবং চার্চের মধ্যের এই টানাপোড়ানের সম্পর্কটাকে সর্বসমক্ষে তুলে ধরতে চেয়েছি, যাতে এর দ্বারা পরস্পরের বোঝাপড়ার মাধ্যমে শান্ত স্থিতাবস্থা ফিরে আসে এবং ইতালির জনগণ ধর্মীয় বিশ্বাস আর দৈনন্দিন জীবনের মধ্যে একটা ছন্দ এবং আনন্দ খুঁজে পায়।

আমার এই ধর্মীয় নীতিকে কিন্তু ফ্যাসিষ্ট অর্থাৎ ইতালির বুদ্ধিজীবির দল অনুসরণ করে। আর যুদ্ধ হলো তারই প্রতিফল। যদিও ইতালির এই ধর্মীয় রাজমিস্ত্রীর দল এই যুদ্ধের প্রতিরোধ করার কম চেষ্টা করে নি। তবে ইতালির এই রাজমিস্ত্রীদের তো সবাই চিনতো। ইতালির শক্ত ভিতের জন্য এই যুদ্ধের প্রয়োজন অনস্বীকার্য এবং ফ্যাসিষ্টরা একযোগে এই যুদ্ধে শেষ রক্তবিন্দু পর্যন্ত দিতে দায়বদ্ধ ছিল।

আমাদের ভুলে যাওয়া উচিত নয় যে ইতালির এই তথাকথিত রাজমিস্ত্রীর দল সব সময় ভাঙার কাজেই নিজেদের নিযুক্ত রেখেছে; গড়ার নয়। আর ওদের সেই কাজকর্ম শুধু রাজনৈতিক জগত ঘিরেই থাকে নি, ধর্মীয় জগতও ওদের সেই কালো হাতের ছায়া এড়াতে পারে নি। এই রাজমিস্ত্রীরা তাদের সমস্ত শক্তি নিয়োগ করেছে পোপ সম্পর্কীয় যাবতীয় কাজকর্মের বিরুদ্ধে। এবং এখানে বলা বোধহয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে এই বিরোধিতা সত্যিকারের কোন আদর্শের ব্যাপারে হয় নি। এই গোপন রাজমিস্ত্রীর দল কিন্তু পরস্পরের আঁতাতের মাধ্যমে স্বজন পোষণ, দুর্নীতি ইত্যাদি কোন বিষয়ের গভীরেই যায় নি। ১৮৭০ সাল থেকে গঠিত হওয়া লিবারেল গভর্নমেন্টের দুর্বলতাগুলোকে জনসমক্ষে সরবে তুলে ধরে টেবিলের নীচে হাত পেতে নিজেদের পাওনা গণ্ডা কড়ায় ক্রান্তিতে বুঝে নিয়েছে। আর এই লিবারেল গভর্নমেন্ট তো ছিল পুরোপুরি আমলা নির্ভর। বিচার ব্যবস্থা, শিক্ষা এবং সৈন্যবিভাগও ছিল আমলাদের অধীন। যাতে ওরা জাতির সর্বাপেক্ষা মূল্যবান অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলোকে নিজেদের তাঁবে রাখতে পরে। সমগ্র বিংশ শতাব্দী ধরে ওদের এই লুকানো চরিত্র, রহস্যময় সম্মেলন ইত্যাদি চমৎকার সূর্যরশ্মির নীচে পরস্পরের ভালোবাসায় বেড়ে ওঠা আমাদের জাতিকে শুধু দুর্নীতিগ্রস্ত-ই করে তোলে নি, জীবনের সুন্দর ধ্যান-ধারণাগুলোকেও বদলে দিয়ে রন্ধ্রে রন্ধ্রে শয়তানি ঢুকিয়ে দিয়েছে। জীবনটাকেই মরুময় করে ছেড়েছে। যেখানে আদর্শ, নৈতিক মূল্যবোধ এবং আত্মার কোন স্থান হয় নি।

যৌবনেই এই গুপ্ত দলের প্রতি আমার তীব্র ঘৃণা জন্মায়। ১৯১৪ সালে আন্‌কোনায় সংগঠিত সোশ্যালিষ্ট সম্মেলনের আগেই আমার সঙ্গীদের কাছে এই বিতৃষ্ণার কথা বলেছিলাম। ওরা কি সোশ্যালিষ্ট নাকি তথাকথিত রাজমিস্ত্রীর দল। বলতে দ্বিধা নেই সেই সোশ্যালিষ্ট রাজমিস্ত্রীর দল এর তীব্র বিরোধিতা করলেও আমার মতের প্রতিষ্ঠাই শেষপর্যন্ত বজায় থাকে।

পরবর্তীতে ফ্যাসিজিমেও আমি সেই বীর্য নিয়ে উপস্থিত হই। অবশ্য বলাবাহুল্য তার জন্য যথেষ্ট সাহসের প্রয়োজন হয়েছিল। আমি আমার জ্ঞানবুদ্ধির দ্বারা চালিত হয়েছি, সুযোগ সন্ধানী হই নি। জেসুইটদের প্রতি কোনরকম দুর্বলতা দেখাই নি। ওরা অবশ্য নিজেদের রক্ষার জন্য নিজেদের প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। বলাবাহুল্য ধর্মীয় ক্ষেত্রে ওরা কিন্তু অজানা অন্ধকারেই অবস্থান করতো।

আমার সরল কিন্তু আঁক কষা পদ্ধতি এবং ক্রমাগত প্রচেষ্টার জন্য রাজমিস্ত্রীগুলোর

প্রতি যে তীব্র ঘৃণার সৃষ্টি হয়েছিল, আজও যেন তা' আমাকে হনন করে চলেছে। রাজমিস্ত্রীদের সেই জঘন্য কার্যকলাপ ইতালিতে বন্ধ হলেও মুখোস পড়ে আন্তর্জাতিক ফ্যাসিষ্ট বিরোধিতার মধ্যে তা'কিন্তু সক্রিয় রয়েছে। তবে একথা স্বীকার্য যে আমার সক্রিয়তাকে এই রাজমিস্ত্রীদের রাজনীতি পরাস্ত করতে পারে নি। ওরা আপ্রাণ চেষ্টা করেছে আমাকে লক্ষ্য করে কলংকের কাদা ছুঁড়ে দিতে; কিন্তু সেই কাদার তাল আমার কাছে পৌঁছতে পারে নি। ওরা এইজন্য কম ষড়যন্ত্র আঁটে নি। তবে ভাড়াটে আততায়ী আমার নিয়তির কাছে পরাজয় স্বীকার করে নিয়েছে। ওরা আমার দুর্বলতাগুলোকে নিয়ে যেমন সমালোচনা করেছে, শারীরিক খুঁত নিয়েও কম ব্যঙ্গ করে নি। কিন্তু আমি বর্তমানে আগের চেয়ে অনেক বেশি সজীব এবং শক্তিশালী।

যে যুদ্ধে এই তথাকথিত রাজমিস্ত্রীদের কোন সহানুভূতি ছিল না, আমি সেই যুদ্ধ-ফেরত অভিজ্ঞ সৈনিক। আমি কিন্তু সর্বদা ইতালির রাজনৈতিক পরিমণ্ডলকে শ্রদ্ধা এবং সততার সঙ্গে চালনা করতে চেষ্টা করেছি। কিন্তু এই রাজমিস্ত্রীর দল সব সময়েই আমার বিরুদ্ধে ছুরি শানিয়ে গেছে। বরাবর এই রাজমিস্ত্রীদের দলটা শক্তিশালী থাকলেও আমার সঙ্গে এঁটে উঠতে পারে নি। আমার বিরুদ্ধে ওদের জেতা সম্ভবও ছিল না। ইতালি আমার জন্য-ই এই যুদ্ধে জয়ী হয়েছে। এতোদিনের কুষ্ঠরোগটাও তাই সেরে গেছে।

আজকের ইতালিতে আমরা মুক্ত বাতাসে নিঃশ্বাস নিতে পারি। জীবন দিনের আলোয় স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

বোনামী মন্ত্রীসভার পতনের পর রাজা অনেকের সঙ্গেই শলা পরামর্শ করেছিলেন। রাজার প্রাসাদ কুইরিনালে আমাকেও দু'বার ডেকে পাঠানো হয়েছিল। এই প্রাসাদেই রাজা সবার সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ, মিটিং ইত্যাদি করতেন। যাইহোক রাজার সঙ্গে আমার কি কথাবার্তা হয়েছিল সার্বভৌমত্বের কারণে তা' আজ আর প্রকাশ করা সম্ভব নয়। তবে এই রাজনৈতিক সংকট একটা অস্বাভাবিক দিকে মোড় নেয়। আমরা অন্ধকারে হাতড়ে বেড়াই। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে যারা এই শূন্যতা ভরাট করতে পারতেন, তারা সংখ্যায় খুব-ই কম ছিল। তারা প্রথমে অরল্যাণ্ডোর দিকে তাকায়, তারপর দৃষ্টি ঘোরায় ডি নিকোলোর প্রতি। কিন্তু তৎকালীন রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে কেউ-ই মন্ত্রীসভার দায়িত্ব নিতে চায় না। ওরা তাই আবার ফেরে বোনামীর কাছে। মনে রাখা প্রয়োজন যে বোনামী মন্ত্রীসভার ইতিমধ্যে একবার নয়, দু' দু'বার পতন হয়েছে।

আরো অনেকবার শলা পরামর্শ আর মত বিনিময় হয়। কিন্তু ঘুরে ফিরে সেই নামগুলোই ফিরে আসে। অরল্যাণ্ডো, ডি নিকালো আর বোনামী। কিন্তু ছবিটা হয় বিবর্ণ; আগের মতোই অসহায়তায় ভরা। যা আমাদের গণতন্ত্রকে বার বার শুধু বিপন্ন করেই তোলে নি, লাঞ্ছনা আর অপমানে বিপর্যস্তও করেছে। বছরের পর বছর গণতন্ত্রের নামে শুধু সরকার আর মন্ত্রীর দল বদল হয়েছে। আবার তাদের কাছেই নেতৃত্ব চাওয়ার অর্থ আদর্শের সঙ্গে আপোষ, দেশের অখণ্ডতার বিনিময়ে হতাশাজনক পরিস্থিতিকে চিরস্থায়ী করাকে মেনে নেওয়া। তাত্ত্বিকদের কাছে ব্যাপারটা প্রিয় বলে মনে হলেও বাস্তবে কিন্তু একেবারে উল্টো।

পোপুলার অথবা ক্যাথোলিক পার্টির রাজনৈতিক বিচক্ষণতা বলতে কিছু ছিল না।

কথাবার্তায় গোঁড়া রক্ষণশীল হলেও রাস্তায় এবং পার্লামেন্টে সন্ত্রাসবাদের সাহায্যে কাজ উদ্ধারে সচেষ্ট ছিল। ওরা কিন্তু জিয়োলিটিকে সমর্থন জানায় না। পপুলারদের ব্যাপার স্যাপার ছিল আরো অদ্ভুত। দুর্ভাগ্যবশত চেম্বারের বেশ বড় একটা অংশকে ওরা পরিচালনা করতো। কিন্তু ওরা ক্ষমতার দায়িত্ব নিতে শুধু অস্বীকার-ই করে না, জিয়োলিটির ছবিটাকে নীল রঙে আরো রঙীন করে দেয়। সঙ্গে সঙ্গে বোনামীকে সমর্থন দিতেও অস্বীকার করে। তা'তে বর্তমান মন্ত্রীসভার পক্ষে সুগঠিত কোন মন্ত্রীসভা গঠন করা অসম্ভব হয়ে পড়ে।

অনেক শলা পরামর্শের পরও একই নামগুলো বার বার ভেসে ওঠে। এই বদ্ধতা শুধু গণতন্ত্রকে দুর্বল করেই তোলে না, সঙ্গে সঙ্গে ছিঁড়ে টুক্‌রো টুক্‌রো করে দেয় রাজনৈতিক সমস্ত রকমের যুক্তি, নীতিজ্ঞান এবং সমগ্র ইতালিকে।

শেষপর্যন্ত একটা ফ্যাক্‌টো সরকার গঠিত হয়। বলাবাহুল্য জিয়োলিটির নির্দেশেই মেম্বার অফ পার্লামেন্টের সদস্যদের বেছে নিয়ে। মন্ত্রীসভা গঠনের জন্য। অলীক অভিযানের বিপদ আপদের সময় যাতে এই সরকার নোঙর হিসেবে কাজ করতে পারে। এই পরিস্থিতিতে যখন কেউ-ই দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিতে রাজী ছিল না, ফ্যাক্‌টো সরকারকে বাধ্য হয়ে দায়িত্ব তুলে নিতে হয়। তবে আমি আমার পত্রিকায় এই সরকারকে শুধু বর্ণহীন-ই বলি নি, আরো বলেছি হয়তো বা এই সরকার অন্য কারোর হয়ে কাজ চালিয়ে যাবে। আর কিছু না হোক দৈনন্দিন শাসন ব্যবস্থাটাকে তো টিকিয়ে রাখবে এই সরকার। বলতে আপত্তি নেই যে সরকারের গঠনমূলক কাজকর্ম থাকে না, সেই সরকারের অস্তিত্ব না থাকারই সমতুল। এমন কি রাজনৈতিক দিক থেকেও সেই সরকার নিজের শাসন ব্যবস্থা গড়ে তুলতে অক্ষম হয়।

ফ্যাক্‌টো ছিল অতি প্রাচীন সংসদ; পুরনো যুগের ডাই-য়ে ছাপ মারা ভদ্রলোক। সেই সময়ের তৃতীয় শ্রেণীর রাজনৈতিকতাতে বিশ্বাসী। তবে শ্রদ্ধা বলতে যা বোঝায় তা' ছিল তার শিক্ষক জিয়োলিটির প্রতি। অর্থমন্ত্রী হিসেবে কিন্তু ওর বিচক্ষণতার তুলনা সেই সময়ে ছিল না। অবশ্য তার বন্ধুরাও এই বিষয়ে একমত ছিল যে সংকটের সময় অর্থ মন্ত্রককে টেনে নিয়ে যেতে লোকটা অক্ষম ছিল। রাজনৈতিক দলগুলোর খেয়োখেয়ি, পপুলার দলের মিথ্যা দাবি, ফ্যাসিজিমের উত্থান এবং শেষ পর্যন্ত আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির টানা পোড়ানিতে খেই হারিয়ে ফেলেছিল মানুষটা।

ঠিক এই পথেই প্রাচীন ইতালির লিবারেল পার্টি সমস্যার সমাধানে অসমর্থ, সংসদে সংসদীয় অনর্থক তর্ক-বিতর্ক, এখানে ওখানে ক্যাফেটেরিয়ায় বসে ব্যক্তিগত কিছু লাভের জন্য ষড়যন্ত্র, উপর্যুপরি সংকটের বেড়াজাল বুনে আর হামবড়া সাংবাদিকতার মাঝখানে ইতালি টুক্‌রো টুক্‌রো হয়ে যাচ্ছিলো। কো-অপারেটিভ গুলোর বাঁচার চেষ্টায় সংগ্রাম, প্রয়োজনের তুলনায় অতি, অল্পসংখ্যক গ্রামীণ ব্যাংক, মুদ্রাস্ফীতি এবং সর্বোপরি অর্থনৈতিক চাহিদা মেটানোর অক্ষমতা। পুরো ব্যাপারটা হয়ে দাঁড়ায় যে ইতালির ভূমিকা ন্যাপকিন হাতে বিনয়ী চাকরের, যে আন্তর্জাতিক সম্মেলনে উপস্থিত অতিথিবর্গের মুখ মুছিয়ে দিতে সর্বদা দণ্ডায়মান। শৌর্যময় শক্তিশালী ইতালি। ইতালি এমন মা যে পরিশ্রমী সন্তানদের জন্ম দিয়েছিল অন্যের জমি উর্বর করে তোলার জন্য। অন্য শহর এবং বাইরের লোকেরা

ইতালির সেই সন্তানদের দ্বারা সমৃদ্ধ হয়েছে। এই ছিল ইতালির নেতৃত্ব! এই ছিল তাঁর দুর্দশা!

ফ্যাক্‌টো ছিল পুরনো জগতের প্রতিনিধি। ওর চারপাশে ঘিরে থাকা হঠাৎ এতো অনুরাগীদের ভিড় দেখে ফ্যাক্‌টো নিজেই অবাক হয়ে যেতো। যে কারণে নিজেই বলতো যে ও কিছুতেই বুঝে উঠতে পারে না কেন ওকে সরকারের শীর্ষে বসানো হলো। কিন্তু ফ্যাক্‌টো ভুলে গিয়েছিল যে ওকে ঘিরে থাকা অত্যুৎসাহী অনুরাগীর দল ছিল অবশিষ্ট লিবারেল দলের টিকে থাকা অংশ বিশেষ। যাদের বেঁচে থাকাটাই কষ্টকর হয়ে পড়েছিল। ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ সমুদ্রে জরাজীর্ণ জাহাজের মাস্তুলের কাঠটা ধরে যারা কোনরকমে তরংগ সংকুল দিনগুলোকে পাড়ী দিচ্ছিলো। যাতে কোনক্রমে নিরাপদ উপকূলে ওঠা যায়।

কিন্তু শক্তিশালী ফ্যাসিমো ইতিমধ্যে যথেষ্ট সক্রিয় হয়ে পড়েছিল। কারোর পক্ষে ফ্যাসিজিমের এগিয়ে চলার পথের মাঝখানে দাঁড়িয়ে পড়ে তার গতি রোধ করা সম্ভব ছিল না। সে তার স্থির লক্ষ্যে এগিয়ে চলছিল। ইতালির সরকার গড়াই ছিল ফ্যাসিজিমের গাণ্ডীবের লক্ষ্যভেদ।

তবে সেই দিনগুলোতে ফ্যাসিজিমের ওপরে বিচ্ছিন্নতাবাদীরা আঘাত হানতে সক্রিয় ছিল। কিছু লেখার মাধ্যমে আর বাকীটার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিয়ে সেই গুলোর হাত থেকে দলকে আমি বাঁচাই। তবে এইসবের চেয়ে ফিউমের একটা ঘটনাই আমাকে যথেষ্ট পীড়া দিয়েছিল। একজন স্বধর্মত্যাগী ইতালিয়ান ইতালির বিরুদ্ধেই ষড়যন্ত্র ফেঁদেছিল। ফ্যাসিষ্টরা ওর ওপরে বাঁধা আরোপ করে। দেশের শত্রু যুগোশ্লাভিয়ানরা শেষে বাধ্য হয়ে ফিউমে ছেড়ে পালায়। ওদের তাড়াতে না পারলে ইতালির পক্ষে এক মুঠো শান্তি পাওয়ারও সম্ভাবনা ছিল না।

এই সময় হাপুসবুর্গের চার্লস মারা যায়। দীর্ঘদিন ধরেই চার্লস সেন্ট ষ্টেফানের মুকুট মাথায় চড়ানোর চেষ্টা করে এসেছে। ইতিহাসের প্রতিহিংসার দেবী তার কালচক্র সম্পূর্ণ করে হাপুসবুর্গ থেকে চিরদিনের জন্য বিদায় নেয়। ইতালির ইতিহাসে এই হাপুসবুর্গ সব সময়ই এক দুর্ভাগ্যজনক ভূমিকায় অভিনয় করেছে। আমাদের অখণ্ডতাকে সুযোগ পেলেই ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে।

যাইহোক উত্থান-পতন, আশা-নিরাশার পথ বেয়ে আসে জেনোয়ার সম্মেলন।

মে মাসের প্রথমদিন তথাকথিত শ্রমিক উৎসব পালন করা হয়। কিন্তু এই উৎসবের একমাত্র কার্যক্রম হয় সোশ্যালিষ্ট এবং কম্যুনিষ্টদের গোপন এবং প্রকাশ্যে আক্রমণ। এমন কি যুদ্ধের সাংবাৎসরিক ২৪শে মে দিনটাও রক্তপাতের দরুণ বিষণ্ণতায় ভরে ওঠে। ইতালির সর্বত্র এই পবিত্র উৎসব পালিত হলেও রোমে এন্‌রিকো টোটিকে সম্মান প্রদর্শনের মিছিলে কম্যুনিষ্টরা গুলি ছোঁড়ে। বলাবাহুল্য ব্যাপারটা যে যথেষ্ট দুঃসাহসিক তা'তে সন্দেহ নেই। এই এন্‌রিকো টোটি সারাটা জীবন হিংস্র শত্রুদের বিরুদ্ধে প্রতিনিয়ত সংগ্রাম করে গেছে। মিছিলের ওপরে গুলি ছোঁড়ার জন্য একজন মারা যায়, চব্বিশজন গুরুতরভাবে আহত হয়।

ব্যাপারটা কিন্তু শেষমেষ শ্রমিক উৎসবের বদলে ফ্যাসিষ্ট বিরোধি জমায়েতের মাধ্যমে ধর্মঘটের দিন হয়ে দাঁড়ায়।

সন্দেহ নেই যে ব্যাপারটা প্রয়োজনের চেয়ে বেশি-ই হয়ে দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু সরকারের তরফ থেকে কোনরকম প্রতিক্রিয়া-ই ব্যাপারটায় নজরে আসে না। এতোটুকু ইতস্তত না করে আমি ফ্যাসিষ্টদের জমায়েত হ'তে আদেশ দেই। এবং প্রতিশ্রুতি রাখি, যে করেই হোক এই লাল বিদ্রোহীদের কোমর ভেঙে দিয়ে চিরকালের মতো গুঁড়িয়ে দেবো।

মধ্যবিত্ত শ্রেণী এবং সরকারের ভীরুতার পরিপ্রেক্ষিতে সমগ্র ব্যাপারটাকে চুলচেরা বিচার বিশ্লেষণের পর পুরো দায়িত্ব এবং মানসিক স্থিরতার সঙ্গে ফ্যাসিষ্টদের এই ঝাঁপিয়ে পড়া সোশ্যালিষ্ট এবং লাল বিদ্রোহীদের ওপর বরফ শীতল তীব্র জলধারার কাজ করে। বিদ্যুৎ গতিতে ফ্যাসিষ্টরা এই কাজে নেমে পড়ে। সেইদিনই কিন্তু ধর্মঘটেরও পরিসমাপ্তি ঘটে।

ব্যাপারটাতে ফ্যাসিষ্টদের মাথা গলানোর ফলে অতি দ্রুত পার্ক, স্কোয়ার এবং মাঠঘাটও আবার ধর্মঘটের আগের অবস্থায় ফিরে আসে। কিন্তু মন্টেসিটোরিওতে অবস্থিত সংসদে গোপন ষড়যন্ত্র চলতেই থাকে। সমস্তরকম পরিকল্পনা এবং প্রোগ্রামগুলোর দোদুল্যমান অবস্থা হয়। এমন কি লাল বিদ্রোহীদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে ইতালিতে একনায়কতন্ত্র চালু করার কথাও ওদের চিন্তা ভাবনাতে আসে। প্রস্তাব চালাচালিও কম হয় না ব্যাপারটা নিয়ে। তারপরে আসে সারা ইতালির চমক খাওয়ার দিন। ১২ই জুলাই। রাজস্বমন্ত্রী পিনোর রাখা প্রস্তাব। যা আমাকে সবচেয়ে বেশি উদ্বিগ্ন করে তোলে।

বাজেটে সাড়ে ছ'হাজার কোটির ঘাটতি দেখানো হয়। ইতালির পক্ষে সংখ্যাটা রীতিমতো আতংকজনক। আমাদের অর্থনীতির পক্ষে এই বিশাল বোঝা বহন করাও সম্ভব ছিল না। তারসঙ্গে যোগ হয় বৈদেশিক এবং অন্তর্দেশীয় ভুল নীতি। পুরো ব্যাপারটাই ইতালির অর্থনৈতিক অবস্থাটাকে রীতিমতো ঘোরালো করে তোলে। মন্ত্রী হিসেবে ফ্যাক্‌টো অতি দ্রুত তার চরম অক্ষমতার পরিচয় দিতে থাকে। ১৯২২ সালের ১৯ই জুলাই তারিখে সংসদে ফ্যাসিষ্ট দল ফ্যাক্‌টো মন্ত্রীসভার ওপর থেকে তাদের সমর্থন প্রত্যাহার করে নেয়। সোশ্যালিষ্ট দল যারা সরকারের সঙ্গে হাত মেলাতে উৎসুক ছিল যাতে ভালো করে পেছন থেকে ছুরি মারা যায়। আর পপুলার দল তো নিজেদের সর্বশ্রেষ্ঠ শাসক বলে ইতিমধ্যে ভাবতে শুরু করেছিল। যাইহোক আমি প্রধানমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে দ্ব্যর্থব্যঞ্জক স্বরে বলি ঃ

শ্রদ্ধেয় ফ্যাক্‌টো, আমি বলছি যে আপনার মন্ত্রী পরিষদের দিন ফুরিয়ে এসেছে। কারণ প্রতিটি ক্ষেত্রে এর পাহাড় প্রমাণ ব্যর্থতা। আপনার মন্ত্রী পরিষদ স্থায়ী হ'তে পারে না। কারণ মাত্র কয়েকজন এটাকে অতি কষ্টে টেনে নিয়ে চলেছে। পরম্পরার দড়ি একদিন ফাঁস হয়ে দাঁড়ায়। যা আপনার মন্ত্রী পরিষদকে ঝোলাবে। কারণ আপনার মন্ত্রী পরিষদকে যারা নির্বাচিত করেছে—তাদের চরিত্রও কষ্টিপাথরে যাচাইয়ের সময় এসেছে। মন্ত্রীসভায় আপনারই সম্ভবত সবচেয়ে আগে অবাক হওয়ার পালা আসবে।

তারপরে ফ্যাক্‌টো মন্ত্রীসভার ভুল কার্যকলাপের বিস্তারে আসি। শেষ করি আমার বক্তব্য এই বলে যে ফ্যাসিজিম সংসদীয় রাজনীতিতে সংখ্যা গরিষ্ঠতা না পেলেও উচ্চ পর্যায়ের রাজনীতি এবং বিনয়ের যে প্রমাণ রেখেছে, তারজন্য নিশ্চয়ই তাদের ধন্যবাদ প্রাপ্য। আর বর্তমান অবস্থায় সংখ্যা গরিষ্ঠ দলের শরিক হয়ে কাজ করে যাওয়াটাও সম্ভব নয়। তাই ফ্যাসিজিম সংসদের বাইরে থেকে তাদের যে করণীয় কাজ তা' করে যাবে।

আমার বলা কথাগুলোয় ফিসফিসানীর ঝড় ওঠে। কিছু বাক্যও এদিক ওদিক চালাচালি হয়। কিন্তু গলার স্বর আরো কিছুটা উঁচুতে তুলে আমি বলে চলি,—ফ্যাসিজিম শীঘ্রই নিজের ব্যাপারে মতামত নির্দিষ্ট করে নেবে। সম্ভবত স্পষ্ট করে সবাইকে জানাবে যে দল হিসেবে সরকারের দলে থাকবে, নাকি বিদ্রোহীদের একক দলে পরিণত করবে ফ্যাসিজিম। যদি ফ্যাসিজিম নিজেদের একক বিদ্রোহী দল হিসেবে গড়ে তবে তারপক্ষে সরকারের তরফে থাকা সেক্ষেত্রে সম্ভব হবে না। তাই এই সংসদে বসতেও সেই দল বাধ্য থাকবে না।

এইভাবে শুধু মুমূর্ষু ফ্যাক্‌টো মন্ত্রীসভাকেই নয়, যদি অন্য দলেরা একত্রীকরণের মাধ্যমে সরকার গড়তে সচেষ্ট হয়—তাদের প্রতিও আমার কথাগুলো রীতিমতো সাবধান বাণীর কাজ করবে।

আসলে সবাই যাতে বুঝতে পারে তারজন্য প্রকাশ্যেই আমার সাইনবোর্ডটাকে টাঙিয়ে দেই আর পরিষ্কার ভাবে সবাইকে বিজ্ঞাপিত করি আমার সঠিক অবস্থানটাকে।

সেইদিন-ই কিন্তু ফ্যাক্‌টো মন্ত্রীসভার পতন হয়। এবং অন্ধকারে হাতড়ে হাতড়ে ওরা আবার উত্তরাধিকারী খুঁজতে শুরু করে। অরল্যাণ্ডো, বোনামী, ফ্যাক্‌টো, জিয়োলিটি প্রভৃতি নামগুলোই আবার মুখে মুখে ফেরে।

যাই হোক ঝাড়াই বাছাই হওয়ার পর একটা নাম শেষপর্যন্ত টিকে থাকে, মেতা। মিলান শহর থেকে পপুলার পার্টির ডেপুটি হিসাবে নির্বাচিত। এবং পপুলার পার্টির সমস্ত ডেপুটিদের নেতা—যারা যেকোন উপায়ে কব্‌জায় রেখে নিজেদের কাজ উদ্ধার করিয়ে নেয়। মেতা কিন্তু মন্ত্রী ছিল। প্রথমে ভয়ে মন্ত্রীসভার নেতা হিসেবে নিজেকে স্বীকার করে নিতে রাজী হয় নি। ইতালিতে এটাই আপাত বিরোধী সত্য যে কেউ দায়িত্বের সঙ্গে ক্ষমতাকে হাতে নিতে চায় না। যতোই উদারবাদ বা গণতন্ত্রের দোহাই পাড়ুক, কিন্তু রাজী হয় না সেই তথাকথিত অমূল্য সম্পদকে স্পর্শ করতে।

সোশ্যালিস্টরা এই পরিস্থিতিতে মহানন্দে জাতিকে পেছন থেকে ছুরি বসায়। ফ্যাসিস্টরা কিন্তু তখন নীরবে নিজেদের রুটি তৈরি করতে ব্যস্ত; ইচ্ছা এবং অস্ত্র দু'টোই তৈরি যাতে জাতির মর্যাদার সুকঠিন লড়াই লড়তে পারে।

এই চরম সমস্যার হাত এড়িয়ে কেমন ভাবে একটা সরকার গড়া যেতে পারে, সেই সম্ভাবনা নিয়ে ধীরে সুস্থে যখন বিভিন্ন স্তরে আলাপ আলোচনা চলছে, তখনই ইতালিতে এক অস্বস্তিকর পরিবেশের সৃষ্টি হয়। লেবার কনফেডারেসন, সোশ্যালিষ্ট পার্লামেন্টারী গ্রুপ, ডেমোক্র্যাটিক গ্রুপ, রিপাবলিকান ইত্যাদি সমস্ত বামপন্থী দলগুলো একত্রিত হয়ে ইতালিতে সাধারণ ধর্মঘটের ডাক দেয়। এই ধর্মঘটের চরিত্র ছিল একান্তই ফ্যাসিস্ট বিরোধী। ধর্মঘটের বক্তব্য ছিল ফ্যাসিস্টদের হাত থেকে ইতালির স্বাধীনতা রক্ষা করা।

এই তথাকথিত রাজনৈতিক নক্ষত্রের দল যারা অতীতে স্বাধীনতাসহ দেশের সমস্তরকম উন্নতির পথ ধ্বংস করেছে, শেষ করে দিয়েছে নৈতিকতা, আদর্শ, শান্তি এবং আমাদের কাজ করার ক্ষমতাকে—তারাই আজ ফ্যাসিজিম তথা ইতালির জনসাধারণের বিরুদ্ধে চরম বিরোধীতার পথ নেয়। এর চেয়ে দুঃখের আর কি হ'তে পারে। মধ্যবিত্তদের মুখপাত্র মিলান নিউজপেপার সোশ্যালিষ্ট নেতা ফিলিপো তুরাতিকে রীতিমতো ডেকে এনে চেয়ারে বসিয়ে দেয়। যাইহোক সবাই ভাবে ফ্যাসিজিমকে সরকারের দলভুক্ত করার দরকার হয়ে পড়েছে।

অমীমাংসিত সমস্যাগুলো কাটা তক্তার মতো শূন্যে ঝুলতে থাকে। আবার রাজা আমাকে ডেকে পাঠান। অরলাণ্ডোর সঙ্গে আমার কিছু আলোচনাও হয়। কিন্তু বাতিল কাস্টিংয়ের মতো যে কোন দলের একত্রীকরণের প্রচেষ্টা গুদামের এক কোণে পড়ে থাকে। সুতরাং সবাই গিয়ে ধরে ফ্যাক্টোকে। ফ্যাক্টো আমার কাছে দূত পাঠায় যে ঠিক কি সর্তে আমি সরকারের শরিক হ'তে রাজী হবো। আমি ওকে খবর পাঠাই যে ফ্যাসিজিম সরকারের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দপ্তরগুলোর দখল চায়।

আমার মনের ভেতরে তীব্র আকাঙ্ক্ষা ছিল মন্ত্রীসভায় যাওয়ার। কিন্তু ব্যাপারটা অবাস্তব বলে মনে হয়। স্বাভাবিক ভাবেই আমাকে কোয়ালিসানের বাইরে থাকতে হয়। যাতে শুধু সমালোচনা নয়, প্রয়োজনে বদলা নেওয়াও সম্ভব হয়। আমার দাবীকে ফ্যাক্টো মন্ত্রীসভা অতিরিক্ত বলে মনে করে। যাইহোক দুর্ভাগ্যজনক ফ্যাক্টো মন্ত্রীসভা আমাদের অংশগ্রহণ ব্যতিরেকেই গঠিত হয়। তবে জলে জাহাজ নামামাত্র সমস্ত ইতালি জাতি মন্ত্রীসভার পরিণতি বুঝে নিয়ে নিজেদের সেই মন্ত্রীসভার অংশীদার বলে আর মনে করে না।

বন্ধু এবং শত্রুদের দৃষ্টি তখন ফ্যাসিজিমের দিকে স্থির নিবদ্ধ। আর এই একটা ব্যাপারই যেন ইতালির জনসাধারণের মনে প্রাণে তড়িত প্রবাহ বইয়ে দেয়।

ততোদিনে আমি কিন্তু মনস্থির করে ফেলেছি যে ব্ল্যাকসার্টদের আমি-ই নেতৃত্ব দিয়ে এগিয়ে নিয়ে যাবো। হ্যাঁ, রোমের দিকে।

এই পরিস্থিতিতে অবশ্য সমস্যার অন্য কোন সমাধান খুঁজে বার করাও সম্ভব নয়।

আমি ১৬ই অক্টোবর একজন জেনারেলকে মিলানে ডেকে পাঠাই। যে শুধু শারীরিক দিক থেকেই পটু ছিল না, মনে প্রাণেও ফ্যাসিস্ট মতাদর্শে বিশ্বাস রাখতো। অতীতের রোমান লিজিয়েনের আদলে আমাদের দলকে দু'টো ভাগে ভাগ করি। সামরিক এবং রাজনৈতিক বিভাগ। প্রিন্সিপি আর ট্রাইয়ারি। তা'ছাড়া ফ্যাসিস্ট দলের শীর্ষস্থানীয় নেতাদের সঙ্গে আলোচনার পর প্রচারের জন্য নির্দিষ্ট স্লোগান, ইউনিফর্ম এবং দিবারাত্র পাহারাদারীর ব্যবস্থা করি। আমি কিন্তু ইতালির বিভিন্ন অংশে ফ্যাসিস্ট এবং ফ্যাসিস্ট-বিরোধী শক্তিগুলোর খোঁজখবর রাখতাম। রোমে পৌঁছনোর পথ হিসেবে টাইহেনিয়ান সাগর ধরে এগানোটা ছিল সহজ, উমব্রিয়া থেকে কিছুটা সরে এসে। দক্ষিণ থেকে পুগ্‌লী এবং নেপেলস্ থেকে ফ্যাসিস্টরা সরে এসে সেই মার্চ পাস্টে যোগ দিতে পারবে। একমাত্র বাঁধা বলতে আমাদের উগ্র বিরোধিতার অঞ্চলগুলো যার কেন্দ্রে রয়েছে আনকোনা। আমি আরপিনাটি এবং ফ্যাসিস্টদলের আরো কয়েকজন লেফ্‌টেনান্টকে ডেকে পাঠিয়ে আনকোনাকে সোশ্যাল কম্যুনিস্টদের হাত থেকে মুক্ত করতে বলি। যে শহরটা একান্তভাবেই সন্ত্রাসবাদীদের দখলে ছিল। নিখুঁত সামরিক কৌশলে তাকে জয় করা হয়। কয়েকজন মারা যায় আর বেশ কিছু লোক আহত হয়। ব্যাপারটা খারাপ হলেও সেই অঞ্চলের ফ্যাসিস্ট বিরোধী শক্তি সম্পূর্ণভাবে পর্যুদস্ত হয়। ফ্যাসিস্ট বিরোধীরা রোমে জমা হ'তে শুরু করে। কিন্তু সেখানেও তাদের তাড়িয়ে ব্যারাকে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। বলাবাহুল্য ব্যারাক ছিল মন্টেসিটোরিওতে। যেখানে সংসদ বসতো।

আমাদের প্রদেশগুলোর আকাশে নতুন সূর্যের রোদ-রশ্মি যেন হঠাৎ ঝিকমিক করে

ওঠে। বুক ভরে নিঃশ্বাস নেই। ফ্যাসিজিমের সাহসী পদক্ষেপ চারদিক ছাপিয়ে বন্যার বেগে এগিয়ে চলে। এতো অল্প সময়ের মধ্যে যে আন্দোলন আমি গড়ে তুলেছি, সযত্নে এগিয়ে নিয়ে চলেছি, তার প্রশংসায় বিখ্যাত সমালোচকরা, ঐতিহাসিক এবং বিশ্বব্যাপি ছাত্রের দল মুখরিত হয়ে ওঠে। হ্যাঁ, আন্দোলনটাকে এইভাবে জয়ের পথে যেতে দেখে।

তখন কিন্তু আমি পলাতকদের উদ্দেশ্যে আমার কাগজে সম্পাদকীয় লিখতে ব্যস্ত। আমি লিখেছিলাম ঃ আজকের ফ্যাসিজিম জীবনের প্রথম ধাপটা সবেমাত্র পেরিয়েছে। তড়িঘড়ি করার কোন প্রয়োজন দেখি না। যথাসময়ে নিশ্চয়ই একজন সেন্ট পাউল আসবে।

তখন আমি অবশ্য প্রতিটি মিনিট রোম এবং ক্ষমতা দখলের পরিকল্পনা ছকতে ব্যস্ত। তবে ব্যক্তিগত ক্ষমতা, প্রতিপত্তি বা অন্য কোন মরীচিকায় যে প্রলুব্ধ ছিলাম না তা' বলার অপেক্ষা রাাখে না। এমন কি রাজনৈতিকতার দিক থেকেও কোনরকম একগুঁয়েমীর প্রশ্রয় দেই নি।

আমার জীবনের প্রথম এবং প্রধান লক্ষ্যই ছিল নিঃস্বার্থভাবে পরের উপকার করে যাওয়া। সেই আদর্শ খুঁজে বেড়াতে হয়তো বা আমাকে অন্ধকারে হাতড়াতে হয়েছে। তবে তা'আমার মাথা থেকে বোঝা ছুঁড়ে ফেলে দেওয়ার জন্য নয়। বলাবাহুল্য অন্য কারোর উপকারের নিমিত্ত। আমার সংগ্রাম নিজের কোন তাৎক্ষণিক বা অপ্রত্যক্ষ উপকারের জন্য করি নি, জাতির যাতে মঙ্গল হয় সেই উদ্দেশ্যেই নিয়ত সংগ্রাম করে গেছি আমি। শেষে মনপ্রাণ দিয়ে চেয়েছি যে ফ্যাসিজিম যাতে ইতালিকে শাসন করে তার হৃত গৌরব আর সৌভাগ্য-লক্ষ্মীকে ফিরিয়ে নিয়ে আসতে পারে।

সব ব্যাপারটা তো আর প্রকাশ্যে বলা যাবে না। এমন কি কয়েকটা অতি সহজ সরল পন্থাও এইসময় আমাকে বেছে নিতে হয়। চরিত্রগতভাবে এই পন্থাগুলোর কিছু ছিল রাজনৈতিক আর বাকী কয়েকটা ছিল গুপ্ত চরিত্রের যা কোনরকমেই প্রকাশ করা উচিত হবে না। পোপোলো দ্য ইতালিয়া কিন্তু বাইরের লোক এবং শত্রুদের দৃষ্টি আকর্ষণ ছাড়াই রোম মার্চের বস্তুতান্ত্রিক এবং মানসিক শক্তির স্নায়ুকেন্দ্র হিসেবে কাজ করে যায়। আমাদের চিন্তাধারা এবং কাজকর্মের কেন্দ্রস্থল ছিল এই অফিস।

আমার আদেশ সামরিক এবং রাজনৈতিক উভয় বিভাগ-ই অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলে। প্রতিটি পরিকল্পনা এবং প্রস্তাবকে চুলচেরা বিচার বিশ্লেষণ করে দেখি। তারপরে প্রয়োজনীয় আদেশ দেই। তবে ট্রেনটো, আনকোনা এবং বলজানো দখলের জন্য যথেষ্ট কূটকৌশলের প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। কারণ এই তিনটে জায়গায় বিরোধীদের কাছ থেকে বাধা পাওয়ার সম্ভাবনা ছিল প্রবল।

আমি নিজেও ফ্যাসিষ্ট আন্দোলনের বিষয়ে সূক্ষ্ম বিচার বিশ্লেষণ করি। কতোটা দক্ষতা এবং মানসিক প্রত্যয় দলে রয়েছে, সেই অনুযায়ী আমি ইতালির বিভিন্ন অংশে চারটে বক্তৃতা দেই। সেইসব বক্তৃতায় আমি ফ্যাসিষ্টদলের আগামীকালের নীতিগুলোর ব্যাখ্যা করি। এবং সঙ্গে সঙ্গে ফ্যাসিজিমের শেষ লক্ষ্যের কথাও বুঝিয়ে বলি। বলাবাহুল্য অত্যন্ত সরল ভাষায় এবং ভঙ্গিতে পুরো ব্যাপারটার উপস্থাপনা করেছিলাম ইতালির জনসাধারণের কাছে। আমাদের ক্ষমতা দখল করতে হবে। তবে তা' জনসাধারণের অনুগ্রহের পাত্র হিসেবে নয়। আমি সেই সময় দ্ব্যর্থব্যঞ্জক ভাষায় সোজাসুজি কথাগুলো রেখেছি। কোনরকম রঙ

তা'তে না চড়িয়ে। সমকালীন যুগে কোন রাজনৈতিক দল বা নেতা এতো সহজ সরল ভাষায় জনসাধারণের কাছে নিজের বক্তব্য রাখে নি। শুধু ইতালিতেই নয়, পৃথিবীর কোন দেশেই বোধহয় এটা ইতিপূর্বে হয় নি।

রোমের দিকে মার্চ করে এগোনোর একমাস আগে ১৯২২ সালের ১৭ই সেপ্টেম্বর তারিখে আমি লিখি ঃ গীর্জার বেদী থেকে মূর্তিমান গণতন্ত্রকে ছুঁড়ে ফেলে দাও। সত্যিকারের পবিত্র দেবতা হলো জনসাধারণ।

ফ্যাসিষ্টদের যেসব মিটিংয়ে আমি উপস্থিত ছিলাম, সেগুলো ডাকা হয়েছিল উত্তর ইতালির উধিনে, পো উপত্যকার ক্রিমোনাতে, শিল্প-শহর মিলানোতে এবং দক্ষিণ ইতালির কেন্দ্র-শহর নেপেলসে। আমি ব্যক্তিগত ভাবে প্রদেশগুলোর আত্মার সঙ্গে নিবিড়ভাবে পরিচিত হ'তে চেয়েছিলাম। কারণ প্রতিটি প্রদেশের নিজস্বতা ছিল। জমায়েতে উপস্থিত জনসাধারণ শুধু আমাকে ত্রাণকর্তা হিসেবে সম্মান জানায় নি, বিজয়ীর চোখেও দেখেছিল। এটা আমার কাছে খুশী বয়ে আনলেও গর্বিত হই নি। নিজের ভেতরে জনসাধারণের এই সাদর অর্ভ্যথনা যেমন শক্তি জুগিয়েছে, তেমনি পাহাড় প্রমাণ দায়িত্ববোধও চাপিয়ে দিয়েছে। চারটে শহর কতোদূরে এবং চরিত্রের। তবু এক-ই সূর্যরশ্মি আমি প্রত্যক্ষ করেছি। আমার সঙ্গীরা ছিল সৎ, খাঁটি, নির্ভীক ইতালির আত্মা। একনিষ্ঠও বটে। সেন্ট্রাল কমিটি ফ্যাসিসি ইতালিয়ান ডি কমবাটিমেন্টো একত্রিত হয়ে আন্দোলনের রূপরেখা তৈরি করি। যে পবিত্র পথ ধরে কালো সার্টের মিছিল রোমের দিকে এগিয়ে যাবে।

মিলানের সিরকোলো সিসিয়াতে আমি বলেছিলাম যে লিবারেলিজিমের বিষাদ সূর্য অস্তমিত হয়ে গেছে। ফ্যাসিষ্টরা ইতালিতে নতুন উজ্জ্বল প্রভাতকে ডেকে এনেছে।

।। রোম দখল ।।

বর্তমানে সেই শাশ্বত শহরের দিকে যাত্রার জন্য আমরা তৈরি।

বিভিন্ন প্রদেশের অবস্থার ব্যাপারে আমার জরীপ করা তখন সম্পূর্ণ হয়ে গেছে; ব্ল্যাক-সার্টদের দলীয় প্রধানদের মতামতও মন দিয়ে শুনি। আঘাত হানার পুরো পরিকল্পনা ছকে নেই ইতিমধ্যে; ঠিক সুযোগের সময়টা স্থির করে ফেলে শহর ফ্লোরেন্সে ফ্যাসিষ্ট আন্দোলন এবং অ্যাক্সান স্কোয়াডের নেতাদের ডেকে পাঠাই। মিচেলে বিয়ানচি, ডি বেনো, ইটালো বালবো, জিয়োরিয়াটি এবং আরো অনেকে ফ্লোরেন্স শহরে আসে। ওদের মধ্যে অনেকে যুদ্ধ বিজয় দিবস বলে ৪ঠা নভেম্বর কালো সার্টদের জমায়েতের কথা বলে। আমি কিন্তু সেই প্রস্তাব তৎক্ষণাৎ বাতিল করে দেই। কারণ আমার ধারণায় স্মৃতি উৎসবের দিনে বিদ্রোহের কাজকর্ম শুরু করাটা ঠিক উচিত হবে না।

আমাদের আন্দোলন যেমন পুরো সুযোগ নিতে কসুর করবে না, তেমনি সময় মতো সশব্দে জ্বলে ওঠারও প্রয়োজন আছে। সামরিক দিক ছাড়াও এই আন্দোলনের রাজনৈতিক একটা দিক এবং মূল্য বর্তমান। সেটার ওজনও যাচাই করে নেওয়া কর্তব্য। শেষমেষ সরকার হয়তো বা সন্ত্রাস দ্বারা আমাদের এই আন্দোলনকে দমিয়ে রাখতে চেষ্টা করবে,

অথবা দলের কেউ বে-ফাঁস করে দেবে আমাদের ছকা সমস্ত পরিকল্পনাটাকে। সুতরাং সমস্তরকম আশংকাকে আগে ভাগে যাচাই করে নিয়ে সেই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে তখন কি করাটা উচিত হবে, তা স্থির করাটাই সঙ্গত। ঠিক কারা কারা এই বিদ্রোহে অংশ নেবে এবং ফ্যাসিষ্টদের লক্ষ্য-ই বা কি হবে—এইসব প্রশ্নগুলোর উত্তরও ভেবে রাখা উচিত।

শহর নেপেলসে ফ্যাসিষ্টদের মিটিংকে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছিল আমাদের দ্বিতীয় বৃহৎ কংগ্রেস বলে। শৃঙ্খলা এবং বক্তৃতার আড়ালে সত্যিকারের জমায়েতের কারণটাকে কিন্তু আড়াল করে রাখা সম্ভব হয়েছিল। একটা জিরো মুহূর্তে সমস্ত ইতালিতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা অ্যাক্সান স্কোয়াড একসঙ্গে অস্ত্র শস্ত্র হাতে তুলে নেবে। তারপর মূল স্নায়ুকেন্দ্রগুলোকে দখল করবে। শহর, পোষ্ট অফিস, উচ্চপদস্থ সামরিক এবং বে-সামরিক কর্তাদের অফিস, জেলার পুলিশ হেড কোয়াটার্সগুলো, রেলষ্টেশান এবং মিলিটারী ব্যারাক।

সম্মিলিত দল থেকে একটা দল ভাগ হয়ে টাইহেনিয়ান সমুদ্র ধরে রোমের দিকে এগিয়ে যায়। নেতাদের অধীনে। সেইসব নেতারা ছিল ভূতপূর্ব সাহসী মিলিটারী অফিসার। আড্রিয়াটিকের দিক থেকেও লো রোমাগ্না, মার্চে এবং ব্রুজি জেলা পেরিয়ে যাবে আর একটা দল। রোমকে লক্ষ্য করে। তবে এই পরিকল্পনাটাকে বাস্তবে রূপায়িত করতে গেলে প্রয়োজন হবে আনকোনাকে সোশ্যাল—কম্যুনিষ্টদের হাত থেকে মুক্ত করার। সেই কাজটা কিন্তু ততোদিনে সম্পূর্ণ হয়ে গেছে। মধ্য ইতালির থেকে অনেক স্কোয়াড্রেন-ই তখন নেপেলসের মিটিংয়ের জন্য জড়ো হয়েছে। ওদের রোম লক্ষ্য করে অভিযান চালাতে বলা হয়। বেশ কয়েকদল ফ্যাসিষ্ট অশ্বারোহী ক্যারাভোনার অধীনে থেকে ওদের সাহায্য করে রোমের দিকে এগিয়ে যেতে।

যে মুহূর্তে ফ্যাসিষ্ট জমায়েত এবং প্রচার শুরু করার কথা হয়ে অপারেশন শুরু হয়, তখন থেকে কড়া মার্শাল আইন-কানুন এবং ফ্যাসিজিমের আদেশ যাতে অফিসার এবং সাধারণ ফ্যাসিষ্টরা পালন করে চলে, সেদিকে তীক্ষ্ণ নজর দেওয়া হয়।

আমাদের রাজনৈতিক ক্ষমতা অর্পণ করা হয় মিলিটারীদের ওপরে। জেনারেল বোনো, ডি ভিচি, ইতালো বাল্‌বো এবং মিচেল বিয়ানিচির উপস্থিতিতে। আমি সেই সভায় সভাপতিত্ব করি এবং দুচে অর্থাৎ নেতা নির্বাচিত হই। অর্থাৎ ওপরের চারজনের কাজকর্মের পুরোপুরি দায়িত্ব আমার ওপরে বার্তায়। তবে শুধু ফ্যাসিষ্টদের দায়িত্ব-ই নয়, সমগ্র ইতালির দায়িত্বভার আমার ওপরে এসে পড়ে।

জড়ো হওয়ার হেড কোয়াটার্স হিসেবে আমরা উমব্রিয়ার রাজধানী শহর পেরুজিয়াকে বেছে নেই। এই শহরে অনেকগুলো রাস্তা এসে মিশেছে। এবং এখান থেকে রোম পৌঁছনোও অনেক সহজ। তবে সামরিক এবং রাজনৈতিক পরাজয় ঘটলে অ্যাপেনাইন পর্বতমালা পার হয়ে পো উপত্যকায়ও চলে যাওয়া যাবে। অতীতের বিদ্রোহের ইতিহাস খুঁজলে দেখা যাবে এই অঞ্চলটা সব সময় নিরাপদ। যে কোন পরিবেশ এবং পরিস্থিতিতে অঞ্চলটাতে আমাদের একাধিপত্যের কোন প্রশ্ন-ই ওঠেনা। পাহারাদারীর ব্যবস্থা করি; আক্রমণের পরিকল্পনাও বিস্তারিতভাবে ছকা হয়। তবে পোপোলো দ্য ইতালিয়ার অফিসে সব ব্যাপারেই নিয়মিত রিপোর্ট করতে হবে বলে সবাইকে জানিয়ে দেওয়া হয়। বিশ্বস্ত ফ্যাসিষ্ট বার্তাবাহকের দল মাকড়সার জালের মতো চারদিকে জাল বিছিয়ে দেয়। সারাদিন আমি

প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেই। অ্যাক্সান শুরু হলে জাতির উদ্দেশ্যে যে ঘোষণা করা হবে, সেই ঘোষণাপত্র বা ইস্তাহারও ইতিমধ্যে লিখে ফেলি। বিশ্বস্ত বন্ধুদের মাধ্যমে জানতে পেরেছিলাম যে অত্যন্ত গুরুতর পরিস্থিতির সৃষ্টি না হলে দেশের বর্তমান সামরিক বাহিনী মোটামুটি নিজেদের নিরপেক্ষ-ই রাখবে।

নেপেলসের সেই ঐতিহাসিক সম্মেলনে উদ্বোধনী বক্তৃতার পর দেশে ফ্যাসিষ্ট সশস্ত্র বিদ্রোহের কিছুটা আভাস দেই; কিন্তু মূল বিষয়ের অবতারণা করি না। তারপর শহর নেপলস্‌কে অলংকারে ভূষিত করি ভূমধ্যসাগরের রাণী নামে অভিহিত করে। বিভিন্ন সাধারণ বিষয়ের ওপরে আলোচনা শুরু হয়। সেই আলোচনার উদ্দেশ্যে অবশ্য কিছু ছিল না। শুধু সময়টাকে নিজেদের সুবিধার জন্য কিছুটা বাড়িয়ে নেওয়া ছাড়া। সেই কপট সভার নেতা ছিল মিচেল বিয়ানচি। যে রোম দখলের জন্য তৈরি হওয়া দলের একজনও বটে। সেই সময় কিন্তু সে তার রাজনৈতিক ধ্যান-ধারণাও মন খুলে প্রকাশ করে। ডি বোনো এবং বাল্‌বো যারা অ্যাক্সান স্কোয়াডের ধুরন্ধর হোতা ছিল, তারা হেড কোয়ার্টার পেরুজিয়াতে দলের সঙ্গে যোগ দেয়।

শেষে সেই সম্মেলন থেকে আমি ফিরে আসি মিলানে। সেই যাত্রাপথে অনেক বন্ধুবান্ধবের সঙ্গেই আলোচনা হয়, যারজন্য আগের থেকেও বেশি প্রস্তুতির সময় পাই। বিশেষ করে এমন কিছু প্রয়োজনীয় বিষয় সেইসব আলোচনায় ভেসে ওঠে যার প্রস্তুতি শহর মিলান এবং লামবার্ডি জেলার প্রতিটি সদর দপ্তরে নিতে হয়। যেহেতু আমার চারপাশে তখন সাদা পোষাকে গোয়েন্দারা ঘিরে ছিল, তারজন্য এমন উদাসীন ভাবভঙ্গি দেখাই যে পৃথিবীর কোন ব্যাপার বা সমস্যা নিয়েই চিন্তা-ভাবনা করতে আমি প্রস্তুত নই। ব্যাপারটা খুব সহজ নয়। কারণ যতো দ্রুত সম্ভব গাড়িটা চালিয়ে আমাকে ফিরতে হবে এবং ফেরার পথে কাজকর্মের চাপও কিছু কম ছিল না। সন্ধ্যেবেলায় থিয়েটার দেখতে যাই। এমন ভাব দেখাই যে কোনদিকে নজর দেওয়ার মতো ফুরসুৎ-ই নেই।

যখন দেখি সবকিছু প্রস্তুত, হঠাৎ পোপোলো দ্য ইতালিয়া এবং প্রচার পত্রের মাধ্যমে আমার আহ্বান শহর মিলান থেকে ছড়িয়ে দেই। ইতালির অন্যান্য পত্রিকাতেও আমার সেই বিদ্রোহের ডাক প্রকাশিত হয়। এই ইস্তাহারে স্বাক্ষর করেছিল কোয়াড্রিয়ূমভিরাতা। সেই স্মরণীয় দলিল হলো ঃ

ফ্যাসিষ্ট! ইতালির জনগণ!

স্থিরকৃত যুদ্ধের সময় সমাগত। চার বছর আগে আমাদের জাতীয় সৈন্যবাহিনী আক্রমণের মাধ্যমে জয় ছিনিয়ে এসেছিল। আজ কালোসার্ট পরিহিত সৈন্যদল সেই বিজয়ের দখল নিতে দৃঢ় সংকল্প। যে জয়ের অঙ্গহানি করা হয়েছে, সেই হৃতগৌরব পুনরুদ্ধারের জন্য রাজধানী শহর রোমকে লক্ষ্য রেখে এই অভিযানকে চালনা করা হচ্ছে। এখন থেকে প্রিন্সিপিয়া আর ট্রাইয়ারীতে জমায়েত শুরু করতে হবে। ফ্যাসিজিমের সামরিক আইন জারী করা হলো। দুচের আদেশ অনুযায়ী দলের সামরিক, রাজনৈতিক এবং প্রশাসনের ভার নেবে গোপন কোয়াড্রিয়ূমভিরাতা—যারা এক নায়কতন্ত্রের সমস্ত ক্ষমতা নিয়ে এই অভিযান পরিচালনা করবে।

যে সৈন্যবাহিনী জাতিকে অতন্দ্র পাহারায় রেখেছে, তাদের প্রতি আমার অনুরোধ তারা

যেন এই সংগ্রামে অংশগ্রহণ না করে। ভিক্টোরিয়া ভেনেতোর সৈন্যবাহিনীর প্রতি ফ্যাসিজিম অসীম শ্রদ্ধা রাখে। তদুপরি ফ্যাসিজিমের এই অভিযান পুলিশের বিরুদ্ধে নয়; কিন্তু রাজনৈতিক যে শ্রেণী কাপুরুষতা এবং পৌরুষহীনতার দরুণ গত দীর্ঘ চার বছর ধরে জাতিকে একটা যোগ্য সরকার দিতে পারে নি, তাদের ফ্যাসিজিম রেয়াৎ করবে না। সমাজের উৎপাদক শ্রেণীর প্রতি আমার বক্তব্য হলো ফ্যাসিজিমের সম্পর্কে আতঙ্কিত হওয়ার কোন কারণ নেই। কারণ ফ্যাসিজিম সমাজে শৃঙ্খলাবোধ আনতে বদ্ধপরিকর। যাতে সমগ্র জাতি প্রগতির পথে দ্রুত এগিয়ে যেতে পারে। শ্রমিক, চাষী, রেল লাইনের কাজে ব্যাপৃত মজুর বা অফিসে কর্মরত কর্মচারীদের ফ্যাসিষ্ট সরকারকে ভয় পাওয়ার কিছু নেই। তাদের অধিকার ফ্যাসিষ্ট সরকার সর্বতোভাবে রক্ষা করবে। এমন কি অস্ত্রবিহীন বিরুদ্ধবাদীদের প্রতিও আমরা সদয় থাকবো।

সমস্ত ইতালির ফ্যাসিষ্টদের জয় হোক। রোমানদের মতো তোমাদের আত্মিক সাহস আমাদের প্রতি বর্ষিত হোক। আমাদের জিততেই হবে। এবং জিতবোও বটে।

ইতালি এবং ফ্যাসিজিম দীর্ঘজীবি হোক।

।। দ্য কোয়াড্রিয়ুমভিরাতা।।

ক্রিমোনিয়া, অ্যালেসানড্রি এবং বোলোনিয়াতে রক্তাক্ত সংঘর্ষের প্রথম খবর পাই রাত্রিবেলা। অস্ত্রশস্ত্র, বারুদখানা এবং সৈন্যদের ব্যারাকেও প্রচণ্ড আঘাত হানা হয়েছে। ইস্তাহারটাকে ছোট এবং ব্যঞ্জনাদ্যোতক হিসাবে লিখেছিলাম, যা সমস্ত ইতালির জনগণের মন জয় করতে সমর্থ হয়েছিল। হঠাৎ যেন আমাদের জীবন বিদ্রোহের প্রজ্জ্বলিত আগুনে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। বিভিন্ন শহরে ঘটে চলা বিদ্রোহের খবরাখবর অনেক সাংবাদিক-ই রঙ চড়িয়ে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় লিখতে শুরু করে। ইতালির দায়িত্বশীল নাগরিকেরা উপলব্ধী করে যে এই আন্দোলনের মাধ্যমে এমন একটা সরকার আসবে যার শাসন জনসাধারণ মেনে চলবে। তবে জনসাধারণের বৃহৎ অংশ আন্দোলনটাকে ঠিক বুঝে উঠতে না পেরে বিস্ময় ভরা চোখে জানালায় দাঁড়িয়ে দেখে।

ধ্বংসমূলক উদারপন্থী একজন নেতার দেখাও পাওয়া যায় না। ভয়তাড়িত সবাই গিয়ে গর্তে ঢুকেছে। ওরা স্পষ্ট বুঝেছে এটাই হলো আমাদের আঘাত হানার ব্রাহ্মমুহূর্ত। সবাই তখন বুঝে গেছে যে ফ্যাসিজিমের এই সংগ্রামের শেষে দাঁড়িয়ে আছে জয়। আমি কিন্তু বহু দূর থেকে এই জয়ের গন্ধ পাচ্ছিলাম। বাতাস সেই গন্ধে ভরপুর; বাতাসও কানাকানি করে এই একই কথা বলছে। বৃষ্টির দৌলতে তা' মাটি স্পর্শ করছে। আর পৃথিবী সেই জয় শব্দটা আকণ্ঠ পান করেছে।

আমিও কালো সার্ট গায়ে চড়িয়ে নেই। পোপোলো দ্য ইতালিয়ার অফিসটাকে ঘিরে ফেলি। জীবন্ত বাদামী রঙের প্রভাতে শহর মিলান নতুন রূপ নেয়। হঠাৎ নিস্তব্ধতা যেন ইতিহাসের সেই বিখ্যাত প্রহরগুলোর কথা শহরবাসীকে স্মরণ করিয়ে দেয়।

ভ্রূকুটি চোখে রয়াল গার্ডের দল শহরময় ঘুরে বেড়ায়। ওদের একঘেয়ে পায়ের শব্দ নির্জন রাস্তাগুলোয় প্রতিধ্বনিত হয়।

সরকারী যান বাহন চলাচলের সংখ্যা কমে গিয়ে প্রায় শূন্যে দাঁড়িয়ে যায়। সৈনিকদের

ব্যারাক এবং পোষ্ট অফিসগুলোর ওপরে ফ্যাসিষ্টদের অবিশ্রান্ত গুলি বর্ষণের শব্দ এক নাগাড়ে বাতাসে ভেসে আসে। পুরো ব্যাপারটাতে মনে হয় শহরে গণযুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে।

আমি কিন্তু আমার পত্রিকার অফিসগুলোকে হঠাৎ আক্রমণের বিরুদ্ধে সুরক্ষার সমস্ত রকম ব্যবস্থা করে রেখেছিলাম। কারণ জানতাম সরকারের তরফ থেকে প্রতি আক্রমণের প্রমাণ রাখার জন্য প্রথমেই আমার পত্রিকার অফিসগুলোর ওপরে আঘাত হানা হবে। সত্যি বলতে কি ভোর সকালেই দেখেছিলাম ওদের পোষা কিছু সশস্ত্র গুণ্ডা অফিসের সামনে ঘোরাফেরা করছে। কয়েকবার দ্রুত গুলি বিনিময়ও ঘটে। রাইফেলের ম্যাগাজিনে গুলি ভর্তি করে নিয়ে নীচে নেমে আসি। প্রয়োজনে যাতে দরজাটা সুরক্ষিত রাখা যায়। ভয়তাড়িত প্রতিবেশীর দল আত্মরক্ষার তাগিদে দরজা এবং জানালায় ভীড় করে।

গুলি বর্ষণের সময় গুলি গুলো শিষ দিয়ে যেন আমার দু'কানের পাশ দিয়ে ছুটে যায়।

রয়াল গার্ডদলের একজন মেজর শেষ পর্যন্ত সন্ধির প্রস্তাব নিয়ে আমার সঙ্গে দেখা করতে চায়। কিছুক্ষণ কথাবার্তার পরে আমরা রাজী হই যে রয়ালগার্ড অফিস থেকে দু'শো মিটার দূরে সরে যাবে এবং মিলিটারীরা রাস্তার মাঝখান থেকে হটে প্রায় একশো মিটার দূরের রাস্তার সংযোগস্থলে গিয়ে দাঁড়াবে। হ্যাঁ, এইভাবে সশস্ত্র অভিযানের মধ্যে দিয়ে ২৮শে অক্টোবর দিনটার শুরু হয়।

রাত্রিবেলা মিলান শহরে বসবাসকারী কয়েকজন মন্ত্রী, সেনেটার এবং রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব আমার কাছে আসে। যাদের মধ্যে ছিল সেনেটার কন্টি, ক্রেসপি এবং মন্ত্রী ডি কাপিটানি। ওরা আমার পোপোলো দ্য ইতালিয়ার অফিসে এসে এই সংগ্রাম থেকে বিরত থাকতে অনুরোধ করে। কারণ ওদের ধারণায় এই সংঘর্ষ শেষে ভীষণ গণযুদ্ধের রূপ নিতে পারে। অন্তত সেই সম্ভাবনা পুরো মাত্রায় বিদ্যমান। ওদের প্রস্তাব ছিল কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে সন্ধি করে একটা রফায় আসা। তা'তে সম্ভবত মন্ত্রীসভার এই বিপদ কেটে গিয়ে দেশ এবং পরিস্থিতির ওপরে জমা কালো মেঘও সরে যাবে।

আমি সংসদদের সহজ সরল চিন্তাধারা দেখে মুচকে হাসি। ওদের কথার উত্তরে বলি

মহাশয়রা, কোন মন্ত্রী বদল করে এই সমস্যার সমাধানের বিন্দুমাত্র সম্ভাবনা নেই। আমি যে কাজ শুরু করেছি তার চরিত্র যেমন ব্যাপক, তেমনি গভীর। গত তিন বছর ধরে আমরা হতাশায় নিমজ্জিত; ক'খনো তার জন্য ছোটখাটো সংঘর্ষও হয়েছে। কিন্তু এইবার জয় ছাড়া হাতে তোলা অস্ত্র আর আমরা নামাবো না। শুধু সরকারের নয়, ইতালির জীবন যাত্রার মুখ ঘুরিয়ে দেওয়ার এটাই প্রকৃষ্ট সময়। সুতরাং সংসদে বসে বিভিন্ন দলের সঙ্গে ঝগড়াঝাঁটি করার কোন অর্থ হয় না। তবে এখানে একটা প্রশ্ন থেকে যায় যে আমরা ইতালিয়ানরা কি স্বাধীনভাবে আমাদের জীবনযাত্রা নির্বাহ করতো পারবো? নাকি আমাদের দুর্বলতাগুলোর দাস হয়েই আমাদের জীবন কাটাতে হবে। শুধু বাইরের জাতিদের কাছে নয়, আমাদের নিজেদের ব্যাপারেও আমরা স্বাধীন নয়। যুদ্ধ ঘোষণা করা হয়ে গেছে। আমরা তিক্ত হলেও এর শেষ দেখতে চাই। সেই সংবাদ কি আপনাদের কাছে
পৌঁছায় নি? যাই হোক সমগ্র ইতালিতেই আজ এই সংগ্রাম ছড়িয়ে পড়েছে। যুবকরা হাতে অস্ত্র তুলে নিয়েছে। আমি একজন এমন নেতা যে কারোর পেছনে পেছনে ঘোরে না। সব সময় সামনে এগিয়ে চলে। হ্যাঁ, পুরোভাগে। ইতালির যুবকদের এই চমৎকার জাগরণকে

কিছুতেই আমি অপমান করতে পারবো না। আমি আপনাদের বলতে পারি যে এটাই শেষ অধ্যায়। আর এটাই আমাদের দেশের পরম্পরাকে পূর্ণ করবে। সমঝোতার মাধ্যমে এর মৃত্যু ঘটানো কখনই উচিত নয়।

আমি সেদিন সকালেই কমাণ্ডার গাব্রিয়েল ডি আনুনজিয়োর কাছ থেকে যে চিঠিটা পেয়েছি সেটা ওদের দেখাই। আমি ফিউমের উদ্ধারকর্তার কাছে ছোট্ট একটা সংবাদ পাঠিয়েছিলাম। এখানে বলা বোধহয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে অন্ধকারময় সংগ্রামের দিনগুলো থেকেই গাব্রিয়েল আমাদের সঙ্গে রয়েছে? জেনারেল জিয়ামপেট্রো, ডাউট্ এবং ইউজিনিয়েব কোসিলেস্চি সঙ্গে করে চিঠিটা আমার কাছে নিয়ে এসেছিল। রাজনৈতিক নেতাদের আশা ছিল ডি আনুনজিয়ো হয়তো বা তার মুখ ওদের দিকে ঘোরাবে। কিন্তু হা হতোস্মি। আমার পাঠানো খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ডি আনুনজিয়ো নীচের চিঠিটা পাঠায় ঃ

প্রিয় মুসোলিনি,

সারাদিন হাড়ভাঙা পরিশ্রমের পর রাত্রে তিনজন বার্তাবাহক আমার কাছে আসে।

এই অধ্যায়ে এক চোখ অন্ধ জীবনে এতোবার এগিয়ে যেতে গিয়ে বাধা পেয়েছি যে বর্তমানে অবসর নিয়ে নিজেকে ধ্যানমগ্ন করে রেখেছি। তবে আমার ধারণা ইতালির যুবকরা আত্মোপলব্ধীর মাধ্যমে নিজেদের চিনতে পেরে পবিত্র হৃদয় নিয়ে আপনাকে অনুসরণ করবে।

সমবেতভাবে মিলিত জোরদার প্রচেষ্টা চালানো উচিত যাতে ইতালি তার অভীপ্সিত লক্ষ্যে পৌঁছতে পারে।

পুরুষোচিত ধৈর্যের সঙ্গে অস্থিরচিত্ততাকে জয় করতে পারলেই আমাদের মুক্তি সম্ভব।

বার্তাবাহকরা আমার চিন্তাধারা এবং ইচ্ছা রঙ্ ছাড়াই আপনাকে বিস্তারিত জানাবে।

রাজা জানেন যে আমি তাঁর কতো বিশ্বস্ত এবং ইতালির অন্যতম আগ্রহী সৈনিক।

এই পরিবর্তিত লক্ষ্যে আমি চাই সে দাঁড়াক এবং মোকাবিলা করুক। তা'তে হেরে গেলেও অনুশোচনা বা দুঃখ থাকবে না।

এথিনী দেবীর দু'চোখ আজ আসন্ন বিজয়ের আলোতে ঝিকমিক করছে। তাঁর চোখের সেই আশার আলো কেড়ে নিয়ে অন্ধ করে দিও না। শেষ জয় আসবেই।

।। গাব্রিয়েলে ডি আনুনজিয়ো ।।

লামবার্ড রাজনৈতিক নেতাদের কাছে ডি আনুনজিয়োর চিঠিটা পড়ে ইস্তাহার হাতে তুলে দিয়ে বলি যে আমার সঙ্গে যদি একজনও থাকে, অথবা আমি একা হলেও এই সংগ্রাম আমি বন্ধ করবো না। আমার সঙ্গীদের যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছি, কিছুতেই তার থেকে সরে আসবো না। যারা আমাকে বোঝাতে এসেছিল, তাদের কাছে সোজাসুজি যুক্তির মাধ্যমে আমার বক্তব্য পেশ করে ফেরত পাঠাই।

আমার মনে হয় ওদের মধ্যে কেউ প্রায় তৎক্ষণাৎ প্রধানমন্ত্রীকে ফ্যাক্টোকে জানায় যে আমি কোন বোঝাপড়ার মধ্যেই যাবো না।

হতভাগ্য ফ্যাক্টো নিজের দোষগুলোকে উপলব্ধী না করে বরং কি করে এবং কাকে এই সমস্যার ব্যাপারটা বলবে সেটা ভেবেই অস্থির হয়ে পড়ে। কারণ তখন তো সংসদ বন্ধ। তাই কিছুটা হতোভম্বও হয়।

যে কেউ চোখ মেললেই দেখতে পাবে যে ঘটনা সমষ্টি অথবা একটা ঘটনার পেছনে অনেকে অদ্ভুত বা হাসির খোরাক খুঁজে পায়। এমন কি এরা সেই মহৎ এবং দুঃখজনক ঘটনার ছায়ায় নিজেদের টেনে বড় করার প্রচেষ্টাও রাখে।

লিবারেল সরকার শেষের মুখে এসে ইতালির জনগণের উদ্দেশ্যে শেষ বক্তব্য রাখে। যে বক্তব্যের সারাংশ নীচে দেওয়া হলো ঃ

রাজদ্রোহাত্মক অভিব্যক্তি ইতালির কয়েকটা প্রদেশে আত্মপ্রকাশ করেছে। যা সরকারকে তার দৈনন্দিন কাজ চালিয়ে যাওয়ার পথে নিয়মিত ব্যাঘাত ঘটিয়ে চলেছে। যারজন্য দেশ বর্তমানে গভীর সংকটে পড়েছে।

সরকার আপ্রাণ চেষ্টা করছে যাতে পরস্পরের মধ্যে একটা বোঝাপড়ায় আসা যায়। এই সমস্যার শান্তিপূর্ণ একটা সমাধানের পথ খুঁজে বার করা সম্ভব হয়। বিদ্রোহের মুখোমুখি সরকার জনসাধারণের জীবনযাত্রা নিরুদ্বিগ্নে চালানোর চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। তা সে যে কোন উপায়ে বা মূল্যে-ই হোক না কেন। যদিও বর্তমানে সরকার পদত্যাগ করেছে, তবু প্রতিটি নাগরিকের সুরক্ষার সঙ্গে সংসদীয় অনুশাসন বজায় রাখতে সরকার বদ্ধপরিকর।

ইতিমধ্যে নাগরিকবৃন্দকে অনুরোধ করি শান্ত থাকতে এবং সুরক্ষার জন্য যেসব ব্যবস্থা সরকার নিয়েছে তা' মেনে চলতে।

ইতালি দীর্ঘজীবি হোক। রাজা দীর্ঘজীবি হোন।

স্বাক্ষর ঃ

ফ্যাক্টো, সান্‌জের, আমেনডোলা, টাট্‌ডাই, অ্যালেসিও, বারটোনে, প্যারাটোরে, সোলেরী, ডি ভিটো, অ্যানিলে, রিসিও, বারটিনি, রোসি, ডেলো বারবা, ফুলর্চি, লুসানি।

দেশের অবস্থা দেখে মন্ত্রীরা তাদের দপ্তরগুলোর দায়িত্বভার ফ্যাক্টোর ওপরে চাপিয়ে দেয়। আর এই ব্যক্তি রোমের কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে পরামর্শ করে মার্শাল ল' বা সামরিক আইন জারী করার ব্যবস্থা করে। কিন্তু রাজা ফ্যাক্টোর মার্শাল য জারী করার প্রস্তাবে স্বাক্ষর করতে সোজাসুজি অস্বীকার করে বসে বিজ্ঞজনের কাজ করে।

সম্রাট বুঝেছিলেন কালো সার্টদের এই বিদ্রোহ তিন বছরের সংগ্রাম এবং সংঘর্ষের ফল। তিনি আরো উপলব্ধী করতে পেরেছিলেন এক দলীয় জয়-ই নাগরিক জীবনে স্বস্তি, শান্তি ডেকে আনতে পারবে। শৃঙ্খলা এবং উন্নতির পথে জাতিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সমর্থ হবে। ইতালির জনগণের মধ্যে ফিরে আসবে সুস্থ জীবনের ছন্দবদ্ধতা।

রক্ষণশীল সংবিধানের প্রতি শ্রদ্ধাবশত সম্রাট ফ্যাক্টোকে সংবিধান অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে বলে। তখনই পরস্পরের মধ্যে আলাপ-আলোচনা, তর্ক-বিতর্ক, পদত্যাগ ইত্যাদি ব্যাপারগুলো শুরু হয়। ঠিক সেই মুহূর্তে এমন একটা ধূর্তামী পূর্ণ কাজ করা হয় যা আমার কাছে প্রচণ্ডরকমের অশুভ বলে মনে হয়েছিল। ডানপন্থী ন্যাশানাল পার্টি যাদের

সঙ্গে সংগ্রামের ধারা ছাড়া বা অন্য ব্যাপারগুলোতে ফ্যাসিষ্টদের সঙ্গে যথেষ্ট মিল ছিল, তারা প্রতিনিধি পাঠিয়ে একান্ত নিজেদের জন্য কিছু দাবী জানায়।

ন্যাশানাল পার্টি মনে করে পরিস্থিতির চাবি কাঠিটাই ওদের হাতে রয়েছে। তাই সেই দলের প্রতিরূপ একজন প্রতিনিধি সালানড্রা নিজের পিঠে ক্ষমতার বোঝাটা তুলে নিতে চায়। ওর ধারণায় এর দ্বারা ফ্যাসিষ্ট দলকেও সাহায্য করা হবে। ওদের এই প্রস্তাবে আমি সঙ্গে সঙ্গে তীক্ষ্ণ কণ্ঠে প্রতিবাদ জানাই। কারণ ব্যাপারটা তা'হলে বোঝাপড়া এবং ভুলের সামিল হয়ে দাঁড়াবে। ফ্যাসিজিম হাতে অস্ত্র তুলে নিয়ে জাতীয় জীবনের স্নায়ুকেন্দ্র গুলোতে দাপিয়ে বেড়াচ্ছে। দলের লক্ষ্যও স্থির। সংসদীয় পথও একটা ইতিমধ্যে বেছে নিয়েছে। সুতরাং বিজয়ের পথে কিছুতেই আর ভেজাল মেশানো উচিত হবে না। আর এটাই ছিল ওদের কাছে আমার সোজাসুজি উত্তর যে কিছুতেই কোনরকম বোঝাপড়ায় আসা সম্ভব নয়।

আমি যে ধ্যান-ধারণা নিয়ে শুরু করেছিলাম, সংগ্রাম সেই পথ ধরেই এগিয়ে চলে। তবে সেদিনগুলোর বিপ্লবের প্রতিটি ঘটনা জীবনপঞ্জীতে লেখা সম্ভব নয়। কারণ হলো পরিসর। তবে স্পষ্ট স্মরণে আছে প্রতি ঘন্টায় আমি আরো বেশি করে ইতালির রাজনৈতিক অবস্থার দখল নিচ্ছিলাম। বিরোধীপক্ষ শুধু ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ে নি, পুরো ব্যাপারটাতেই হতোভম্ব এবং নির্বাকও হয়ে পড়েছিল। ফ্যাসিষ্টরা ইতিমধ্যে প্রায় রোমের দরজায় পৌঁছে গেছে। অপেক্ষা করছে যে কোন মুহূর্তে সামরিক বিভাগের চীফ হিসেবে আমার উপস্থিতি। যাতে সবাই মিলে রাজধানীতে প্রবেশ করা যায়।

২৯ তারিখ শেষ দুপুরে আমি রোম থেকে অত্যন্ত জরুরী একটি টেলিফোন পাই। জেনারেল সিটাডিনি, সম্রাটের এইড-দ্য-ক্যাম্প আমাকে অনুরোধ জানায় সত্বর রোমে আসতে। সম্রাটের তরফের বিনীত অনুরোধ। কারণ সম্রাট চান যে আমি মন্ত্রীসভা গঠন করে তার দায়িত্ব ভার নেই। আমি জেনারেল সিটাডিনিকে ওর টেলিফোনের জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে অনুরোধ করি যে এই বিষয়ে আমাকে জরুরী একটা টেলিগ্রাম পাঠাতে। কারণ এটা সবারই জানা যে এই পরিস্থিতিতে টেলিফোনে অনেকে নোংরা খেলাও খেলতে পারে। জেনারেল সিটাডিনি প্রথমে আমার অনুরোধের উত্তরে বাধা দিয়ে বলে যে এটা রাজপ্রথার বিরুদ্ধে। তারপর অস্বাভাবিক পরিস্থিতির দোহাই দিয়ে টেলিগ্রামের মাধ্যমে আমাকে নিমন্ত্রণ পাঠাতে রাজী হয়। সত্যি বলতে কি কয়েক ঘন্টা পরেই জরুরী সংবাদটা আমার কাছে এসে পৌঁছায়। ব্যক্তিগত চিঠি ছিল এটা। অন্তত চিঠিটার চরিত্র অনুধাবন করলে তাই মনে হয়। যাইহোক চিঠিটা ছিল ঃ

মুসোলিনি, মিলান।

সম্রাট আপনাকে যতো সত্বর সম্ভব রোমে আসার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছে। কারণ সম্রাট আপনাকে মন্ত্রীসভা গঠনের দায়িত্বভার তুলে দিতে চান।

শ্রদ্ধাসহ।

জেনারেল সিটাডিনি।

যদিও এটাকে জয় বলা যায় না, তবু প্রগতির পথে বিরাট একটা পদক্ষেপ তো বটে। আমি সোজাসুজি বিপ্লবের সদর দপ্তর পেরুজিয়াতে এবং শহর মিলানের ব্ল্যাক সার্ট দলের

সঙ্গে সংযোগ করে খবরটা দেই। পোপোলো দ্য ইতালিয়ার বিশেষ সংস্করণ প্রকাশ করে তা'তে ইতিমধ্যে সম্রাটের যে নিমন্ত্রণ আমি পেয়েছি, তা'ও বিস্তারিত লিখি।

আমার মনের ওপর দিয়ে তখন প্রচণ্ড ঝড় বয়ে চলেছে; প্রতিটি স্নায়ু এই বিষম টানাপোড়ানিতে ক্লান্ত, উত্তেজিত। রাতের পর রাত জেগে আমাকে বিভিন্ন আদেশ জারী করতে হয়েছে। ফ্যাসিস্ট মতবাদ সম্পর্কে পত্রিকায় লেখা থেকে শুরু করে ফ্যাসিজিম প্রতিষ্ঠার জন্য প্রতিটি সংগ্রাম ধাপে ধাপে এগিয়ে নিয়ে গেছি।

তবে তারচেয়েও অনেক বড় দায়িত্ব ভার আমাকে শীঘ্রই মাথায় তুলে নিতে হবে। সুতরাং কোনরকমেই আমার কর্তব্য বা লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত হওয়া চলবে না। যারা এই সংগ্রামের পথে মারা গেছে, তাদের স্মৃতি-ই আমাকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। ঈশ্বরের কাছে আমি সাহায্য প্রার্থী। যারা বিশ্বাস করে আমাকে নিয়মিত সাহস এবং শক্তি জুগিয়ে গেছে, তারাই আমাকে এই বিশাল দায়িত্ব ভার বহন করতেও নিশ্চয়ই সাহায্য করবে।

১৯২২ সালের ৩১ শে অক্টোবর রাত্রে আমি এক আদেশ বলে, সংগ্রামী পত্রিকা পোপোলো দ্য ইতালিয়ার কার্যভার আমার ভাই আরনালডোর ওপরে ন্যস্ত করি। ১লা নভেম্বর পত্রিকাতে নীচের বিজ্ঞপ্তীটা প্রকাশিত হল ঃ

আজ থেকে পোপোলো দ্য ইতালিয়ার সম্পূর্ণ পরিচালন ভার আরনালডো মুসোলিনির ওপরে ন্যস্ত করা হলো।

আমি সেলাম জানাই এবং ধন্যবাদ দেই, সেইসব সম্পাদক, সহযোগী, সাংবাদিক, কর্মী, শ্রমিক এবং অন্যান্য সবাইকে যারা তাদের অক্লান্ত পরিশ্রম এবং অটুট বিশ্বাস যোগ্যতায় এই পত্রিকাকে প্রকাশিত হ'তে সাহায্য করেছে। তারা এই পত্রিকার মাধ্যমে আমাদের দেশকেই ভালোবাসা জানিয়েছে।

মুসোলিনি।

রোম। ৩০ শে অক্টোবর, ১৯২২।

অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে যে পত্রিকাটার পরিচালন ভার থেকে আমাকে সরে আসতে হয়, তা' বোধহয় বলার অপেক্ষা রাখে না। কারণ আমাদের জয়ের পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে পত্রিকাটার সহযোগীতা এবং সাহায্য ছিল অনস্বীকার্য। তবে এটাও স্বীকার করা ভুল হবে না যে আমার ভাই আরনালডো যথেষ্ট যোগ্যতা এবং আভিজাত্যের সঙ্গে পত্রিকাটা সম্পাদনা করে গেছে।

ভাইয়ের হাতে পত্রিকাটার পরিচালন ভার দিয়ে আমি যাই রোমে। রাজার সঙ্গে আলোচনার জন্য। ঈর্ষাবশত কিছু লোক পরামর্শ দেয় আমি যেন বিশেষ একটা ট্রেনে যাই। কিন্তু আমি বলি আমার জন্য নিয়মিত ট্রেনের একটা কমপার্টমেন্ট-ই যথেষ্ট। ইঞ্জিন এবং কয়লার অপব্যবহার করাটা উচিত হবে না। অযথা অপব্যয়ের কোন প্রয়োজন নেই। সরকারে যাওয়া একটা মানুষের এটাই প্রথম কষ্টিপাথরে যাচাই। সান্টা মেরীনেলের কালো সার্টের অধিনায়ক হয়ে রৌদ্রস্নাত রাজধানীতে আমি শেষ পর্যন্ত প্রবেশ করি।

আমার যাত্রার খবর সারা ইতালিতে ছড়িয়ে পড়ে। আকাশ ভেঙে বৃষ্টি নেমেছিল সেদিন। কিন্তু মুষলধারে বৃষ্টির মধ্যেই প্রতিটি ষ্টেশনে গিজ গিজ করেছে ফ্যাসিস্ট আর সাধারণ জনগণ। ওদের শুভেচ্ছা আর উল্লাস যেন আমাকে ভাসিয়ে নিয়ে যায়।

মিলান ছেড়ে যাওয়া অত্যন্ত দুঃখের ব্যাপার। এই শহরেই দশ বছরের ওপরে আমার বসবাস। এবং সেই দিনগুলোতে দুঃখ-কষ্ট থাকলেও আনন্দের ভাগ-ই বেশি ছিল। যা আমাকে যথেষ্ট আত্মপ্রসাদ দিয়েছে। টানা পোড়ানির দিনগুলোতে যেরকম আমাকে সঙ্গ দিয়েছে, তেমনি ফ্যাসিজিমের জন্য উপহারও দিয়েছে একদল তরতাজা অ্যাক্‌সান স্কোয়াড্। যারা তাদের কাজ নিপুণভাবে করে গেছে। ঐতিহাসিক রাজনৈতিক সংগ্রামের সাক্ষীও এই শহর। নিয়তির আদেশে আরো অনেক বেশি দায়িত্ব নিয়ে আমাকে মিলান ছেড়ে চলে যেতে হচ্ছে। মিলানের সমস্ত অধিবাসী-ই আমার এই চলে যাওয়ার খবর জানে। বিজয়ের পথে এই যাত্রা হলেও কোথায় যেন বেদনার একটা ছায়া জড়িয়ে রয়েছে এই যাত্রার সঙ্গে।

তবে এটা কিন্তু আবেগে মথিত হওয়ার মুহূর্ত নয়। কারণ এখন যেটা সবচেয়ে দরকারী তা'হলো সত্বর এবং যতোখানি সম্ভব সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময়। নিজের পরিবারের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে প্রচুর সংখ্যায় উপস্থিত মিলানের গণ্যমান্য নাগরিকদের শুভেচ্ছা জানাই। তারপর রাতের অন্ধকার ভেঙে চলা ট্রেনের গদীতে নিজেকে সঁপে দেই। যাতে নিজের সঙ্গে শুধু নয়, বন্ধুদের কণ্ঠস্বরের প্রতিধ্বনি এবং আগামীকালের বিশাল দিগন্তের সঙ্গে বোঝাপড়া করতে পারি।

সেই যাত্রাপথের ছোটখাটো ঘটনা এবং দিনগুলো আমার জীবনে খুব একটা গুরুত্বপূর্ণ নয়। ট্রেনটা আমাকে একেবারে ফ্যাসিষ্টদের মধ্যে নিয়ে আসে; সান্টা মেরীনেলা থেকে রাজধানী শহর রোম নজরে পড়ে। পত্রিকায় যেসব বক্তব্য রাখবো, সেগুলোকে ঝালিয়ে নেই। রোমে ঢোকার পরের আদব কায়দাগুলোকেও স্মরণে আনি। তারপর কর্তৃপক্ষ এবং কোয়াড্রিমভিরাতের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করি।

আমার উপস্থিতি ওদের আগ্রহ এবং উৎসাহকে যেন দ্বিগুণ বাড়িয়ে দেয়। ওদের চোখে দেখি আদর্শের জয়ে উদ্‌ভাসিত এক স্বর্গীয় হাসি। ওদের সঙ্গে নিয়েই আমি ইতালির শাসক শ্রেণীর বিরুদ্ধে সংগ্রামে নেমেছিলাম। আর যে কোনরকম শত্রুর বিরুদ্ধে ওদের পাশে পেলে সাফল্যের সঙ্গে সংগ্রাম করা সম্ভব।

রোমে আমার জন্য অবর্ণনীয় অভ্যর্থনা অপেক্ষা করছিল। আমি কোনরকম দেরী করার পক্ষপাতী ছিলাম না। এমন কি আমার রাজনৈতিক বন্ধুদের সঙ্গে সংযোগ স্থাপনের আগেই মোটরে চড়ে সোজা রাজপ্রাসাদে গিয়ে হাজির হই। আমার পরণে ছিল কালো সার্ট। বাহ্য কোনরকম শিষ্টাচার ছাড়াই রাজার সঙ্গে পরিচিত হই। ষ্টেফানি এজেন্সী এবং সারা পৃথিবীর বিখ্যাত সব পত্র-পত্রিকাতেই আমার এই সাক্ষাৎকারের বিস্তারিত বর্ণনা প্রকাশিত হয়। অবশ্য যেরকম সাদরে অভ্যর্থনা আমাকে দেওয়া হয়েছিল, সেই সব বর্ণনার বিস্তারে গিয়ে আমার এই লেখা ভারাক্রান্ত করতে চাই না। কোনরকম রাখ ঢাক না রেখে সোজা ইতালিতে কিভাবে শাসন কাজ চালাবো সেই ব্যাপারটার বিস্তারে আসি। সর্বময় সম্রাটের অনুমোদনও পাই এই বিষয়ে। তারপর সভ্যয় হোটেলে বসবাসের জন্য উঠে কাজকর্ম শুরু করি; প্রথমেই সেনাপ্রধানের সঙ্গে আলোচনার পর মিলিশিয়াদের রোমে নিয়ে আসার ব্যবস্থা করি। এবং রাজার সঙ্গে পরামর্শের পর ওদের যথাস্থানে জায়গা করে দেই। সব সময়েই আমি বিস্তারিত এবং নিখুঁত আদেশ দিয়েছি। রাজার সামনে এক লক্ষ কালো সার্ট পরিহিত ফ্যাসিষ্ট মিলিশিয়া প্যারেডে অংশ নেয়। রাজার প্রতি প্রথম শ্রদ্ধা এই ভাবেই ফ্যাসিষ্ট ইতালি জ্ঞাপন করে।

আমি তখন বিজয়ীর বেশে রোমে। আমার সম্মানে অপ্রয়োজনীয় সমস্তরকম অনুষ্ঠান, মিছিল ইত্যাদি বন্ধ করে দেই। সঙ্গে সঙ্গে আদেশ দেই যে জেনারেল ফ্যাসিস্ট কমাণ্ডের অনুমতি ছাড়া কোনরকম প্যারেড করা চলবে না। কারণ প্রথম থেকেই আমার পরিকল্পনামাফিক শক্ত হাতে শৃঙ্খলা বজায় রেখে চলার ব্যাপারটা সবাইকে শেখাতে হবে।

আমাকে সম্মান দেখানোর জন্য সৈন্যদলের অফিসাররা যে অনুষ্ঠান করায় উৎসাহিত হয়েছিল, আমি তাদের সেই উৎসাহে জল ঢেলে দেই। কারণ আমার ধারণায় সৈন্যদলকে সব সময়েই রাজনীতির বাইরে এবং ঊর্ধে রাখা উচিত। আমার চিন্তায় সৈন্যদের মধ্যে সদাসর্বদা তীক্ষ্ণ শৃঙ্খলা বজায় রাখাটা অত্যন্ত জরুরী। শুধু সতর্কতার সঙ্গে সীমান্তরক্ষা এবং ঐতিহাসিক দাবীগুলোর ব্যাপারেই সৈন্যবাহিনীর নিয়োজিত থাকা উচিত। সৈন্যবাহিনী নিজেই একটি প্রতিষ্ঠান এবং যে কোন মূল্যে এই প্রতিষ্ঠানকে অটুট রাখা সঙ্গত। ওদের নিজেদের উৎসর্গের ব্যাপারে এমন কিছু করা ঠিক নয় যাতে অখণ্ডতা ভঙ্গ হয়।

কিন্তু অন্যান্য অনেক জটিল সমস্যা তখন আমার সামনে। আমি রোমে এসেছি শুধু নতুন মন্ত্রীসভা গঠনের উদ্দেশ্য নিয়ে নয়, ইতালির জনসাধারণের জীবন যাতে একেবারে নীচু তলা থেকে গড়ে তোলা যায় সেই প্রচেষ্টার শুরু করার জন্য আমার মানসিক দৃঢ়সংকল্পতা আগে থেকেই ছিল। নিজের কাছেই নিজে শপথ নিয়েছিলাম যে ওদের আমি উন্নততর জীবনযাত্রার পথে যতো শীঘ্র সম্ভব এগিয়ে নিয়ে যাবে।

দেশের প্রতি আমার উৎসর্গীকৃত মনটাকে শহর রোম যেন আরো ধারালো আর তীক্ষ্ণ করে দেয়। চিরন্তন শহর কাপিট মুণ্ডিতে দু'টো কোর্ট এবং দু'টো কূটনৈতিক অফিস রয়েছে। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে রাজকীয় বাহিনী চার দেওয়ালের মধ্যেই পরাস্ত হয়েছে। এই শহর প্রত্যক্ষ করেছে পৃথিবী ব্যাপি সভ্যতা এবং সুচিন্তার ঢেউগুলো কী ভাবে দিনের পর দিন ক্ষয়িষ্ণু হয়ে গেছে। রোম হলো রাজা, যুবরাজ এবং নেতাদের অভীপ্সিত শহর। সার্বজনীনও বটে। বহু পুরনো সাম্রাজ্য এবং খৃষ্টধর্মের এক শক্তিশালী উৎসস্থল। রোম আমাকে জাতীয় লিজিয়েন হিসেবে অভ্যর্থনা জানিয়েছিল। পার্টি বা দলীয় প্রতিনিধি বলে নয়। গভীর বিশ্বাস এবং সমগ্র ইতালির প্রতিনিধি হিসেবেই আমাকে এই সম্মান জানানো হয়েছিল।

দলের এবং সরকারের একজন হয়ে দীর্ঘদিন কাজকর্মের ব্যাপারে নিজেকে নিমগ্ন রেখেছি। এমন কি এইসব চিন্তাধারা দিনের বেলাতে হাঁটা চলার সময় যেমন, তেমনি রাত্রে ঘুমের মধ্যেও আমাকে কুড়ে কুড়ে খেয়েছে। বলাবাহুল্য আমি এই যুদ্ধে জিতেছি; চেষ্টা করলে আরো বেশি অগ্রসর হ'তে পারতাম। যুদ্ধের সময়কার বিশ্বাসঘাতকরা—যারা নিয়ত ফ্যাসিজিমকে যূপকাষ্ঠে চড়িয়েছে, শান্তির সময়েও ইতালির সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে, তাদের পেরেক মেরে দেওয়ালের সঙ্গে গেঁথে দিতে পারতাম।

দুঃখজনক ঘটনাগুলো তখন চারপাশের আবহাওয়াটাকে ভারী করে তুলেছে। বিষণ্নতায় ভরিয়ে দিয়েছে। আমি প্রায় তিন লক্ষ কালো সার্টকে জমায়েত করেছিলাম। যারা আমার একটা আঙুলি হেলানোয় ছুটে যেতো ঘটনাস্থলে। যে কোন ব্যাপারেই তাদের ব্যবহার করা যেতো। শুধু রাজধানীতেই সশস্ত্র যাট হাজার ফ্যাসিস্ট যে কোনরকম হামলা চালানোর জন্য অপেক্ষা করতো। রোম দখল নেওয়ার জন্য যে যাত্রা, সেটা যে কোন মুহূর্তে আগুন জ্বলে উঠে শোকাবহ পরিণতি নিতে পারতো; যদি আধুনিক বা অতীতের কোন বিদ্রোহ হ'তো,

তবে রাস্তাঘাট রক্তের বন্যায় ভেসে যেতো। সেই মুহূর্তে শান্ত সংযত চিত্তে এমন ভাবে রোম দখলের যাত্রাকে নিয়ন্ত্রণের মধ্যে রাখতে হয়েছে যাতে আমাদের এই দুঃসাহসিক অভিযান তার স্থির লক্ষ্যে পৌঁছতে পারে।

আমি ইচ্ছে করলেই একনায়কতন্ত্র শাসন ব্যবস্থার কথা ঘোষণা করতে পারতাম। এবং সেই শাসন ব্যবস্থায় শুধুমাত্র ফ্যাসিষ্টদের নিয়েই মন্ত্রীসভা গড়তেও কোন বাধা ছিল না। কনভেনসানের সময় ফ্রান্সে ডাইরেক্টারী শাসন ব্যবস্থার প্রবর্তন করা হয়েছিল। তবে চরিত্রের দিক থেকে ফ্যাসিষ্ট বিপ্লব ছিল অনবদ্য। অতুলনীয়। যার সঙ্গে অতীতের কোন বিপ্লবের তুলনা-ই চলে না। অন্যান্য বিপ্লবের থেকে ফ্যাসিষ্ট বিপ্লব ছিল সবদিক থেকেই আলাদা। এই বিপ্লবের স্থির লক্ষ্য আইন অনুসারী পরম্পরা আর চেহারাতেও। যারজন্য জমায়েত যে স্বল্পস্থায়ী হবে সেটাও জানতাম।

আমি কখনো ভুলি নি যে একদিকে যেমন সংসদ রয়েছে, অন্যদিকে রয়েছে মন্দমতির একদল ডেপুটি, যারা অতীতের হিংস্রতা নিয়ে আমাকে সব সময় ফাঁদে ফেলার চেষ্টায় সম্পূর্ণভাবে নিজেদের নিয়োজিত রেখেছে। একমাত্র ভয়-ই ওদের দমিয়ে রাখতে সমর্থ হয়েছে। মোহভঙ্গ হওয়া সিনেটারদের ভয়ে শৃঙ্খলবদ্ধ করতে সমর্থ হলেও ওদের কাছ থেকে কোনরকম সহযোগীতা পাওয়া সম্ভব নয়। বিশেষ করে ইতালির উন্নতির ব্যাপারগুলোয়। রাজাও আমার প্রতি তীক্ষ্ণ নজর রেখে চলেছেন যে কী ভাবে আমি সংসদীয় আইন কানুন মেনে চলেছি।

পোপ যেমন উদ্বিগ্নতার সঙ্গে ঘটনা গুলোকে পর্যবেক্ষণ করে, অন্যান্য জাতিরা তেমনি এই বিপ্লবের বিরোধীতা না করলেও সন্দেহের চোখে দেখে। বিদেশী ব্যাংকররা খবরাখবর নেওয়ার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়ে। বিনিময় যোগ্য মুদ্রা মানের অস্থির অবস্থা, ক্রেডিট টলমল। সবাই অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে কখন পরিস্থিতির উন্নতি হবে। তবে সবচেয়ে যেটা জরুরী ছিল তা'হলো নতুন সরকারের স্থায়িত্ব।

আমাকে বারে বারে সব কিছু খুঁটে খুঁটে পরীক্ষা করতে হয়েছে। তার ভবিষ্যত্ প্রতিফল কি হ'তে পারে তা' নিয়েও চিন্তাভাবনা কম করি নি। পর পর বেশ কয়েক রাত ঘুমাতেও পারি নি। তবে সেই রাতগুলো কিন্তু কেটেছে চিন্তাভাবনা আর কাজকর্মের ভেতর দিয়ে। সরকারের দায়িত্বভার নেওয়ার চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে আমার কাজের বহর মন দিয়ে দেখলেই তার প্রমাণ পাওয়া যাবে।

প্রতিটি বিপ্লবের একটা আলাদা সত্বা এবং চরিত্র আছে। যার থেকে বিশেষ সমস্যার উদ্ভব হয়। বিশাল জনতার মানসিক চাপ এবং নিঃস্বার্থ নেতাদের জনসাধারণের জন্য উৎসর্গ করার উন্মুখতা ছাড়াও আরো দু'টো চরিত্র হলো—অ্যাডভেঞ্চার এবং বিষণ্ণ বুদ্ধিজীবিদের বিপ্লবের ব্যাপারে কঠোর তপস্যা আর বাক্যবিন্যাসসহ তাদের প্রকাশের ধারা বা ঢঙ। বিপ্লবের সময় জনসাধারণ বেশির ভাগ ক্ষেত্রে তাড়িত হয় কোন মহান ঐতিহাসিক বা সামাজিক বাস্তবতাকে সামনে রেখে। আর নতুন দল এই সত্যকে সামনে রেখেই শৃঙ্খলার সঙ্গে কঠোর পরিশ্রম করে চলে। স্বার্থহীন নেতারাই পারে কিন্তু শাসকদলের আভিজাত্য বজায় রাখতে ; তবে এই কঠোর তপস্যায় রত এবং অ্যাডভেঞ্চার প্রিয় নেতারা বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই শাসকদলের ওপরে মৃত বোঝার ভারের সৃষ্টি করে। কারণ প্রথম দল তো চায় যে রাতারাতি সব মূল্যবোধকে জাগিয়ে তুলতে ; যাতে একটা ত্রুটিও কোথাও না থাকে।

ওরা কিছুতেই বুঝতে চায় না যে কোন বিপ্লবই মানুষের অন্তর্নিহিত চরিত্র বদলাতে পারে না। ওদের অলীক কল্পনার জন্যই ওরা কখনো আত্মতুষ্টি পায় না। যখন একান্ত এগিয়ে যাওয়ার নিতান্ত প্রয়োজন, তখন ওদের চিন্তাধারা অনর্থক চারপাশের মানুষগুলোর শক্তি ক্ষয় করে। আর অ্যাডভেঞ্চার প্রকৃতির নেতারা বিপ্লবের ভবিষ্যতের সঙ্গে নিজের ভবিষ্যতও মিলিয়ে মিশিয়ে ফেলে। বিপ্লবের শেষে ওরা নিজের আখের গোছাতে আগ্রহী হয়ে পড়ে —আর তা'তে কৃতকর্ম না হলেই চরম এবং বিপদজনক পথ বেছে নেয়।

যাইহোক আমাকে কঠোর যোগী এবং অ্যাডভেঞ্চার প্রিয় বিপ্লবীদের হাত থেকে বর্তমানে এই ফ্যাসিষ্ট বিজয়কে রক্ষা করতে হবে। তবে ফ্যাসিষ্ট বিপ্লব অন্য বিপ্লবের চেয়ে শুধু আলাদা চরিত্রের-ই ছিল না, অনেক উচ্চ ভূমিতে অবস্থানের জন্য অ্যাডভেঞ্চার প্রিয় বিপ্লবীরা আগেই সেই স্রোতে ডুবে গেছে। তবে প্রতিটি অবশ্য কর্তব্য কাজগুলো আমাকে মেপে মেপে অতি সতর্কতার সঙ্গে করতে হ'তো। যাতে একটা পদক্ষেপও ভুল না হয়।

প্রথম হলো ঘটনা প্রবাহের চাপ। আমি চাই দেশ একটা নিয়মিত শৃঙ্খলাবোধের মধ্যে আসুক এবং যতো সত্বর সম্ভব নতুন সরকার গঠিত হোক। আর এই ব্যাপারে অতি শীঘ্র আদেশও জারী করে দেই। এদিকে ওদিকে বিক্ষিপ্ত দু' একটা সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। অবশ্য এই পরিস্থিতিতে এটা খুবই স্বাভাবিক বলা চলে। আমি ফ্যাক্‌টোকে নিরাপত্তা দেওয়ার প্রয়োজন বোধ করে দশজন কালো সার্টকে ডেকে পাঠাই। এই দশজনের কিন্তু প্রাণের ভয় বলতে কিছু ছিল না। বরং জীবনপণ করা সাহসী ছিল ওরা। ওদের আদেশ দেই যে ফ্যাক্‌টোকে পাহারা দিয়ে ওর নিজের শহর পিনেরোলে পৌঁছে দিয়ে আসতে। হ্যাঁ, যথেষ্ট সম্মানের সঙ্গে। ওরা কিন্তু আমার আদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছিল। আমার আদেশ ছিল যে কোনরকম পরিস্থিতিতেই যেন ফ্যাক্‌টোর চুল কেউ স্পর্শ করতে না পারে। অপমান বা লাঞ্ছনা দূরে থাক। কারণ ফ্যাক্‌টো তার একমাত্র সন্তানকে দেশের কাজে উৎসর্গ করেছে, যে যুদ্ধের সময় বিমান দুর্ঘটনায় মারা যায়। আর তারজন্য-ই ফ্যাক্‌টোর এই সম্মান পাওয়া উচিত। এবং যোগ্যও বটে।

বিরোধী দলের নেতাদের ওপরে কোনরকম প্রতিহিংসা নিতে দেই নি। আমার বিরাট বিধিসংগত ক্ষমতার দৌলতে আমি কোনরকম ধ্বংসাত্মক কাজে কাউকে লিপ্ত হ'তে বারণ করি। শুধু কাগজে কলমে এই আদেশ দিয়েই ক্ষান্ত থাকি নি—বাস্তবেও তা' ঘটিয়েছি। এমন কি আমার অতি শত্রুদের ক্ষেত্রেও আমার এই আদেশ প্রযোজ্য ছিল। মোদ্দাকথা তাদের চামড়া বাঁচিয়েছি। সঙ্গে সঙ্গে কয়েক ঘন্টার তফাতে নতুন মন্ত্রী পরিষদও গঠন করি। আমি কিন্তু প্রথমেই ফ্যাসিষ্ট একনায়কতন্ত্রকে বাতিল করি, কারণ আমি দেশকে দলীয় স্বার্থের ওপরে তুলে নিয়ে গিয়ে একটা স্বাভাবিক এবং সুন্দর জীবনযাত্রা দিতে চেয়েছিলাম। সেই সংকটপূর্ণ মুহূর্তগুলোতেও আমি কিন্তু আমার মানসিক ভারসাম্য হারাই নি। সবদিক ভেবেচিন্তে শেষে ঠিক করি যে এমন একটা মন্ত্রীপরিষদ গঠন করবো যা চরিত্রগতভাবে জাতীয় সরকার বলে গণ্য হবে।

কেন যেন আমার মনে হ'তো ভবিষ্যতে শোধনবাদের প্রক্রিয়া শুরু করাটা অনিবার্য হয়ে পড়বে। তাই কাজটা প্রথম থেকে রাজনৈতিক স্বতঃস্ফূর্ত ঘটনাবলীর মাধ্যমেই শুরু করে দেই।

তবে ইতালির পুরনো রাজনৈতিক দল এবং নেতাদের প্রতি এটাই ছিল আমার সবিশেষ উদারতা দেখানো।

মন্ত্রী পরিষদের পূর্ণ এবং প্রতিমন্ত্রীদের মধ্যে পনেরো জন ফ্যাসিষ্টদের রেখেছিলাম। তিনজন ন্যাশানালিষ্ট, তিনজন ডানপন্থী লিবারেল, ছ'জন পপুলার আর বাকী তিনজন স্পেশাল ডেমোক্র্যাট। সত্যি বলতে কি মাত্র কয়েকদিন আগেই ওরা ফ্যাসিষ্ট বিপ্লবের থেকে ফয়দা তুলতে চেয়েছিল, তবু ওদের প্রতি যথেষ্ট পরিমাণে সহৃদয়তা আমি দেখিয়েছি। পপুলার এবং সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটদের মধ্যে থেকে তাদেরই বেছে নিয়েছিলাম—যারা জাতীয় শক্তিকে উদ্‌জীবিত করবে এবং সোশ্যালিষ্টদের সঙ্গে মিশে পেছন থেকে ছুরি মারবে না।

আমি নিজেকে মন্ত্রী পরিষদের সভাপতি হিসেবে ঘোষণা করি এবং অন্তর্দেশীয় আর বহির্দেশীয় সংক্রান্ত সব গুরুত্বপূর্ণ দপ্তরগুলোই আমার অধীনে রাখি। আরমান্‌ডো দিয়াজকে যুদ্ধ সংক্রান্ত দপ্তরের ভার দেই। শুধু তাই নয়, ওকে আরো প্রতিশ্রুতি দেই যে দেশের যোগ্য সৈন্যদল ওকে দেবো। আর সেই সৈন্যদলের মান হবে বিজয়ী ভিটোরিও ভেনিতো সৈন্যবাহিনীর চেয়ে কোন অংশে কম নয়। অ্যাডমিরাল থন ডি রেভেলকে ডেকে ওকে নেভীর ভার নিতে বলি। ফেডারজনীর ওপরে ভার পড়ে ইতালির কলোনীগুলোর দেখভালের দায়িত্ব।

নতুন গঠিত মন্ত্রীসভার বিস্তারিত নীচে দেওয়া হলো।

মন্ত্রী ঃ

বেনিতো মুসোলিনি, মন্ত্রী পরিষদের সভাপতি। অন্তর্দেশীয় এবং বিদেশ সংক্রান্ত যে কোন বিষয়ের ভারপ্রাপ্ত। ফ্যাসিষ্ট। আরমান্‌ডো দিয়াজ, আর্মি জেনারেল, যুদ্ধ সংক্রান্ত। পোয়ালো থন ডি রেভেল, অ্যাডমিরাল, সেনেটার, নেভী, লুইগি ফেডারজোনী, মন্ত্রী, উপনিবেশগুলোর ভারপ্রাপ্ত।

ন্যাশানালিষ্ট।

আলডো অভিগলিও, মন্ত্রী। বিচার বিভাগীয়। ফ্যাসিষ্ট আলবার্তো ডি ষ্টেফানি, মন্ত্রী, অর্থদপ্তর। পপুলারে। জিওভানি জেনটাইল। অধ্যাপক। পাবলিক ইনস্ট্রাকসান

ভেনসেনজো টানগোরা। মন্ত্রী। রাজস্ব বিভাগ। দক্ষিণপন্থী লিবারেল।

পপুলারে।

গাব্রিয়েলো কারনাজা। মন্ত্রী। পাবলিক ওয়াকাস।

ডেমোক্র্যাট।

জিয়ুসেপি কি কাপিতানি। মন্ত্রী। কৃষ্টিদপ্তর দক্ষিণপন্থী লিবারেল।

টিয়োফলি রোসি। সেনেটর। শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তর।

ডেমোক্র্যাট।

ষ্টেফানো কাভাজ্‌কোনী। মন্ত্রী। ওয়াকার্স এবং সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার পপুলারে।

জিয়োভানি কলোনা ডি সিজারো। মন্ত্রী। ডাক বিভাগ।

সোশ্যাল ডেমোক্র্যাট।

জিয়োভানি জুরিয়াটি। মন্ত্রী। সদ্য মুক্ত অঞ্চলগুলোর দায়িত্বে।

ফ্যাসিষ্ট।

প্রতিমন্ত্রী ঃ

জিয়াকোমে অ্যাসেরবো। সভাপতি। ফ্যাসিষ্ট।

আল্ডো ফিন্জি। অন্তর্দেশীয়। ফ্যাসিষ্ট।

আরনেষ্টো ভাসালো। পপুলারে। বিদেশ সংক্রান্ত।

কার্লো বোনারডি। যুদ্ধ সংক্রান্ত দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত। সোশ্যাল ডেমোক্র্যাট।

কস্টান্জো সিয়ানো। নেভী এবং বাণিজ্যতরী গুলোর ভারপ্রাপ্ত। ফ্যাসিষ্ট।

আলফ্রেডো রোকো। রাজস্ব বিভাগ। ন্যাশানালিষ্ট।

সিজারে মারিয়া ডি ভিচি। সামরিক সাহায্য বিভাগ। ফ্যাসিষ্ট।

পিয়াত্রো লিসি। অর্থদপ্তর। সোশ্যাল ডেমোক্র্যাট।

জিয়োভানি মার্চি। ঔপনিবেশ সমূহ। দক্ষিণপন্থী লিবারেল।

উমবার্তো মার্লিন। মুক্তাঞ্চল। পপুলারে।

ফুলভিও মিলানি। বিচার বিভাগ। পপুলারে।

ডারিও লুপি। নির্দেশ বিভাগ। ফ্যাসিষ্ট।

লুইগি সিসিলিয়ানি। ফাইন আর্টস। ন্যাশালিষ্ট।

আটাভিও করজিনি। কৃষিবিভাগ। ফ্যাসিষ্ট।

অ্যালেসানড্রো সার্ডি। জনকল্যাণ বিভাগ। ফ্যাসিষ্ট।

মিচেলে তারজার্গি। ডাক এবং তার বিভাগ। ফ্যাসিষ্ট।

গ্রোনচি জিয়োভানি। শিল্প এবং বাণিজ্য সংক্রান্ত দপ্তর। পপুলারে।

সিলভিও জাই। শ্রমিক এবং সমাজ কল্যাণ দপ্তর। ফ্যাসিষ্ট।

মন্ত্রী পরিষদ গঠন সম্পূর্ণ হয়ে গেলে আমি সমরকালীন কাজকর্ম ভেঙে দেওয়ার আদেশ দিয়ে জনসাধারণের উন্নতির কাজে সবাইকে নিয়োজিত হ'তে বলি। যার স্বাক্ষর করেছিল কোয়াড্রিয়ূম ভিরাতে। ইতালির সমস্ত ফ্যাসিষ্টদের উদ্দেশ্যে।

আমাদের আন্দোলন জয়ী হয়েছে। দলের নেতা অন্তর্দেশীয় এবং বৈদেশিক বিভাগের সমস্ত দায়িত্ব নিজের হাতে তুলে নিয়েছে। বিজয়ের মুহূর্তটাকে উপভোগ করার জন্য বাকী দলের সদস্যদেরও সঙ্গে নিয়ে এই সরকার গঠিত হয়েছে। যারা জলে, স্থলে এবং অন্তরীক্ষে অভিযান চালিয়ে আমাদের এই সুদীর্ঘদিনের প্রত্যাশিত বিজয় এনে দিয়েছে। সবাই তারা কিন্তু জাতির উন্নতিকামী।

ইতালির ফ্যাসিষ্ট দলের আরো বড় বিজয় হাসিল করার যোগ্যতা রয়েছে তা'তে কোন সন্দেহ নেই।

তাই সুপ্রিম কোয়ড্রিয়ূম ভিরেতে দলের আদেশ অনুসারে তোমাদের শক্তি, সাহস এবং শৃঙ্খলার জন্য সেলাম জানাচ্ছে। দেশের ভবিষ্যত গড়ে তুলতে তোমরা তোমাদের সর্বশক্তি নিয়োগ করেছো।

তোমাদের এই শৃঙ্খলাবোধ আর সাহস ইতালির নতুন ইতিহাস তৈরি করুক। তোমরা তোমাদের নিজেদের কাজে ফিরে যাও। কারণ ইতালির সোনালি দিনের জন্য বর্তমানে নিষ্ঠা এবং পরিশ্রমের সঙ্গে কাজ করে যাওয়ার প্রয়োজন।

কোন কিছুই আমাদের এই জয়কে এতোটুকু টলাতে পারবে না। কারণ বহু আত্মত্যাগ, আশার মাধ্যমে আমরা এখানে এসে পৌঁছেছি। ইতালি দীর্ঘজীবী হোক। ফ্যাসিজিম দীর্ঘজীবী হোক।

।। দ্য কোয়াড্রিয়ুম ভিরেতে ।।

যাইহোক তারপরে আমি ডি আনুনজিয়োকে একটা টেলিগ্রাম পাঠাই। রাজ্যের সমস্ত উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীদের এবং ছোট ছোট কর্মচারীদের মধ্যেও আমার একটা আদেশ প্রচার করে দেই। তার বয়ান নীচে দেওয়া হলো ঃ

জাতিকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করে শান্তি স্থাপন খুব একটা সহজ কাজ নয়। বরং যথেষ্ট কঠিন ব্যাপার। তাই সবাইকে আমি জানাই আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা যাতে দেশ তার লক্ষ্যে পৌছতে পারে। শৌর্য বীর্য সাহসী ফ্যাসিষ্ট যুবকরাই হলো জাতির ভিত্তিভূমি, তারা কখনোই এই বিজয়ে অন্ধের ভূমিকা পালন করবে না।

।। মুসোলিনি ।।

প্রতিটি দপ্তরে পাঠানো প্রচারিত ইস্তাহার ছিল ঃ

আজ থেকে মহামান্য রাজার আদেশ অনুসারে দেশের শাসন কাজ চালানোর ভার আমি তুলে নিয়েছি। সুতরাং দেশের প্রতিটি উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী থেকে শুরু করে একেবারে নিম্নপদস্থ কর্মচারীদের কাছে আমার দাবী যে তারা বুদ্ধিমত্তা এবং পরিশ্রমের সঙ্গে দেশের স্বার্থকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। আমি যাতে তাদের উদাহরণস্বরূপ সবার সামনে তুলে ধরতে পারি।

।। মুসোলিনি ।। মন্ত্রী পরিষদের সভাপতি এবং অন্তর্দেশীয় দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী।

শেষে ১৬ই নভেম্বর আমি সমস্ত মন্ত্রীদের ডেকে পাঠিয়ে এক সভার আয়োজন করি।

বলাবাহুল্য এই ধরনের মন্ত্রীদের জমায়েত এর আগে আর কখনো হয় নি। হলঘর ভীড়ে উপচে পড়ার অবস্থা। মন্ত্রী এবং প্রতিমন্ত্রী সবাই উপস্থিত হয়েছিল সেই জমায়েতে। আমার বক্তব্য ছিল সংক্ষিপ্ত, তীক্ষ্ণ এবং পরিষ্কার। উৎসাহ সৃষ্টিকারীও বটে। সেই বক্তব্যে ভুল বোঝাবুঝির কোন অবকাশ ছিল না। বিপ্লবের অধিকার যে আমাদের আছে সে সম্পর্কে কারোর যেন কোন সন্দেহ না থাকে। এবং আরো বলি ফ্যাসিষ্টদের চরম ইচ্ছাশক্তি-ই এই বিপ্লব ঘটিয়েছে। এবং সেটা ঘটেছে আইন কানুন এবং সহ্য সীমার মধ্যে।

আমি ইচ্ছে করলেই এই বাদামী রঙের সভাঘরটাকে কংকালে ভরিয়ে দিতে পারতাম। সংসদ ভবনের দরজায় পেরেক ঠুকে দিয়ে ফ্যাসিষ্ট সরকার গঠন করতেও কোন অসুবিধা ছিল না। অনেক কিছুই করতে পারতাম; কিন্তু বর্তমানে তার একটাও আমি করি নি।

আমি শেষে আমার সব সহযোগীকে ধন্যবাদ জানাই। বিশেষ করে শ্রমিকদের। যাদের কাছ থেকে প্রত্যক্ষ বা অপ্রত্যক্ষভাবে ফ্যাসিষ্ট আন্দোলন এতো সহানুভূতি এবং সাহায্য পেয়েছে।

অতীতের মন্ত্রীরা যা করতো, সেই রকম একটা কাজ আমি সেই মিটিংয়ে ইচ্ছে করেই রাখি নি। কারণ তা'হলো কাগজের মাধ্যমে শুধু দেশের সমস্যার সমাধান করা। আমি তখন ঠিক করে ফেলেছিলাম যে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হলে কাজ করে যেতে হবে। শুধু কাগুজে বক্তৃতা দিয়ে গেলে চলবে না। বৈদেশিক নীতির ক্ষেত্রে আমি স্পষ্ট ঘোষণা করি যে মর্যাদা এবং জাতির প্রয়োজনকে মনে রেখে এই নীতির নির্ধারণ করতে হবে।

প্রতিটি বিষয়ের ওপরে আমি ওজনদার মূল্যবান মতামত রাখি। যাতে সবাই উপলব্ধী করে যে ফ্যাসিজিম প্রতিটি সমস্যার বিস্তারিত বিশ্লেষণ করে তার সমস্যার কি করে সমাধান হ'তে পারে সেই ব্যাপারেও গভীর ভাবে চিন্তা করেছে। আর এই সুচিন্তিত

মতামতের ওপরে ভিত্তি করে ভবিষ্যত সরকারের কাজকর্ম চালিত হবে। শেষে বক্তব্য শেষ করি—

ভদ্রমহোদয়গণ,

পরের যোগাযোগগুলো থেকে ফ্যাসিস্ত পরিকল্পনা আরো বিস্তারিতভাবে আপনারা জানতে পারবেন। আমি যতো কম দিন সম্ভব সংসদের বিরুদ্ধে শাসন চালাতে ইচ্ছুক। কিন্তু সংসদেরও নিজের গুরুত্ব বোঝা উচিত। তার ওপরেই সংসদ ভেঙে দেওয়ার ব্যাপারটা নির্ভর করবে। সেটা যেমন দু'দিনও হ'তে পারে, তেমনি দু'বছর হওয়াও অসম্ভব নয়। আমরা পূর্ণ ক্ষমতা চেয়েছি কারণ নইলে পূর্ণ দায়িত্ব নেওয়া যায় না। আর পূর্ণ ক্ষমতা ছাড়া দেশের একটা লিরেও বাঁচানো সম্ভব হবে না। তবে কেউ যদি এই অর্থনৈতিক বিষয়ে নিজে থেকে নিঃস্বার্থ ভাবে সাহায্য করতে এগিয়ে আসে, তা' অবশ্যই ধন্যবাদের সঙ্গে গ্রহণ করবো। সেটা মন্ত্রী, সেনেটার অথবা সাধারণ যোগ্য নাগরিকদের কাছ থেকে আসতে পারে। আমাদের প্রত্যেকের আগামী কাজ কী ভীষণ শক্ত সেই সম্বন্ধে পবিত্র চিন্তা রয়েছে। দেশ তারজন্য জয়ধ্বনি দিয়ে কিন্তু সাগ্রহে অপেক্ষা করছে। তাই আমাদের শুধু বড় বড় কথা বললে চলবে না, কাজের মাধ্যমে তা' দেখাতে হবে। আমরা শপথ নিচ্ছি যে বাজেটকে অর্থনৈতিক দিক থেকে স্বাস্থ্যবান করে তুলবো। তা' যে কোন মূল্যেই হোক। আমাদের বৈদেশিক নীতি হবে শান্তির জন্য; কিন্তু মর্যাদা এবং দৃঢ়তার সঙ্গে তা' রূপায়িত করবো। আমরা জাতিকে শৃঙ্খলাবোধ দিতে চাই। এবং দেবো। গতকাল আজ বা ভবিষ্যতের কোন শত্রু যেন আমাদের ক্ষমতার অপব্যবহার নিয়ে উপহাস করতে না পারে। বোকামী এবং ছেলেমানুষীতে ভরা দিনগুলো আমরা পেছনে ফেলে রেখে এসেছি।

আমাদের সরকারের দৃঢ় ভিত্তিভূমি হলো জাতির নতুন জাগরণে। আর সরকারকে সহযোগীতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছে ইতালির সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ নাগরিকবৃন্দ এবং নতুন প্রজন্মের দল। সন্দেহ নেই যে গত কয়েক বছর ধরে জাতিকে একত্রে ধরে রাখার জন্য ভালোরকম প্রচেষ্টা চালানো হয়েছে। পিতৃভূমি শেষ পর্যন্ত নিজেকে অখণ্ডতার বন্ধনে নিজেকে বাঁধতে পেরেছে। উত্তর থেকে দক্ষিণ, মহাদেশ থেকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা দ্বীপগুলো, বড় বড় শহর থেকে ভূমধ্যসাগর এবং আত্‌লান্তিকের উপনিবেশ পর্যন্ত এই বন্ধন এড়াতে পারে নি।

তাই ভদ্রমহোদয়গণ, আপনাদের কাছে আমার অনুরোধ যে জাতির উদ্দেশ্যে শুধু ফাঁকা বুলি ছুঁড়ে দেবেন না। আমাদের বাহান্নো জন প্রতিনিধি আমার যে বার্তা সংসদ ভবনে বহন করে নিয়ে যাবে, তাই যথেষ্ট। আসুন ফাঁকা বুলির বদলে আমরা পবিত্র চিত্তে দৃঢ় মানসিকতা নিয়ে জাতির উন্নতিতে অনলস ভাবে কাজ করে যাই।

এই কঠিন পরিশ্রমের শেষে যেন জয়মাল্য আমাদের জন্য অপেক্ষা করে—ঈশ্বরের কাছে এই সাহায্য-ই আমি প্রার্থনা করি।

আমি বিশ্বাস করি না যে ১৮৭০ সালের পর থেকে মনটেসিটরিয়ো সভাগৃহ এই পরিস্কার ভাষায় কিন্তু উৎসাহ বর্ধনকারী বক্তৃতা আর শুনেছে বলে। আমার মন ও আত্মীকতার অতীত এবং বর্তমানের দ্বন্দ্ব এই বক্তব্যে স্বচ্ছতার সঙ্গে ধরা দিয়েছিল। অনেক মন্ত্রীকেই আমার বক্তব্যে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠা উচ্ছ্বাস থামাতে প্রয়োজন পড়ে। তবে সংসদে না হলেও সারা ইতালি সানন্দে আমার বক্তব্যকে ধন্যবাদ জানায়। আমার দৃষ্টি দলীয়

সংকীর্ণতা, রাজনৈতিক দলাদলি, নোংরা ক্ষমতা দখলের প্রচেষ্টাকে ছাড়িয়ে আরো দূরে নিবদ্ধ ছিল। কারণ শুধু সংসদের জন্য নয়, সমগ্র জাতির উদ্দেশ্যেই ছিল আমার এই ভাষণ। তারা সবাই শুধু শুনেছে নয়, আমাকে বুঝতেও পেরেছে।

আমার রাজনৈতিক ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়-ই বলে দেয় ইতালির আকাশে ফ্যাসিষ্ট কাজকর্ম নতুন প্রভাত ডেকে আনবে।

সম্ভবত সভ্যতার নতুন সূর্যও উঠবে।

।। পাঁচ বছরের সরকার ।।

বিপ্লবের পদ্ধতি এবং কালো সার্ট পরা দলের ক্ষমতা আমার ঘাড়ে দায়িত্বের পাহাড় চাপিয়ে দিয়েছে। আগেই বলেছি যে আমার কাজ সহজ সোজা' ছিল না। আর তারজন্য প্রয়োজন ছিল দূরদৃষ্টির। যে কারণে কর্তব্যের বোঝা ক্রমেই ওজনে ভারী হয়ে পড়েছিল।

আমার অস্তিত্বকে তাই নতুন করে গড়ে তুলতে হয়েছিল। স্বাভাবিক দৈনন্দিন চিরাচরিত জীবনযাত্রার দিনগুলো ঝেড়ে ফেলে দিয়ে সরকারী পরিচালন পদ্ধতির সঙ্গে নিজেকে আরো নিবিড় ভাবে জড়িয়ে ফেলতে হয়। একক ব্যক্তির সেখানে স্থান নেই। কারণ সেখানে অনেকের হয়ে বক্তব্য রাখতে বা কাজকর্ম চালিয়ে যেতে হয়। অনেক সময়েই আমার মনে হয়েছে যে অনেকগুলো চরিত্র এবং কাজকর্ম মিলে মিশে তবে এই চরিত্র গঠন হওয়া উচিত। কারণ ওরা দেশের সমস্ত জনসাধারণের হয়ে কথা বলে। বক্তব্য পেশ করে। সমগ্রতার মধ্যেই তাই পুরো মানুষটা হারিয়ে যায়।

এটা জানতাম যে যখন আমি সরকারের দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিয়েছি, তখন কেন্দ্রীয় সরকারের সমস্ত ক্ষমতা তলানিতে এসে ঠেকেছে। আমাদের অর্থনৈতিক অবস্থা নিতান্তই শোচনীয়। লিবারেল পার্টির বাজেট প্রস্তাবে ঘাটতি এসে দাঁড়িয়েছে ছ'মিলিয়ার্ডে। ব্যক্তিগতভাবে প্রতিটি মানুষ ক্রমবর্দ্ধমান জিনিষপত্রের মূল্য বৃদ্ধিতে বিরক্ত/হতাশাগ্রস্ত। ধনীরাও ইতিমধ্যে আতংকগ্রস্ত হয়ে পড়েছে। যা শুধু সুদের হারকে বাড়িয়ে চলেছে। ফ্যাসিষ্ট অর্থনৈতিক ব্যবস্থার অধীনে এনে যতো সত্বর সম্ভব এই সমস্যাগুলোর হাত থেকে দেশের ধনী এবং দরিদ্র জনসাধারণকে মুক্তি দিতে হবে।

বিদেশে আমাদের রাজনৈতিক খ্যাতি দ্রুত কমে আসছিল। আমাদের ওরা দেখছিল এমন একটা জাতি হিসেবে যাদের শৃঙ্খলাবোধ বলতে কিছু নেই, তাই উৎপাদনে অক্ষম এবং উন্নতিতেও অপরাগ। দীর্ঘদিনের বিশৃঙ্খলার দরুণ আমাদের চেয়ে উন্নত জাতিদের কাছ থেকে যেটুকু সহানুভূতি পাওয়ার কথা, তা'ও হারিয়ে ফেলেছিলাম। তারাচেয়েও বড় ব্যাপার হলো শত্রুদেশগুলো এই একই কারণে শুধু আমাদের ওপরে দোযারোপ-ই করে নি, অত্যন্ত অহংকারী এবং উদ্ধত হয়ে উঠেছিল।

ইতালির শিক্ষাপদ্ধতি অর্থাৎ ইউনিভার্সিটি, মাধ্যমিক এবং প্রাথমিক স্কুলগুলোর মাধ্যমে ছাত্ররা শুধু বিমূর্ত এবং তত্ত্ব কথাই শিখে এসেছে। শক্তিও ক্ষয় করেছে এই একই কারণে। কিন্তু সেই শিক্ষা তাদের বাস্তব জগতের থেকে অনেক দূরে টেনে নিয়ে গেছে। আর সেই বাস্তব জগত হলো আধুনিক পৃথিবী এবং জাতির জীবনের ভিত্তি গড়ার সমস্যা। কিন্তু

শিক্ষা তো নাগরিকদের সুপথে চালিত করার জন্য যে কর্তব্যগুলো অবশ্য পালনীয়, সেই শিক্ষা দেবে। স্কুল-কলেজের ছেলেরাই জাতিকে উঁচুতে ওঠার পথ দেখাবে।

উপরন্তু তখনো প্রদেশে প্রদেশে লোকেদের মধ্যে শুধু রেষারেষি-ই ছিল না, এক তরফ অন্য তরফকে ঘৃণাও কম করতো না। এটা আমাদের দেশের অখণ্ডতাকে শেষ করতে না পারলেও যথেষ্ট ক্ষতি যে করতো, তা'তে সন্দেহ নেই। সরকারের কাজকর্মও বিভিন্ন প্রদেশের প্রাকৃতিক প্রয়োজনের তাগিদে করা হ'তো না। হ'তো সেই প্রদেশের লোকেদের মুখ চেয়ে। অর্থাৎ দলীয় সংকীর্ণতার ওপরে ভর করে। কোষাগারের দরজা খোলাও ছিল রাজনীতি নির্ভর। অর্থাৎ নির্বাচনী ছক অনুযায়ী সমস্ত ব্যাপারটা করা হ'তো।

আমলাতান্ত্রিকতা হাতীর মতো বিশাল বপু নিয়ে সমাজ ব্যবস্থার ওপরে চেপে বসেছে। দিনে দিনে তাই ওদের লক্ষ্যবস্তু যেমন দূরে সরে গেছে, তেমনি সমাজকে যতোখানি সম্ভব অসুবিধায় ফেলতে অহরহ চেষ্টা করে গেছে এই আমলাতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা। এই ব্যবস্থার সবচেয়ে ক্ষতিকর দিক ছিল চরিত্রগত ভাবে অসহিষ্ণুতা, অস্থিরতা এবং কর্তব্য-কর্মের প্রতি ভালোবাসার টান না থাকা ইত্যাদি। আর এইগুলোর মূল হলো সুস্থ সবলভাবে বেঁচে না থাকতে পারার মতো রোজগার। কারণ প্রচলিত শাসন ব্যবস্থা এদের যেমন নৈতিকতাকে সমর্থন জানায় নি, তেমনি ব্যক্তিগত দায়িত্ব এবং কর্তব্যগুলোকেও বুঝিয়ে দেয় নি।

আমাদের এখনো সংগ্রাম করে যেতে হবে। তারজন্য ফ্যাসিষ্ট দলও তৈরি। ওরাই সমাজের বিপদজনকভাবে ভেঙে পড়া আইন কানুন এবং শৃঙ্খলাবোধকে আবার ফিরিয়ে নিয়ে আসবে।

স্থল বাহিনী এবং নৌ-বাহিনী জাতির জীবনের সমস্যাগুলোর থেকে নিজেদের দূরে সরিয়ে রেখেছিল। সত্যি বলতে কি অনেক ব্যাপার ভালো হলেও তাদের যে দূরে সরিয়ে রাখা এটা একপ্রকার জাতির অপমান এবং লাঞ্ছনাও বটে। বিমান বাহিনীতে তো বিশৃঙ্খলা প্রথম থেকেই জাঁকিয়ে বসেছিল। যারজন্য এই বাহিনীতে নতুন শক্তি জোগানোও অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছিল। বিমান বাহিনীর কথা বলতে গিয়ে ভুললে চলবে না যে নিটি শুধু সামরিক বিভাগের নয়, বে-সরকারী প্লেন চালনাও বন্ধ করে দিয়েছিল। বিমান বাহিনীর অধ্যক্ষ শুধু বায়ুসেনাকে আলাদা করে দিয়েই ক্ষান্ত থাকে নি—মোটর, এরোপ্লেন সবকিছুকেই বিক্রী করে দিয়েছিল। জাতিকে শ্বাসরুদ্ধ করে হত্যার চক্রান্ত বলা যেতে পারে।

ইতিমধ্যে শহর রোমে এসে ফ্যাসিষ্ট বিরোধী দল জড়ো হ'তে থাকে। তারমধ্যে সব শ্রেণীর লোক-ই ছিল। ব্ল্যাক সার্ট দলের বিপ্লবে রাজনৈতিক দলগুলোর যেন স্বপ্নভঙ্গ হয়। আর আমার ক্ষমতায় বসায় তো তখনো ওদের বিস্ময়ের ঘোর কাটে নি। ওরা নিজেদের মধ্যে আমার পুনর্বিন্যাসের কাজ শুরু করে দেয়। সাহস সঞ্চয় করে সংসদ ভবন মনটেসিটোরিওর করিডরে ঘোরাফেরা আলাপ আলোচনা শুরু করে। ইতালির সংবাদ পত্রগুলো পুরনো দলগুলো অর্থাৎ ওদের প্রাচীন রাজনৈতিক খদ্দেরদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে আরম্ভ করে।

নাগরিক জীবন ধারাটাকে পুরোপুরি ঢেলে সাজানোর প্রয়োজন ছিল। বিশেষ করে যারা ফ্যাসিষ্টদলের ওপরে নিয়ত নজর রাখতো। রাজনৈতিকভাবে দেশের অর্থনীতির বিশৃঙ্খলা দূর করাটা সবচেয়ে আগে দরকার। স্কুলগুলো এবং সৈন্যবাহিনীকে ঢেলে সাজাতে হবে। দ্বিচারিতার অবসান ঘটানোর প্রয়োজন; আমলাতান্ত্রিক ব্যবস্থা কমিয়ে দিয়ে নাগরিক

জীবনে নাগরিকদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ, বাড়াতে হবে। পুরনো রাজনৈতিক দলগুলোর অনর্থক সমালোচনা বন্ধ করার দরকার। শুধু তাই নয়, বৈদেশিক আক্রমণকে রোখার ভারও আমার ওপরেই ন্যস্ত হয়েছে। ফ্যাসিজিমকে আরো উন্নত এবং ছাকার কাজটাও আমাকে করতে হবে। শত্রুদের মধ্যে বিভাজন সৃষ্টি করে ধরাশায়ী করার সময়ও এসে গেছে। মোদ্দাকথা, ইতালির রাজনৈতিক জীবনে প্রাণদায়িনী সাল্‌সা দিতে হলে সমস্ত দিকগুলোর প্রতি নজর দেওয়ার যেমন প্রয়োজন, তেমনি উন্নতিও ঘটাতে হবে।

ইতালির সীমান্তের ওপারে বসবাসকারী এক কোটির ওপরে ইতালিয়ানদের অবহেলা করা আর সম্ভব নয়। বরং তাদের স্বার্থ দেখাটা অত্যন্ত জরুরী হয়ে পড়ে। সীমান্ত প্রদেশগুলোয় বসবাসকারী ইতালিয়ানদের প্রতি আবার আস্থা জাগিয়ে তুলতে হবে। দক্ষিণ ইতালির জনগণের জীবনের মান যেমন উন্নত করার প্রয়োজন, তেমনি দৈনন্দিন জীবন ধারনের আধুনিক সুযোগ-সুবিধা গুলোর ব্যবস্থাও ওদের জন্য করে দিতে হবে। সর্বোপরি মানসিক এবং দৈহিক শক্তিশালী নাগরিকদের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করাটাও অত্যন্ত জরুরী।

চারিদিকে তখন ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে অসংখ্য সমস্যা; তারজন্য উদ্বিগ্নতাও কম ছিল না। আমি মানসিক দৃঢ়তার সঙ্গে রাজনৈতিক যে স্বতঃসিদ্ধগুলোর কথা কাগজে কলমে, মিটিংয়ে এবং সংসদ ভবনের বক্তৃতায় প্রকাশ করে এসেছি—তাকে বাস্তবে রূপ দেওয়াটাই প্রয়োজন। তবে এটাকে নিছক সমস্যা বলে মেনে নিলে ভুল হবে। সমস্যার এই বিপরীত বাতাসের বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর জন্য দরকার সবচেয়ে বড় মানসিক দৃঢ়তা।

পত্রিকার উন্নতির জন্য আমার সঙ্গে যে ব্যাপারগুলো বাঁধা ছিল, সেই বন্ধনগুলোকে খুলে ফেলি; ব্যক্তিগত চরিত্রের লেশ মাত্র রয়েছে, এমন সবকিছু থেকে নিজেকে সরিয়ে নেই। নিজেকে সম্পূর্ণ ঢেলে দেই নতুন করে দেশ গড়ার কাজে।

নিজের মধ্যে কোনরকম পরিবর্তন আনতে চাই না। সহজ সরলভাবে নিমগ্ন হয়ে সরকারের ভৃত্য হিসেবেই কাজ করে যেতে চাই। দলের সর্বাধ্যাক্ষ হয়ে প্রথম প্রথম কাজ হলো শক্তিশালী সরকারের প্রধান হিসেবে নিজেকে তুলে ধরা। জীবনের সমস্তরকম বিলাসিতাগুলো ত্যাগ করার জন্য এতোটুকু অনুশোচনা অথবা আপশোষ আমার নেই। তবে এই জটিল জীবনে কাজকর্মগুলোকে সুচারুরূপে সম্পাদন করার জন্য যে সুস্থ শরীর এবং মনের প্রয়োজন, তারজন্য খেলাধূলাটা চালিয়ে যেতে চাই। গত ছ'বছর সরকারী ডিনারগুলো ছাড়া আমি অভিজাত, বিলাসিতাপূর্ণ কোন রেঁস্তোরাতে যেমন যাই নি, তেমনি কোন কাফেতেও ঢুকিনি। আমি থিয়েটার দেখাও ছেড়েছি; কারণ একদা সন্ধ্যার বহু মূল্যবান কাজ করার সময় থিয়েটার দেখতে গিয়ে নষ্ট হয়েছে বলে।

খেলাধূলাকে আমি বরাবরই ভালোবাসি। আমি এতো জোরে মোটরগাড়ি চালাই যে বন্ধুবান্ধব দূরে থাক, অভিজ্ঞ ড্রাইভাররাও বিস্মিত হয়ে যায়। এরোপ্লেন চালাতেও পছন্দ করি। বহুবার এরোপ্লেন চালিয়ে উড়ে বেড়িয়েছি।

হ্যাঁ, ক্ষমতার শীর্ষে ওঠার জন্য যখন আমি ব্যস্ত ছিলাম, তখন পাইলটদের লাইসেন্স পাওয়ার জন্য আমার কয়েকটা মাত্র উড়ান বাকী ছিল। একবার তো এরোপ্লেন সহ পঞ্চাশ মিটার ওপর থেকে মাটিতে আছড়ে পড়েছিলাম; কিন্তু তার জন্য উড়ান আমি ছাড়ি নি। মোটর গাড়ির চালনাও কিন্তু আমাকে প্রচণ্ড রকমের শক্তি জোগায়। ঘোড়ার পিঠে সওয়ারী হয়ে পটল রঙের পাহাড়গুলোতে ঘুরে বেড়াতে যে আনন্দ পাই তা' অতুলনীয়। আর ফেনসিং খেলায় শারীরিক পটুতা আমার অনেক বেড়ে যায়। বেহালা বাজিয়ে শান্ত

সংগীতমুখর মুহূর্তগুলোকে আমি রীতিমতো উপভোগ করি। মহাকবি দান্তে আমার যেমন সাহিত্যের তৃষ্ণা মেটায়, তেমনি প্লেটো আমাকে তার দর্শনের ছটায় মুগ্ধ করে ধ্যানে নিমগ্ন থাকতে সাহায্য করে। অন্য কোন আনন্দের প্রয়োজন আমার পড়ে না।

অবশ্য আর কোন আনন্দের ব্যাপার স্যাপারে আমার এতোটুকুও আগ্রহ ছিল না। মদ্যপান করি না; সিগারেটও খাই না। তাস টাস ইত্যাদি খেলাধূলার ব্যাপারে আমার কোন আকর্ষণ ছিল না। বরং যারা এইসব খেলায় টাকা বা সময় এবং জীবন পর্যন্ত নষ্ট করে, তাদের প্রতি আমার করুণা হয়। অনেকের খাবারের টেবিলের প্রতি প্রচণ্ডরকমের আগ্রহ থাকে। বলতে আপত্তি নেই আমার সেদিকে এতোটুকু আকর্ষণ নেই। বিশেষ করে শেষের বছরগুলোতে তো সমাজের দরিদ্রতম লোকেরা যা খায়, তাই খেয়ে-ই আমি খুশী থেকেছি। জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত আমাকে আমার আত্মিক শক্তি এগিয়ে নিয়ে গেছে। টাকা-পয়সা আমাকে জীবনে কোনদিন লোভের হাতছানি দিতে পারে নি। একমাত্র জীবনের মহত্ত্ব এবং সভ্যতার প্রতি সারা জীবন গভীর আকর্ষণ বোধ করেছি। আজও করি। কারণ জীবনের এই দিকগুলোর সঙ্গে-ই আমার দেশের এবং জাতির ভবিষ্যত অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। আর তারজন্য আমার বিশ্বাস এবং আশার মূল এতো সুগভীরে প্রোথিত। এই ব্যাপারে আমি যেমন খামতি রাখি নি, তেমনি কারো সঙ্গে কোনরকম বোঝাপড়ায় যেতেও রাজী নই। আমি জীবনের পথ চলার সময় পেছনে ফিরে দেখি না। তার কারণ কেউ-ই আমাকে যে পেরিয়ে যেতে পারবে না সেই বিষয়ে আমি নিশ্চিত। আমি ওদের রাজনীতির স্বপ্নের মধ্যেই বিভোর করে রাখতে চাই। ওরা ওদের বক্তৃতা দেওয়ার ক্ষমতার মোহের জালে আবদ্ধ থাকুক।

ঘুরে ফিরে মনের মধ্যে একটা প্রশ্ন-ই উত্থিত হয় যে ইতালির বর্তমান পটভূমিকায় সবচেয়ে প্রয়োজনীয় কি? হ্যাঁ, উত্তরটা হলো—একজন সুযোগ্য প্রতিশোধ গ্রহণকারী। কারণ ইতালির আত্মিক এবং রাজনৈতিক পুণ জাগরণের ব্যাপারে যোগ্য দ্বিভাষীর একান্ত দরকার। আহত স্থানগুলোর ঠিকমতো পরিচর্যা করে শক্তি সঞ্চয়ের যথেষ্ট প্রয়োজন আছে। কারণ যাতে স্রোতের বিপরীতে সাঁতার কাটা যায়। যে সব শয়তানের বীজ দীর্ঘকাল ধরে ইতালির শরীরে বাসা বেঁধেছে, সেগুলোকে যে করেই হোক তাড়াতে হবে। রাজনৈতিক দূষণ দূর করারও প্রয়োজন রয়েছে। যাতে ইতালির শিরা উপ-শিরায় নতুন রক্তের স্রোত বয়ে যেতে পারে।

নির্বাচন ব্যাপারটা নিছক ছেলেখেলা হয়ে দাঁড়িয়েছে। নতুন ইতালি গড়ে তুলতে গেলে যে কর্তব্যের পাহাড় ভেঙে এগিয়ে যাওয়ার প্রয়োজন, তার সামনে এই বাধা জরাজীর্ণ একটা অট্টালিকার মতো পথ রোধ করে দাঁড়িয়ে আছে। আমার শত্রুসংখ্যা নগণ্য নয়; বরং অগুন্তি। তারওপর আবার দৈনন্দিন কাজের মাধ্যমে নতুন শত্রুর দল তৈরি হয়ে চলেছে। কিছু মরীচিকা যে আমার মধ্যেও ছিল না সেটা অস্বীকার করাটা উচিত হবে না। তবে সংগ্রাম তার পুরো চরিত্র নিয়ে-ই করা সঙ্গত। সমস্ত ক্ষেত্রে এই সংগ্রাম ছড়িয়ে দিতে হয়। এবং সেই সংগ্রামও হওয়া উচিত চরিত্রগতভাবে স্বয়ং সম্পূর্ণ।

সংগ্রামের চরিত্রকে সম্পূর্ণতা দিয়ে আমাকে সামনের স্বচ্ছপথ ধরে এগিয়ে যেতে হবে। তবে সেই সংগ্রামকেও আবার বহুধা বিভক্ত করে বিভিন্ন ক্ষেত্রে ছড়িয়ে দেওয়া চাই—যেখানে তারা আমার মুখ চেয়ে বসে আছে। বিশেষ করে সরকারী কাজের ক্ষেত্রগুলোতে। কর্ম এবং সেই কর্মকে রূপ দেওয়ার প্রচেষ্টাটাই হলো আমার জীবন। বিশেষ করে ১৯২২ সাল থেকে ১৯২৭ সাল পর্যন্ত।

আমি কখনো কথার সঙ্গে কাজের অমিলের দ্বন্দ্বে ভুগি নি। সৌভাগ্যবশত হতাশা ব্যাপারটাই আমার কাছে অপরিচিত। তাই সেই হতাশায় কখনো বিভ্রান্ত হই নি; যা যে কোন রাষ্ট্রনায়কের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকর। শুধু আমার মান সম্মানই নয়, দেশের ইজ্জতও বন্ধক রাখা হয়েছে এই জুয়া খেলায়। আর আমার নিজের চেয়েও দেশকে যে বেশি ভালোবাসি তা' বোধহয় বলার অপেক্ষা রাখে না।

উদ্বিগ্নতার সঙ্গে আমি চাইছিলাম ইতালিয়ানদের চরিত্র আরো স্বচ্ছ এবং পারস্পরিক সহযোগীতার ভিত্তিতে উন্নত হয়ে উঠুক। এবার আমি আমার অন্তর্দেশীয় নীতি সম্পর্কে বিস্তারিত বলতে চাই। অর্থাৎ কি আমি চিন্তা করেছিলাম এবং তার কতোটুকুকে বাস্তবে রূপ দিতে পেরেছি। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বার্থ নিয়ে রোববার এবং অন্যান্য ছুটির দিনের ঝগড়া থেকে নিজেদের ঊর্ধে উঠিয়ে পরস্পরের মধ্যে রাজনৈতিক পাতিজান সম্পর্ক স্থাপনের দিকে নজর দেই।

চাষীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্বের দ্বন্দ্ব, রক্তাক্ত সংগ্রাম থেকে শুরু করে সংবাদপত্রের আন্তরিকতাহীন চালাকি ; সংসদের ভেতরে নিস্ফলা বাকযুদ্ধ এবং কূটকাচালি আর প্রতিনিধিবর্গের মো-সাহেবী ইত্যাদি এড়িয়ে শেষ পর্যন্ত আমরা একটা দৃঢ় জাতি গড়ার লক্ষ্যে চলেছি। যারা পারস্পরিক সহযোগীতা, এগিয়ে যাওয়ার প্রেরণা এবং সর্বোপরি ফ্যাসিজিমের আত্মিক শক্তিসম্পন্ন হবে। তবে কতোটা করতে পারবো তার বিচারক আমি নই। সারা পৃথিবী তার বিচার করবে।

১৯২২ সালের ১৬ই নভেম্বর মন্ত্রী পরিষদের জমায়েতে নির্বাচন পর্ব সম্পন্ন হয়। আমার পক্ষে ভোট পড়ে তিনশো ছয় আর বিপক্ষে একশো ষোল। সুতরাং বিনা বাধায় আমি পূর্ণ ক্ষমতা হাতে তুলে নেই।

আমি রাজনৈতিক অপরাধীদের ক্ষমা করে দিলে চারদিকে শান্তির একটা বাতাবরণের সৃষ্টি হয়। সশস্ত্র ফ্যাসিষ্টদের সমস্যা সমাধান করারও প্রয়োজন হয়ে পড়ে। ইতালির সমস্ত প্রদেশে ছড়িয়ে থাকা শৌর্যময় সাহসী নির্ভীক সৈন্যদের ওপর বরাবরই আমার প্রভাব ছিল। কিন্তু বর্তমানে ফ্যাসিষ্টরা ক্ষমতার চূড়ায় উঠতে সমর্থ হয়েছে, তাই এই ধরনের পরিস্থিতি আর কাম্য হওয়া উচিত নয়।

আবার অন্যদিকে যাদের আমার প্রতি অন্ধ শ্রদ্ধা এবং বিশ্বাস ছিল, তাদের হঠাৎ করে সরিয়ে দেওয়া বা খেলার মাঠে চলে যেতে আদেশ দিতে পারি না। ওরা শুধু ওদের ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় দ্বারাই পরিচালিত হয় নি, শৌর্যবীর্য এবং সাহসের সঙ্গে সঙ্গে রাজনীতি সম্পর্কে তীক্ষ্ণ জ্ঞান ওদের সঠিক পথ বেছে নিতে সাহায্য করেছিল। এবং ধ্বংসকারী শক্তিগুলো যখন এখনো একেবারে মূল থেকে বিনষ্ট হয় নি ; তাই কালো সার্টের এই বিজয়কেও সুরক্ষিত রাখার প্রয়োজন রয়েছে। আমি তখন স্থির করি যে জাতীয় সুরক্ষা এবং আত্মরক্ষার জন্য মিলিশিয়া স্বেচ্ছা বাহিনী তৈরি করাটাই সঠিক হবে। তবে এই মিলিশিয়া বাহিনীর কর্তব্য সুচারুরূপে ঠিক করে দেওয়া দরকার। আর এই মিলিশিয়া বাহিনীকে অভিজ্ঞ সেনাপতিদের অধীনে কাজ করতে হবে। বিশেষ করে সেইসব সেনাধ্যক্ষদের ওপরেই এই দায়িত্ব অর্পণ করা হবে যারা প্রথম মহাযুদ্ধে বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করে ফিরে এসেছে এবং ফ্যাসিষ্টদের উত্থান সংগ্রামের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিল।

আমি প্রকাশ্যে বলি ফ্যাসিজিম যখন চলতে শুরু করেছে, তখন সমস্তরকম বে-আইনি কাজকর্ম এবং বিশৃঙ্খলাকে মুছে দিতে হবে। সশস্ত্র ফ্যাসিষ্ট বাহিনীকে স্বেচ্ছাসেবক মিলিশিয়াতে পরিবর্তিত করতে পেরে দেশের সুরক্ষা স্তম্ভগুলোকে যেমন সুদৃঢ় করা সম্ভব হয়েছে, তেমনি এটা আমার রাজনৈতিক বিচক্ষণতার পরিচয়ও বটে। সৈন্যবাহিনীকে এই মিলিশিয়ার দায়িত্ব সঁপে দেওয়াতে তাদের যেমন কতৃত্ব করার সুযোগ দেওয়া গেছে, তেমনি বিরাট এক রিজার্ভ বাহিনীর শক্তি সৈন্যদলের পেছনে এসে দাঁড়াতে সমর্থ হয়েছে।

ক্ষমতার শীর্ষে বসার পর থেকেই আমার ভেতরে তীব্র একটা ইচ্ছা কাজ করছিল। মন্ত্রীপরিষদকে ঘিরে রাজনৈতিক সুন্দর বাতাবরণ দিয়ে ঘেরা একটা সংঘ বা গ্রান্ড কাউন্‌সিল। কারণ ফ্যাসিষ্টদের প্রয়োজন ছিল রাজনৈতিক এইরকম একটা প্রতিষ্ঠান গড়ার, যাতে পুরনো দিনের তথাকথিত রাজনৈতিক কার্যকলাপগুলোকে এই প্রতিষ্ঠানের কাজের দ্বারা দমন করে বে-পথে চালিত জাতীয় জীবনকে সত্যিকারের সুখ সমৃদ্ধির পথে আনা যায়। প্রত্যেকদিন নতুন নতুন যে সব জিজ্ঞাসার মুখোমুখি হ'তে হচ্ছে, তার উত্তর দিতে গেলে জিজ্ঞাসাগুলোর পটভূমি জানার প্রয়োজন রয়েছে। বর্তমানে সরকারের চূড়োয় বসে থাকলেও ভুললে চলবে না যে গত তিন বছর আমি দলীয় পদের প্রধান হিসেবে দলটাকে গড়ে তুলেছি। এবং সেই সময় ফ্যাসিষ্টরা পার্কে, রাস্তায় রাস্তায় তীব্র সংগ্রাম এবং সংঘর্ষের মুখোমুখি হয়েছে। কিন্তু জাতির স্বার্থকে সবচেয়ে উঁচুতে জায়গা দিয়ে ওরা পেরিয়ে এসেছে সেই কঠিন পথ। নতুন উৎসাহ শিরায় শিরায় পাক দিয়েছে।

এই গ্র্যান্ড কাউন্‌সিলের ওপরেই দায়িত্ব বর্তাবে ফ্যাসিজিমকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার। প্রপেলার যেমন জল কেটে কেটে জাহাজকে এগিয়ে নিয়ে যায়। তা'ছাড়া ফ্যাসিষ্ট বিপ্লবকেও আইন শৃঙ্খলার পথে নিয়ে আসা ওদের কর্তব্য হবে। আগেও যেমন বর্তমানেও তেমনি গ্র্যান্ড কাউন্‌সিল পাঁচ মেশালীতে ভর্তি ছিল না ; তবে বীর্যবান ফ্যাসিষ্ট মন্ত্রী এবং জীবনের বিভিন্ন পথ থেকে আসা প্রতিনিধিবর্গ—যাদের জ্ঞান এবং অনুসন্ধিৎসা যে কোন বিশেষজ্ঞের চেয়ে কম ছিল না। গ্র্যান্ড কাউন্‌সিল কিন্তু কোন সমস্যার মুখোমুখি হয়ে পেছু হটে আসে নি। বরং সাফল্য-ই পেয়েছে। আমি সব সময় গ্র্যান্ড কাউন্‌সিলের সভাপতি হিসেবে কাজ করে গেছি। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় মিটিংয়ের যেসব সংক্ষিপ্তসার বেরিয়েছে, বলাবাহুল্য সবই আমার নিজের হাতে লেখা। এইসব-ই হলো সুদীর্ঘ সাধনার ফসল। যে সাধনার মধ্যে ইতালির জীবন ধারাকে প্রবাহিত হ'তে হয়েছে। ফ্যাসিষ্ট বিশ্বাস, সাহস আর আত্মাকে সঙ্গী করে। যে গ্র্যান্ড কাউন্‌সিলকে আমি এই সরকারের আইন পরিষদ হিসেবে গড়ে তুলতে চাই। বলতে আপত্তি নেই যে গত পাঁচ বছর তারা তাদের ওপরে দেওয়া দায়িত্ব চমৎকার ভাবে পালন করেছে।

তবে প্রথম সমস্যা দেখা দেয় পুলিশ বাহিনীর একত্রিকরণের ব্যাপারে। আমাদের দেশে যেমন সাধারণ পুলিশ ছিল, তেমনি রাজনৈতিক এবং বিচার বিভাগের অধীনেও পুলিশের শাখা কাজ করতো। তার ওপর ছিল রয়াল ক্যারাবিনিয়ারী আর সর্বশেষে রয়াল গার্ড। এই রয়াল গার্ডের সৃষ্টি করেছিল নিটি এতে বিভিন্ন চরিত্রের উপস্থিতি যেমন ছিল, তেমনি রয়াল গার্ড প্রতিষ্ঠানটাকে অপদার্থ বললেও সম্ভবত অত্যুক্তি হয় না। ক্যারাবিনিয়ারী আর সাধারণ পুলিশের মাঝামাঝি জায়গায় এই রয়াল গার্ডের অবস্থান ছিল। আমি সঙ্গে সঙ্গে স্থির

করে ফেলি যে রয়াল গার্ডকে দমন করার প্রয়োজন। তবে অপ্রীতিকর কোন ঘটনা সমূহ দিয়ে নয়। কয়েকটা শহরে যেমন তুরিনো এবং মিলানো শহরে রয়াল গার্ডের দল প্রতিরোধ এবং ভীষণ বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করে। আমি এইসব ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে কড়া নোটিশ জারী করি। যেসব জায়গায় গন্ডগোল হয়েছে টেলিফোনে অথবা অফিসে ডেকে পাঠিয়ে সেই জায়গার প্রধানদের ভালো করে কড়কে দেই। আদেশ জারী করি পরিস্থিতির প্রয়োজনে গুলি করার। ছ' ঘণ্টার মধ্যে এইসব জায়গার গন্ডগোল থেমে গিয়ে শান্ত হয়ে আসে। চল্লিশ হাজার সশস্ত্র রয়াল গার্ড ভেঙে দেওয়ার পরিবর্তে মাত্র চারজন মারা যায়। অল্প বিস্তর দশজন আহত হয়। রয়াল গার্ড অফিসারদের অন্য প্রতিষ্ঠানে স্থানান্তরিত করা হয়। আর যারা স্বেচ্ছায় অন্য কোন কাজের দায়িত্ব নিতে চায়, তাদের সেই মতো ব্যবস্থা করি। অন্যান্যরা নির্বিঘ্নে তাদের জেলায় নিজেদের বাড়িতে ফিরে যায়। কোনরকম গন্ডগোলই আর হয় না।

আমাদের ইতালিয়ান রাজনৈতিক ধাঁচা প্রথমে মনে হয়েছিল নতুন পরিস্থিতিতে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিয়েছে ; ফ্যাসিজিম যে ক্ষমতা অধিকার করেছে, তাকে মেনেও নিয়েছে। কিন্তু স্বল্প কয়েকদিন পরেই ওরা মূর্খের মতো আমার এবং ফ্যাসিজিমের বিরুদ্ধে যেন যুদ্ধ ঘোষণা করে। গ্র্যান্ড কাউনসিলের মিটিংয়ে ব্যাপারটার সবিস্তারে আসি। আমি এই তথাকথিত রাজনৈতিক মিস্ত্রীদের সম্পর্কে আরো বলি যে অতীতে ওরা ঘুষখোর এবং ব্ল্যাকমেলিংয়ের কাজ করে এসেছে। ওদের কার্যকলাপও স্বচ্ছ নয়। বরং নোংরামীতে ভরা। ওরা মানবতা, সহানুভূতি ইত্যাদি মানুষের সদ্‌গুণ গুলোতে বিশ্বাস রাখে না। এমন কি যারা উপকৃত হয়েছে, তারাও আগের পথ ধরেই চলেছে। তবে সবাই বুঝে গেছে যে ইতিমধ্যে স্বার্থপরতা নিজের কোলে ঝোল টানার প্রচেষ্টার বেলুনটা চুপসে গেছে। এইসব রাজমিস্ত্রীদের বিরুদ্ধে আমার লড়াইয়ের ব্যাপারটা সবার-ই জানা। সহৃদয়তা, আন্তরিকতা ইত্যাদি গুণগুলোই হলো আমার সামনের পথে এগিয়ে যাওয়ার হাতিয়ার।

১৯২৩ সালে অনেক আলোচনার পরে দৃঢ়ভাবে স্থির করি যে ন্যাশনালিজিম এবং ফ্যাসিজিম একসঙ্গে মিশে যাওয়াটাই সঙ্গত। কারণ বেশ কিছুদিন ধরে এই দু'টো দলই জাতীয় জীবনে একলক্ষ্যে পৌঁছতে আপ্রাণ চেষ্টা করে গেছে। তবে রাজনৈতিক কার্যকারণে দু'টো দলকে আলাদা আলাদা পথে হাঁটতে বাধ্য করেছে। কিন্তু জয় হওয়ার পরে যখন ন্যাশান্যলিজিমের ভালো সদস্যরা নতুন শাসকের দিকে সহযোগীতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছে, তখন রাজনৈতিকভাবে উভয়দলের একত্রিকরণ-ই হলো বুদ্ধিমানের কাজ। ফ্যাসিষ্টদের কালো সার্ট আর ন্যাশানলিষ্টদের ইউনিফর্ম নীল সার্ট — উভয়ে মিলিত হয় শুধু শালীনতার জন্য নয়, রাজনৈতিক বিশ্বস্ততার জন্যই এই একত্রিকরণের প্রয়োজন ছিল। এই নতুন কিন্তু সুগভীর বন্ধুত্ব মহান ইতালির ভবিষ্যতকে আরো উজ্বল করে তুলবে। যে ইতালির কল্পনা মহামানবেরা এতোদিন ধরে করে এসেছে ; তাদের সেই মহৎ ইচ্ছা ন্যাশানাজিম এবং ফ্যাসিষ্টদের মিলিত প্রচেষ্টার মধ্যে মূর্ত হয়ে উঠবে।

১৯২৩ সালের এপ্রিল মাসে তুরিনে পপুলার পার্টির ন্যাশানাল কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয়। আগের রাজনৈতিক দলগুলোর মতোই এই কংগ্রেসেও স্কুল-কলেজের শিক্ষার মতো শুধু ফাঁকা বাগাড়ম্বরের পালা, যা যুগ যুগ ধরে ইতালিকে সম্মোহিত করে রেখেছিল। স্বাভাবিক

ভাবেই এই কংগ্রেসে দীর্ঘ সময় ধরে ফ্যাসিজিম নিয়েই চর্চা করা হয়। শেযে সাব্যস্ত হয় যে মোটামুটি ফ্যাসিস্ট বিরোধী ভূমিকা পপুলার পার্টি মেনে নেবে। তবে তীব্রভাবে সংঘর্ষে লিপ্ত না হলেও মোটামুটি ফাসিষ্ট বিরোধী ভূমিকা পপুলার পার্টি মেনে নেবে। তবে তীব্র ভাবে সংঘর্ষে লিপ্ত না হলেও মোটামুটি গোছের সব কাজেই ওরা ফ্যাসিষ্ট বিরোধীতা করে যাবে।

আমার মন্ত্রীসভায় কয়েকজন মন্ত্রী ছিল পপুলার পার্টির। তাদের অবস্থা হয় ত্রিশঙ্কু। বিশেষ করে এই কংগ্রেসে যখন ফ্যাসিষ্ট বিরোধীতাকেই মূল প্রতিপাদ্য হিসেবে স্থির করে নেওয়া হয়। তাদের পার্টির নতুন অবস্থানের কথা তুলে ধরে ওদের আমি মন্ত্রীসভায় থাকলে আমার সমস্যার বলি। কিছু ব্যাখ্যা ট্যাখ্যা ওরাও অবশ্য দেয়, যা আমার মতামতের থেকে ভিন্ন। তবে রাজনীতির ক্ষেত্রে দূরদর্শীতার কথা ভেবে আমি ওদের মন্ত্রীসভা থেকে পদত্যাগ করতে বলি। যাতে ওরা সংসদীয় রাজনীতি আর ফ্যাসিষ্ট পার্টির মধ্যেকার টানা পোড়ানিতে না ভোগে।

ক্ষমতার শীর্ষে বসেই এই রাজনৈতিক টানা পোড়ানির ব্যাপারটা আমি টের পেয়েছিলাম। পরিস্থিতি এবং ফ্যাসিজিম মতবাদটাকে সেই সময় সবাই যে খোলা মনে নেয় নি তা'তে সন্দেহ নেই। তখনো অন্য মতালম্বীদের সংখ্যা কম ছিল না। অনেকের দুরাশা ছিল যে আমার ওপরে তাদের প্রভাব বিস্তার করে ফ্যাসিজিমের শৃঙ্খলার সোজা কিন্তু কঠিন নিগড়টাকে হাল্‌কা করে দিতে সক্ষম হবে। আর এই উদ্দেশ্য নিয়ে যারা পুরো ব্যাপারটাকে অন্যদিকে মোড় ঘোরাতে পারদর্শী, তারা আমাকে অনুরোধ জানায়। স্বাভাবিক ভাবেই তারা দেখে যে চকমকি পাথরের মতো ফ্যাসিবাদ সম্পর্কে আমি কঠিন এবং মানসিক দিক থেকে দৃঢ় সংকল্প।

১৯২৩ সালে প্রথম শ্রমিক দিবস কোন ঘটনা ছাড়া নিবিঘ্নে কাটে ; লোকজন শান্ত চিত্তে কাজকর্ম করে। পুরনো যে দিনগুলো ইতালির বুক থেকে মুছে গেছে তার জন্য কাউকে অনুশোচনা করতে দেখা যায় না। শেযে স্থির করি ফ্যাসিবাদ মানুযের মনের কতো গভীরে গিয়ে পৌঁছেছে, সেটা পরখ করতে। প্রথমে যাই শহর মিলানে এবং তারপর রোমানা। শেযে ভেনিস, পাদুয়া, ভিসেনাজা, সিসিলি এবং সরদানা। সর্বশেযে যাত্রা করি পিয়াসেনজা এবং ফ্লোরেন্সে। সব জায়গাতেই আমি উচ্চ অভ্যর্থনা পাই; শুধু ব্ল্যাক-সার্ট এবং আমার দলের লোকেদের কাছ থেকেই নয়, ইতালির সাধারণ জন সাধারণও আমাকে স্বতঃফূর্তভাবে অভিনন্দিত করে। শেয পর্যন্ত মানুয বুঝতে পারে যে ইতালিতে তাদের একটা সরকার আছে। আর সেই সরকার পরিচালনার ভার যোগ্য নেতৃত্বের ওপরে অর্পণ করা হয়েছে। বিপ্লবের স্রষ্টা কালো সার্টের দল আমাকে দলীয় নেতৃত্ব যখন হাতে তুলে দিয়ে যেভাবে অভিনন্দিত করেছিল, আজও সেই অভিনন্দনের স্রোতে ভাঁটা পড়ে না। আসলে আমি যখন সংবাদপত্রের মাধ্যমে আক্রমণ শানাছিলাম, তখন থেকেই আমার জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পায়। তখন অবশ্য ইতালির জনগণ ভাঙতে যতো উৎসাহী ছিল, গড়ার প্রতি আগ্রহ ছিল না বললেই হয়। কিন্তু বর্তমানে আমার পুরনো দিনের সেই বন্ধুরা তাদের দৈনন্দিন কাজকর্ম সৈন্যবাহিনীর শৃঙ্খলার সঙ্গে সম্পন্ন করছে। ওদের চিন্তাধারা শুধু আমাকে গর্বিত করে তোলে না, মনটাকে গভীর ভাবে নাড়াও দেয়। আমার পক্ষে কোনরকম আপোযের মাধ্যমে ওদের এই উষ্ণ যৌবনকে দূরে ঠেলে ফেলে দেওয়া সম্ভব ছিল না। কারণ ইতালির মানুয তখন ভাবতে শুরু করেছে যে এতোদিনে ওরা সত্যিকারের স্বাধীনতা পেয়েছে ; হ্যাঁ, ক্রমাগত রাজনৈতিক দলগুলো যে

ওদের ভয় দেখিয়ে গেছে, তার হাত থেকে এবারে মুক্তি এসেছে। ওরা আমার রাজনৈতিক কাজকর্মের ওপরে আশীর্বাদ বর্ষণ করে। আর আমি তখন তৃপ্ত। সুখী।

এই সময়েই আবার বিরোধী পক্ষ প্রচার শুরু করে। আমার সঙ্গে কোন আপোষ রফার সম্ভাবনা নেই দেখে বিরোধীরা, বিশেষ করে কোরিয়ারে ডেলা অত্যন্ত নোংরা কাদা ছুঁড়তে আরম্ভ করে। প্রবঞ্চনা পূর্ণ বিতর্কমূলক প্রচারের ঢেউ তোলে। আমিও নির্বাচনের ব্যাপারে নতুন আইন চালু করি। পুরনো সংসদীয় আইন অনুযায়ী আনুপাতিক প্রতিনিধিত্বের ফাঁদে আর আমি পড়তে রাজী নই। কারণ ততোদিনে পপুলার, ডেমোক্র্যাট এবং লিবারেলদের থেকে আমি নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলেছি। রাজনৈতিক সংস্কার নিয়ে আমার বলা কথাবার্তায় বিরোধীতাও প্রবল হয়ে উঠেছে।

ইতিমধ্যে ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে গোপনে চোরাগুপ্তা আক্রমণ করা শুরু হয়ে যায়। সেটা ছিল ঝড়ের বছর। স্থির হওয়ার আগে যে কষ্টকর দিনগুলোকে পেরোতে হয়, এই সময়টাকে সেই সময়-ই বলা যেতে পারে। দলের ভেতর থেকে ছদ্মবেশে উঠে আসা ষড়যন্ত্রের হাত থেকেও এই সময় ফ্যাসিবাদকে আমাকেই রক্ষা করতে হয়। যারা পার্টির ভেতরে অশান্তির সৃষ্টি করে পার্টিকে টুক্‌রো টুক্‌রো করতে চায়, তাদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে হয়। ফ্যাসিবাদ হলো একক একটা সংস্থা। এখানে দ্বৈত মতবাদ বা নেতার কোন স্থান নেই। যাজকদের দ্বারা শাসিত এই দল ; যার ভিত্তিভূমি হলো কালো—সার্ট পড়া ফ্যাসিষ্টরা, আর শীর্ষে একজন। হ্যাঁ, মাত্র একজন-ই শীর্ষনেতা।

আমার আত্মিক শক্তি জোগানোর ক্ষেত্রে এটাই ছিল প্রথম শক্তি। আমাদের দলের মধ্যে চুক্তিভঙ্গের কারণ আদর্শগত মত বিরোধের জন্য হয় নি ; বেশির ভাগ ক্ষেত্রে এই চুক্তিভঙ্গ হয়েছে ব্যক্তিগত আশা-আকাঙ্খার কারণে। ভুল ধ্যান-ধারণাবশত অথবা ভ্রষ্টাচারের দরুণ। অনেক সময় ইতালির রাজনৈতিক রাজমিস্ত্রীদের লুকানো শক্তি ওদের পেছনে মদত দেয়। তবে পুরো ব্যাপারটার ওপরেই আমি তীক্ষ্ণ নজর রাখি। যাতে ওরা চুল পরিমাণ জায়গাও না পায়। যখন সংসদে জরুরী আইনগুলো পাশ করা হয়ে যায়, তখন সংসদ ভেঙে দেওয়ার কথা বিবেচনা করি। সংসদের আইন দ্বারা পুরো ক্ষমতা হাতে নিয়ে ১৯২৪ সালের ৬ই এপ্রিল নির্বাচন ঘোষণা করি।

এই নির্বাচন ঘোষণা সন্দেহজনক চরিত্রগুলোর রাজনৈতিক ঘোট পাকানো বন্ধ করে দেয়। সমস্ত পার্টি-ই হিসেব নিকেশ করে তাদের দুর্গ আবার নতুন করে সাজাতে চেষ্টা করে। যাতে যতো বেশি সম্ভব ভোট সংগ্রহ করে সবচেয়ে বেশি সংখ্যায় সংসদে প্রতিনিধি পাঠানো যায়।

নির্বাচনকে ছেলেখেলা বলে ধরে নিলেও যারা নির্বাচিত হয়, তারাই কিন্তু এই খেলায় মুখ্য ভূমিকা পালন করে। যাতে সাধারণ মানুষের চোখে শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি হিসেবে পরিগণিত হ'তে পারে ; সেইজন্য ছল চাতুরী ইত্যাদি নির্বাচনে জেতার কোন পথ-ই ছাড়ে না। তবে ফ্যাসিবাদ নিজেদের এই কুৎসিৎ শক্তির কাছে মাথা নোওয়াতে রাজী হয় না। আমরা একটা বিরাট তালিকা প্রস্তুত করি, যাতে শুধু জাতীয় বীরদের স্থান দেওয়া হয়। যারা বিশ্বস্ত এবং ফ্যাসিবাদে যাদের আস্থা রয়েছে, কিন্তু সক্রিয় ভাবে জাতীয় জীবনে নিজেদের মর্যাদা বজায় রাখতে সচেষ্ট, শুধু তাদেরই জায়গা হয় সেই তালিকাতে। এই নীতি নিয়ে ফ্যাসিবাদ কিন্তু

রাজনৈতিক ক্ষেত্রে শুধু বিচক্ষণতারই নয়, বিজ্ঞতার পরিচয়ও দেয়। এমন কি দল দেশকে ভালো ভাবে সেবা করবে বলে বিরোধীতা করা সন্দেহজনক চরিত্রের অনেক ব্যক্তিত্বকেও মেনে নেয়। জাতীয় তালিকায় যেমন কাউন্সিলের ভূতপূর্ব প্রেসিডেন্ট অরল্যান্ডোকে রাখা হয়, তেমনি সংসদ ডি নিকোলার নামও নথিভুক্ত করা হয়। তবে তালিকা ভুক্তির বেশির ভাগের নাম-ই ছিল নতুন ধরনের লোকেদের। সত্যি বলতে কি অধিকাংশ নামের অধিকারী ছিল যুদ্ধফেরত এবং অভিজ্ঞ। দু'শো জন প্রাক্তন সৈনিক এবং অফিসার, দশজন স্বর্ণপদক প্রাপ্ত, একশো চৌদ্দজন রূপোর পদক এবং আটানব্বই জন ব্রোঞ্জ পদক পাওয়া। আশীজন যুদ্ধে আহত হয়ে পঙ্গু আর চৌত্রিশজন স্বেচ্ছাসেবক।

কম্যুনিষ্টদের ছেড়ে আসা সোশ্যালিষ্টরা অস্ত্রে তখন শান দিচ্ছে ; পপুলাররাও একই কর্মে রত। কিন্তু ৬ই এপ্রিল ব্যালেট বাক্সে ভর্তি ভোট পড়ে জাতীয় তালিকার ব্যক্তিদের স্বপক্ষে। অক্ষয় বিজয় বলা যেতে পারে। জাতীয় তালিকার লোকেদের পক্ষে ভোট পড়ে পঞ্চাশ লক্ষ, আর বিরোধী সমস্ত দল মিলে ভোট পায় কুড়ি লক্ষ। আমার নীতি এবং শাসন প্রণালী জনসাধারণের পূর্ণ সমর্থন লাভ করে। এইবার আমি আমার উপদেশ মণ্ডলীর দিকে তাকাই। কারণ আমার নীতি এবং শাসন প্রণালী মেনে নেওয়ার জন্য ওদের চাপাচাপি করার প্রয়োজন তখন ফুরিয়ে গেছে।

মিলানে থাকাকালীন আমি রাজনৈতিক যুদ্ধ চালিয়েছিলাম। নির্বাচনের ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামানোর আর দরকার বোধ করি নি, কারণ ফলাফলেই তা প্রমাণিত। চিন্তার কোন অবকাশ-ই নেই সেখানে। তবে ইতালির প্রতিটি শহরের নাগরিকরা যেভাবে হর্ষ উল্লাসে তাদের জাতীয় তালিকার প্রতি সমর্থন জানিয়েছে তা'তে সত্যি বলতে আমার হৃদয় আনন্দে ভরে গেছে। অর্থাৎ পরোক্ষে আমার সরকারের শাসন প্রণালীর প্রতি-ই তাদের এই সমর্থন। বিজয়ীর বেশে রাজধানী রোমে ফিরে এসে পালাজ্জো চিগির ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে জমায়েত হওয়া জনসাধারণের উদ্দেশ্যে সেলাম জানাই। আসলে অভিনন্দন করি সেইসব নতুন মহান ইতালিয়ানদের যারা সরল বিশ্বাসে শৃঙ্খলার সঙ্গে আমাকে নেতা হিসেবে বেছে নিয়েছে।

আমার সংশ্লেষ ছিল পার্টি মরে গেলে যাক, কিন্তু দেশ বাঁচুক।

২৪শে মে অত্যন্ত পবিত্রতার মধ্যে দিয়ে ব্যবস্থাপক সভার সাতাশতম উদ্বোধন অনুষ্ঠান হয়। মহামান্য রাজা অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক বক্তৃতা রাখেন। সভাগৃহ যেন জাঁকজমক অনুষ্ঠানের যোগ্য সাজ নেয়। ছোটখাটো রাজনৈতিক মত বিরোধের কারণে যেসব দল দেশ এবং ইতালির জীবন ধারাকে চরম ক্ষতিগ্রস্থ করেছে, তারা নিজেদের দূরে সরিয়ে রাখে। তবে ব্যবস্থাপক সভার সাতাশতম উদ্বোধন অনুষ্ঠানের কোথাও কিন্তু কিছু খামতি ছিল না। বিশেষ করে মূল্যবোধের রাজনীতির দিক থেকে। যুদ্ধফেরত অভিজ্ঞ, বর্ষীয়ানরা তো যথেষ্ট পরিমাণে সাদর অভ্যর্থনা লাভ করে। কয়েকজন বর্ষীয়ানের চমকদার সাজসজ্জা তো সবার নজর কাড়ে। যে বিধান মণ্ডলীর সভাকক্ষ ছোট ছোট স্বার্থ নিয়ে রাজনৈতিক বিপদের আখড়া হয়ে দাঁড়িয়েছিল, সেখানে নতুন প্রাণের জোয়ারের বন্যা বয়ে যায়। মহান ইতালির নতুন জীবনের শ্বাস-প্রশ্বাসে যেন ভরে ওঠে সভাকক্ষ।

এইসব ব্যাপারগুলো রীতিমতো বিচলিত করে তোলে সোশ্যালিষ্টদের। ওরা শুধু যুদ্ধকেই মন থেকে ঘৃণা করে নি, আমাদের এই যুদ্ধ-জয়কেও ওদের লাঞ্ছনা বিড়ম্বনার মুখোমুখি কম

হ'তে হয় নি। পুরনো সংসদীয় পৃথিবী নতুন এই যুবকদের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে না পেরে পিছিয়ে পড়ে। মন্টেসিটৈরিওর সংক্রামক কাপুরুষতা, সংসদ ভবনের সভ্যবৃন্দ কখনোই যুদ্ধের শৌর্য প্রদর্শনের ফলশ্রুতি হিসেবে পাওয়া সোনার মেডেলকে যথাযথ সম্মান দেখায় নি।

পুরনো এবং নতুন যৌবনের এই দ্বন্দ্ব মন্টেসিটোরিওতে পৌঁছোয়। সংসদ ভবনের ওপরেও সেই টানা পোড়ানির সম্পর্কের দীর্ঘ ছায়া পড়ে। যদিও তার আগেই রাস্তায় ঘাটে ফ্যাসিবাদ এই দ্বন্দ্বকে পরাজিত করে জাতির হৃদয়ে আশাকে জাগিয়ে তুলেছিল। এই মত বিরোধীতা শেষ পর্যন্ত নাটকের শেষ কবিতার টুক্‌রো হয়ে দাঁড়ায়।

হঠাৎ করে কিন্তু এই যুদ্ধ সুরুর দিনটাকে আমি বেছে নেই নি। অনেক ভাবনা চিন্তার ফসল ছিল এটা।

কয়েকদিন পরেই আবার সেই আগের তারিখের অনুষ্ঠানের দিন যে সব সোশ্যালিষ্ট সভ্যরা অনুপস্থিত ছিল, তারাও ততোদিনে বিরোধী আসনে এসে বসতে শুরু করে। সংসদীয় পরিবেশ তখন আগুনের তাপে যেন ঝলসে গেছে। আমি অবশ্য জানতাম যে আমাদের রাজনৈতিক জীবন ধারাটাকেই বদলে ফেলতে হবে; সংসদের ক্ষেত্রেও আমূল পরিবর্তন আনার প্রয়োজন। সেখানে দিবাস্বপ্নের মরীচিকা দেখার কোন স্থান নেই। অত্যন্ত ধৈর্যের সঙ্গে প্রথমদিকের উত্তাল সভাগৃহকে পরিচালনা করতে সমর্থ হই। তর্ক-বির্তকের পাহাড় ভেঙে সমতল করার জন্য বক্তৃতার প্রয়োজন হয়ে পড়ে। অন্ধ অভিজ্ঞ কার্লো ডেলক্রয়িস্ক ৬ই জুন সেই কাজটা করে। ৭ই জুন বিরোধীদের সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দেই আমি। ওদের চালাকি করার প্রচেষ্টার কোমরও ভেঙে দেই।

আমার স্পষ্ট মনে আছে যে পুরো ব্যাপারটাতেই আমি ফ্যাসিষ্ট শহীদদের নামে শপথ নিয়েছিলাম প্রতিজ্ঞা করেছিলাম তাদের আত্মার প্রতি যে আমরা দেশের এবং জাতির উন্নয়ণে সমস্ত শক্তি নিয়োগ করবো। আমি সেই বক্তৃতায় আরো বলি যে আমরাই ইতালির জনগণের সত্যিকারের প্রতিনিধি। তাই আমাদের একথা বলার অধিকার রয়েছে যে এসো তোমাদের বিদ্বেষ, রাগ, ঈর্যা এবং আমাদের পুঞ্জীভূত ক্রোধ ইত্যাদিকে ছাই-য়ে পরিণত করে বাতাসে উড়িয়ে দেই। যাতে ইতালির জনসাধারণ শুধু বছরের পর বছর নয়, শতাব্দী ধরে পুষ্ট আহার পেতে পারে, আর দেহের পুষ্টির মাধ্যমে দেশের সেবা করতে সমর্থ হয়।

সংসদ ভবনকে প্রার্থনার সময়ের মতো শান্ত, ভারসাম্য সম্পন্ন এবং ন্যায্য বিচারের জায়গা করার প্রয়োজনীয়তা আমি ভেতরে ভেতরে অনুভব করছিলাম। কারণ গভীর এবং নির্মল এক প্রশান্তিময় শান্তি-ই ছিল আমার কাম্য। তবে আমার বক্তৃতা ওপরে ওপরে সফল হলেও সংসদীয় রাজনীতির টানাপোড়েন তা'তে কিন্তু এতোটুকুও কমে নি।

সোশ্যালিষ্টদের সবচেয়ে নরম জায়গায় গিয়ে আঘাতটা লেগেছে। ওরা বাস্তবের ধাক্কায় চিৎপাত হয়ে পড়েছে। কারণ তখন ওদের চারিদিকে সংখ্যার রেখা টানা হয়ে গেছে। ইতালির ঝাঁকে ঝাঁকে যৌবনকে দ্রুত ফ্যাসিবাদের বৃত্তে ছুটে আসতে দেখে হতদ্যম হয়ে পড়ে। বুঝতে পারে ইতালির জনগণ তাদের দিগ্ দর্শন ইতিমধ্যে বদলে ফেলেছে। নতুন রাজনৈতিক বাস্তবতা ওদের দিকে পিঠ ঘুরিয়েছে। ওরা বিপর্যস্ত। এই চরম পরিস্থিতিতে

সোশ্যালিষ্টরা শেষ আশ্রয় হিসেবে নিজেদের সমর্পণ না করার পালাটাই বেছে নেয়। বিশেষ করে সংসদে।

প্রতিটি রাজনৈতিক কাজে ধূর্ত এবং পারদর্শী ওরা যতোরকম ছল চাতুরী সম্ভব করে চলে। সন্দেহ নেই সেই ধূর্তামী আর চালাকির মাত্রা অন্তহীন। ইচ্ছে করেই দেশকে ছিঁড়ে টুক্‌রো টুক্‌রো করে ধ্বংসের পথে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা চালায়। এই গুপ্ত ধ্বংসাত্মকের কাজে সবচেয়ে বেশি নৈপুণ্য দেখিয়েছিল মাটিয়োটি ; মন্ত্রী হিসেবে দলে যার উঁচু সিংহাসনে অবস্থান ছিল। রোভিগো প্রদেশ থেকে আসা সোশ্যালিষ্ট মাটিয়োটি চরিত্রগতভাবে ছিল একগুঁয়ে ; জেদী। বিশেষ করে আশাহত রাজনৈতিক ব্যাপারে। সোশ্যালিষ্ট হিসেবে মাটিয়োটি যুদ্ধকে ঘৃণা করতো। এমন কি ওর চিন্তাধারা এমন একটা বিমূর্ত জায়গায় গিয়ে পৌঁছেছিল যে অন্য সোশ্যালিষ্টরা তা কল্পনাতেও আনতে পারতো না। কাপারিতোর দুঃখজনক পরাজয়ের পর ভেনিসে বসবাসকারী উদ্বাস্তুদের ওপরেও ওর বিরূপতা কম ছিল না। যেসব দুঃখী লোক শত্রুরা হানা দেওয়ায় এবং অষ্ট্রিয়ানদের অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে পালিয়ে এসেছিল, তাদের পর্যন্ত আশ্রয় দিতে মাটিয়োটি অস্বীকার করে। সোজাসুজি বক্তব্য রাখে যে এই উদ্বাস্তুদের উচিত অষ্ট্রিয়ার শাসনে থাকা।

বর্তমানের সংসদীয় বিতর্ক যুদ্ধে মাটিয়োটি তার ব্যাগ ভর্তি ধ্যান-ধারণা নিয়ে হাজির হয়। কোটিপতি হওয়াতে ওর ধারণায় সোশ্যালিজিম হলো একটা সংসদীয় প্রণালী মাত্র। তবে একথা মনে রাখা দরকার যে মাটিয়োটি অক্লান্ত যোদ্ধা ছিল এবং তার সংগ্রামের ঝড় কখনো কখনো ওর পরামর্শদাতাদেরও বিরক্ত উৎপাদন করতো।

তবে বিধানমন্ডলীকে গভীর ভাবে নেওয়া বা ফ্যাসিজিমকে বাস্তব অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে মেনে নেওয়াটা ওর ধাতে ছিল না। কারণ মাটিয়োটি নেতা ছিল না। এই সোশ্যালিষ্ট দলেই কিন্তু এমন অনেকে ছিল যাদের তর্ক করার ক্ষমতা, প্রতিভা বা সহনশীলতা মাটিয়োটির চেয়ে অনেক বেশি ছিল। যে প্রদেশ থেকে মাটিয়োটি নির্বাচিত হয়েছে, সেখানে ফ্যাসিষ্টদের বিরুদ্ধে ভয়ানক রকমের সশস্ত্র সংগ্রাম করেছে ; আবার সংসদে ওকে সবচেয়ে ঈর্যাপরায়ণ এবং কলহপ্রিয় ভূমিকা নিতে দেখা গেছে।

হঠাৎ একদিন মাটিয়োটি রোম থেকে অদৃশ্য হয়। সঙ্গে সঙ্গে বাতাসে একটা গুজব ছড়িয়ে পড়ে যে এই ঘটনার পেছনে রাজনৈতিক কোন অপরাধ সংঘটিত হয়েছে। সোশ্যালিষ্টরা এতোদিন কাউকে শহীদ করা যায় কিনা সেটা খুঁজে বেড়াচ্ছিল। যাতে তাদের বক্তৃতার বিষয়বস্তু গরম গরম পরিবেশন করা যায়। কোন কিছু নির্দিষ্টভাবে জানার আগেই ওরা ফ্যাসিবাদকে দোষারোপ করতে থাকে। আমি উদ্বিগ্ন হয়ে পূর্ণ তদন্তের আদেশ দেই। ইতিমধ্যে সরকার এই ঘটনার বিস্তারে যেতে মনস্থির করে। শুধু ন্যায্য বিচারের তাগিতে-ই নয়, যাতে সরকার বসার প্রথম মুহূর্ত থেকে এই ধরনের গুজব না ছড়ায়। আমি রোমের পুলিশ প্রধান, স্বরাষ্ট্র দপ্তরের সেক্রেটারী, ফিনজী এবং প্রেস অফিসের চীফ সীজারে রোসীকে এই রহস্যের ওপরে পড়া পর্দাটাকে যতো সত্বর সম্ভব তুলতে আদেশ দেই। দোষীরা যাতে পুলিশের হাতে ধরা পড়ে তার ব্যবস্থাও করি। অতি শীঘ্র অপরাধীকে সনাক্ত করাও সম্ভব হয়। উঁচু পদের লোক ওরা। ফ্যাসিষ্ট দলের হলেও ওরা আমার দায়িত্ব দেওয়ার বাইরের লোক। অপরাধীদের বিরুদ্ধে যতো শক্ত সম্ভব শাস্তির ব্যবস্থা করা হয়। আর এই শাস্তির সীমা পরিসীমা ছিল না। কঠিন ব্যবস্থা নেওয়া হয় আর সেই কঠিন ব্যবস্থা অনেক ক্ষেত্রেই সীমা ছাড়িয়ে যায়।

সন্দেহজনক ব্যক্তিকে তৎক্ষণাৎ গ্রেপ্তার করা হয়। অপরাধীর সঙ্গে যাদের যোগাযোগ ছিল তারাও রেহাই পায় না। আর পুলিশ বা কোর্টকে এই ব্যাপারে কোনরকম সূতো টেনে থামাবার ব্যবস্থা করা হয় নি। কড়া হাতে ব্যবস্থা নেওয়ায় ঝড় কিন্তু থেমে যাওয়া উচিত ছিল। উপরন্তু এই নাটকীয় ঘটনাবলীর অবতারণা করাই হয়েছিল যে প্রশান্তভাব কঠোর হাতে দেশের ওপরে ন্যস্ত করার চেষ্টায় ছিলাম, সেই সুস্থিত পরিবেশটাকে বিষিয়ে দেওয়ার জন্য। যদিও আমরা তখনো অস্থির এবং রাগ দ্বেষ আর দাঙ্গা-হাঙ্গামায় পরিপূর্ণ একটা পরিবেশে ছিলাম, তবু ভাবি নি সাতাশতম বিধান মণ্ডলী উদ্বোধন হওয়ার কয়েকদিনের মধ্যে একদল লোক এই ধরনের নৃশংসতম খেলায় মেতে উঠবে। তবে ঘটনা প্রবাহের প্রতি আমি কখনো সহানুভূতির ছিঁটে ফোটাও দেখাই নি। বরং কর্কশ এবং কঠিন শব্দ-ই ব্যবহার করেছি। সরকারের তরফ থেকে যতো বিশ্বাসযোগ্যতার চেষ্টা করা হয়েছে, ওরা ফ্যাসিবাদ এবং তার নেতাদের ততোই বেশি বিরোধীতা করেছে। এতোটুকু তুলনা করার প্রয়োজন বোধ করে নি। সংসদে বিরোধী পক্ষ কিন্তু ততোদিনে ভীষণভাবে আক্রমণ করার সংকেত দিয়ে দিয়েছে। আমি তখন ওদের নীচ্ খেলাটাকে বুঝে গেছি। আর এই খেলা ওরা শুরু করেছে গরীবদের প্রতি ভালোবাসা বা সমৃদ্ধির জন্য নয় ; একমাত্র ফ্যাসিবাদকে ঘৃণা করাই ছিল ওদের উদ্দেশ্য। তবে ব্যাপারটাতে আমি অবাক যেমন হই নি, বিস্ময়বোধও করি নি। সংসদের দুর্বল সভ্যরা যখন পুরো ব্যাপারটা নিয়ে ইতস্তত করছে, আমি তখন দৃপ্তকণ্ঠে বলি ঃ

যদি শোক জ্ঞাপনের প্রশ্ন আসে, প্রশ্ন আসে কাউকে দোষী সব্যস্ত করার অথবা মৃতদের প্রতি শ্রদ্ধা জানানোর বা দোষীদের প্রতি তদন্ত করা—এইসব-ই করা হবে নিখুঁত ভাবে এবং সুস্থ শান্ত পরিবেশে। তবে এই দুঃখজনক ঘটনাবলীর থেকে যদি কেউ ফায়দা তুলতে চায় এবং নিজেদের রাজনৈতিক স্বার্থপরের মতো সরকারকে আক্রমণ করে সরকারের চরিত্র হননের চেষ্টা করে, তবে তাদের এটাও জানা উচিত যে সরকার যে কোন মূল্যে সরকারকে রক্ষা করবে। সরকার মসৃণ ভাবে শাসনের জন্য সুস্থ পরিবেশ গড়ে তুলতে চায়, যাতে বর্তমান কর্তব্য যেমন সুন্দরভাবে চালিয়ে যাচ্ছে, ভবিষ্যতেও তার কর্তব্য কর্ম নিষ্ঠার সঙ্গে করে যেতে পারে। তারজন্য প্রয়োজনে এই ষড়যন্ত্র ভাঙার জন্য অত্যন্ত কঠোর ব্যবস্থা নেবে। যাতে এই ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে ইতালির জীবনধারা আবার বিষিয়ে উঠতে না পারে।

ইতিমধ্যে শক্ত হয়ে যাওয়া মনগুলোতে কিন্তু আমার বক্তব্য এতোটুকু দাগ কাটে না। আর পরিণতিতে আমি যা মানসচক্ষে দেখেছিলাম, সেই ঘটনাগুলোই এক নাগাড়ে ঘটতে থাকে। বিরোধীপক্ষ মাটিয়োটির মৃতদেহের ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে রাজনৈতিক আবহাওয়াকে বিষাক্ত করে তোলে এবং ইতালিতে আর বহির্বিশ্বে ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে মানহানিকর নিন্দার ঝড় তোলে।

১৯২৪ সালের জুন থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত জনসাধারণের জীবনে রাজনীতিকদের যে খেলা চলেছিল, পৃথিবীর অন্য কোন দেশে তার তুলনা মেলা ভার। যে কোন রাজনৈতিক দলের পক্ষেই এটা একটা অত্যন্ত লজ্জাজনক এবং নিন্দনীয় ব্যাপার। সংবাদপত্র, মিটিং-মিছিল, ফ্যাসিবাদের বিরোধীতা করা সমস্ত দল, ভান করা বুদ্ধিজীবি, পরাজিত নির্বাচন প্রার্থী ইত্যাদি সবাই একসঙ্গে মিলে শকুনের মতো মৃতদেহটার ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে। তাদের মতে

অপরাধীকে শুধুমাত্র গ্রেপ্তার করাটাই যথেষ্ট নয়। এমন কি মেডিকেল সার্জেনের বক্তব্যের মধ্যেও ওরা গল্‌তি খোঁজে।

রোমের কাছে একটা ঝোপের আড়ালে মৃতদেহটা পাওয়া যায়। অঞ্চলটার নাম কোয়ারটারেলা। আমার মনে হয় এর সঙ্গে যেন অপমানজনক শব্দ কোয়ারটারেলিজমোর যথেষ্ট মিল রয়েছে।

মাটিয়োটির মর্মান্তিক ঘটনার ওপরে ওরা নিজেদের ভাগ্য গড়ে তুলতে চায়। মাটিয়োটির ভাস্কর্য তৈরি করে স্থাপন করে ; মেডেলে প্রতিমূর্ত্তি খোদাই থেকে শুরু করে শহীদ দিবস, ইলেকট্রিকের সাইনবোর্ড ইত্যাদি সবকিছুর মাধ্যমে ব্যাপক প্রচার চালায়। ধ্বংসমূলক পত্রিকাগুলো এই ব্যাপারে চাঁদা আদায় করে একটা ব্যাংক অ্যাকাউন্টস্‌ও খোলে। যে অ্যাকাউন্টস্ এখনো পর্যন্ত খোলা অবস্থাতেই রয়েছে।

বিরোধীদলগুলো এবং ওদের প্রতিনিধিবর্গ মনটেসিটোরিও থেকে সরে দাঁড়ায়। এমন কি একথাও বলা চলে যে ওরা আর বিধানমন্ডলীর কোন কাজে অংশগ্রহণ করবে না। এই তথাকথিত আন্দোলন এবং আন্দোলনকারীরা অতীতদিনের ইতিহাসের বিখ্যাত নায়ক আভান্তিনোর সঙ্গে নিজেদের জড়িয়ে প্রচার করতে শুরু করে। কিন্তু এই তথাকথিত আভান্তিনোর দল শেষ পর্যন্ত নিজেদের হাস্যকর অবস্থাতে নিয়ে আসে। যাতে ঘৃণিত ক্ষমতার লোভে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের লোকেরাও দলে দলে এসে নাম লেখায়। এদের মধ্যে সোশ্যালিষ্ট থেকে লিবারেল, ডেমোক্র্যাট থেকে পপুলার সবাই উপস্থিত ছিল। নিজেদের ক্যাথলিক বলে প্রচারের সময় তুলে ধরে। গোপনে ওরা এখানে ওখানে জমায়েত হয়ে মিটিংও করে। সেইসব মিটিংয়ে ওদের বক্তব্য ঘুরিয়ে ফিরিয়ে একটাই থাকে যে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা এবং বিধানমন্ডলী ইতালির জীবনযাত্রাকে ধ্বংস করার জন্য। মৌলবাদীর দল ঘণ্টার পর ঘণ্টা এক-ই কথা বলে চলে স্রেফ ফ্যাসিবাদকে উৎখাত করার জন্য। এই ন্যাক্কারজনক নাটকীয় পটভূমিতে সেনেটার অ্যাল্‌বারতিনি ছিল পরম খুসী হওয়া একজন সংবাদপত্রের মালিক। অ্যাল্‌বারতিনি প্রায় প্রতিটি মিটিংয়ে উপস্থিত থেকে এই নোংরা বক্তৃতাগুলো শুনতো আর মিথ্যা প্রচার পত্রগুলো সংগ্রহ করে সুযোগ সুবিধা মতো আমার এবং ফ্যাসিবাদের ওপরে ছুঁড়ে মারার চেষ্টা করতো।

তবে এইসব ঘটনায় মুহূর্তের জন্যও আমি নিরুৎসাহ হই নি। কারণ বিরুদ্ধপক্ষের এই ধরনের মনোভাব, ধরন ধারণ আমি আগে থেকেই জানতাম। আমি আরো জানতাম যে সোশ্যালিষ্ট মন্ত্রীর মৃতদেহটাকে ওরা ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে নোংরা ভাবেই ব্যবহার করবে। তবে ওদের এই পৈশাচিক রাজনীতি আমার কল্পনাকেও ছাড়িয়ে যায়। ওদের ছাড়াও ফ্যাসিবাদের মধ্যে কিছু কাপুরুষ ছিল, যারা ওদের এই রাজনৈতিক পরিবেশ ঘুলিয়ে দেওয়ার প্রচেষ্টাকে বাধা তো দেয়-ই নি, বরং নীরব দর্শক সেজে থেকেছে। ওরা কল্পনাতেও আনতে পারে নি যে এইসব ঘটনার সমন্বয়ে কখনো ইতিহাস গড়ে ওঠে না। আবেগপ্রবণ নৈতিকতার দোহাই পেড়ে ওরা জাতির রাজনৈতিক এবং জাতীয় মঙ্গলকেই পেছনে থেকে ছুরি বিদ্ধ করতে চেয়েছে।

এই পরিবেশ এবং পরিস্থিতিতে অনেক পতিতা-প্রবৃত্তির লোক ফ্যাসিবাদ সম্পর্কে অনুশোচনায় ভুগতে শুরু করে। ওদের ধারণায় বিরুদ্ধপক্ষের যাবতীয় কাজকর্ম শোনার মতো

মূল্যবান ; তাই তারা ফ্যাসিবাদকে ক্রমশ ছেড়ে দিতে থাকে। অবশ্য বিরোধীপক্ষের হাজারো আক্রমণ এবং প্রতি আক্রমণে সমস্ত পরিবেশটাই তখন উত্তপ্ত।

আমরা যেন তখন বিপ্লবের সেই গভীর দিনগুলোয় ফিরে চলেছিলাম। অস্বাভাবিক সেই সময়টা পরস্পরের প্রতি দ্বেষ, দাঙ্গাহাঙ্গামায় কলুষিত হয়ে ওঠে। পরিস্থিতি এমন একটা জায়গায় গিয়ে দাঁড়ায় যে বিরোধীদের অনুপ্রেরণায় অনেক বিচারক পর্যন্ত যথাযথ এবং আদর্শ বিচার না করেই তাদের রায় দিয়ে দেয়। সীমান্তের ওপার থেকে অনেক দল দেশের ভেতরের সোশ্যালিষ্টদের প্রতি সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়। এইসব ঘটনায় পরিষ্কার হয়ে যায় যে আন্তর্জাতিক কতোগুলো অংশে ফ্যাসিবাদকে তারা কিভাবে তাড়া করে ফিরছে— যার জন্য ডেমোক্র্যাসি, সোশ্যালিজিম, লিবারেলিজিম ইত্যাদি একসঙ্গে হাত মিলিয়ে পেছন থেকে ছুরি শানাচ্ছে। তথাকথিত দেশপ্রেম, ভয় দেখানো এবং পরগাছা প্রবৃত্তি একসঙ্গে মিলে মিশে গেছে।

এইসব ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে অনেকেই স্বপ্ন দেখে যে সরকার দুর্বল হয়ে পড়েছে। ১৯২৪ সালের ডিসেম্বর মাসে অর্থাৎ যন্ত্রণাবিদ্ধ তিনটে মাস অতিক্রান্ত হওয়ার পরে অনেকেই মন্ত্রীসভার পতনের দিন গুণতে শুরু করে। রাজনৈতিক বুভুক্ষদের হৃদয়ে উৎসাহের ঢেউ ওঠে। সত্যি বলতে কি ভূতপূর্ব মন্ত্রীসভার তিনজন প্রেসিডেন্টের দুঃখজনক ছল চাতুরী এই সময়ের বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা। ওরা শুধু নিজেদের নয়, বাকীদেরও প্রতারণা করতে সক্ষম হয়েছিল। তবে এইসব পেশাদার রাজনীতিবিদরা একবারও ভাবে নি যে ব্ল্যাকসার্টদের প্রতি আমার একটা ইঙ্গিতেই ওদের সব স্বপ্ন ভেঙে চুরমার হয়ে যেতে পারে।

ফুলে ফেঁপে ওঠা ব্যাঙের দল তখন জয়ের জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে। দুর্নীতিগ্রস্থ সংবাদপত্রগুলো জোর প্রচার চালিয়ে চলেছে। হ্যাঁ, অপরাধ করার স্বপক্ষে এবং মর্যাদা হানিকর বিষয়বস্তুকে ঘিরে। সমাজের ভারসাম্য রক্ষা করার যে রাজমুকুট, তার বিপক্ষে নোংরা প্রচারের দ্বারা একদিকে যেমন চরিত্র হনন করছে, অপরদিকে তাকে ভয় দেখিয়ে ফয়দা লোটার চেষ্টার কসুরও কম ছিল না। চিরকালের মতো একদল দাঁড়িপাল্লার একটা দিক ঝুঁকিয়ে রাজনৈতিক পুনর্জন্মের চেষ্টায় তখন ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। বিশেষ করে অনিষ্টকর নাবিক হিসেবে আমার দিকে আঙুল তুলে ওরা শুধু আমার পরিবেশটাই নয়, অবস্থানটাকেও নাড়িয়ে দিতে চেষ্টা করেছে।

এতো সব কান্ড কারখানা করেও ওরা যেন তৃপ্ত হয় না। চক্রটাকে সম্পূর্ণ করার জন্য ১৯২৪ সালের ডিসেম্বরের অন্ধকারময় দিনটাকে ভূতপূর্ব প্রেসের চীফ সীজার রোসী নোংরা আরো একটা খেলার জন্য বেছে নেয়। মাটিয়োটি কেলেংকারীতে যুক্ত থাকায় ওকে ফ্যাসিষ্ট পার্টি থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। ও একটা শহীদ স্মৃতি সম্পূর্ণ মিথ্যার ওপরে তৈরি করে। চেষ্টা করে সেই শহীদ স্মৃতিতে সমগ্র ফ্যাসিষ্ট শাসন কর্তাদের সঙ্গে আমাকেও জড়িয়ে নিতে। যা ঘটেছে বা ঘটতে চলেছে সব কিছুর জন্য আমাকে দায়ী করে পুরো কলংকের বোঝাটা আমার দরজার সামনে ফেলে দিতে সচেষ্ট হয়। এই শহীদের স্মৃতি এমনভাবে লোকটা লিখেছিল যে নৈতিকতার দোষে আমাকে অভিযুক্ত করে যাতে জনসাধারণের কাঠগড়ায় দাঁড় করানো যায়। কিন্তু এই ব্যাপারে আমাকে দোষী সাব্যস্ত করা কিছুতেই সম্ভব ছিল না। কারণ আমার প্রতি এই ধরণের আক্রমণ যে ফাঁকা আওয়াজে পর্যবেসিত হবে সবাই

তা' জানতো। আর রোসীর ষড়যন্ত্র সম্পর্কে আমি আগেই খবর পেয়ে গিয়েছিলাম। যেহেতু এই শহীদের স্মৃতির বিষয়বস্তু আমার আগেই জানা ছিল, তাই যেদিন বিরুদ্ধপক্ষীয় সংবাদপত্রে এটা প্রকাশিত হওয়ার কথা, তার আগেই বন্ধুভাবাপন্ন একটা সংবাদপত্রে এটা ছেপে দিয়ে রোসীর চালাকি আমি ভেঙে দেই। বুঝিয়ে দেই যে এই ধরনের বিরুদ্ধ প্রচারের আমার কাছে কোন মূল্য নেই। নাটকীয়ভাবে আঘাতের প্রচেষ্টা শূন্যে আস্ফালন হয়ে দাঁড়ায়। একটা ফোলানো বেলুন সূচ ঢুকিয়ে কেউ যেন হঠাৎ চুপসে দেয়।

পরস্পরের প্রতি কাদা ছোঁড়াছুড়ির খেলা চলে মাস ছয়েক ধরে। তারপরে ধীরে ধীরে তা আস্তিনের নীচে গুটিয়ে আসে। গায়কদের বিষাদে ভরা গলার গান একসময় দাঁড়ে বসা পাখির ক্রমাগত একটানা ধ্বনির মতো শোনায় ; এই বিষয়ের জুয়াড়ীদের মধ্যে একসময় একঘেয়েমীর জন্য বিতৃষ্ণা আসে। সেই সময় ভূতপূর্ব একজন মন্ত্রী যে নাকি কোলারে ডেল যে ইতালির সার্বভৌমিকতার পুরস্কার পেয়েছিল, সেই আনুনজিয়োটা রিপাবলিক্যান কালচারের বশবর্তী হয়ে নোংরা সোশ্যালিষ্টদের সমান্তরালে এসে দাঁড়ায়।

এই সময়ে আমি দৃঢ় হাতে পার্টিকে ধরে রাখি। প্রতিশোধ নিতে বদ্ধপরিকর কিছু ফ্যাসিষ্টের আবেগকে আমাকে বাধ্য হয়ে সংযত রাখতে হয়। আমার হাত ছাড়া আর সবার হাত পকেটস্থ করার আদেশ দেই। কিন্তু তা সত্ত্বেও ফ্লোরেন্স আর বোলোনিয়া শহরে দাঙ্গা-হাঙ্গামার কিছু ঘটনা ঘটে। বুঝতে পারি আমার পক্ষে কিছু করা এবং বক্তব্য রাখাটা একান্ত প্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছে।

তবে সেই সময়টায় আমি নিজেকেই বাহবা দেই যে শান্ত ভাবে সব পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে পেরেছি এবং কখনোই মানসিক ভারসাম্য যেমন হারাই নি, তেমনি ন্যায় বিচারের পথ থেকেও সরে আসি নি। আমি আমার প্রতিটি কাজকর্মের চুল চেরা বিচার বিশ্লেষণ করেছি; অপরাধী যে দলের হোক না কেন তাকে গ্রেপ্তারের আদেশ দিতে এতোটুকু ইতস্তত করি নি। কারণ আমি সব সময়ে চেয়েছি বিচার যেন সোজা পথে চলে। বর্তমানে তাই মানুষ হিসেবে আমার কাজ এবং কর্তব্য সম্পাদন করতে পেরেছি বলেই মনে করি। সুতরাং বিরোধীদের বিরুদ্ধে সোজাসুজি মাঠে নেমে পড়াতে আজ আর কোন বাধা নেই। প্রকাশ্যেই তা' করা যেতে পারে।

রোম প্রদেশে যখন সর্বাত্মক ধর্মঘট ডাকা হয়েছিল, আমি মিলিশিয়ার ফ্লোরেনটাইন লিজিয়েনকে আদেশ দেই রাজধানীর রাস্তায় প্যারেড করার জন্য। সশস্ত্র মিলিশিয়া যুদ্ধের গান গাইতে গাইতে সমস্ত শহর পরিক্রমা করে। রোমবাসী তা'তে কিন্তু যথেষ্ট আশ্বস্তবোধ করে। ১৯২৪ সালের সেপ্টেম্বরে টুসাকানের অনেক জায়গাতে গেছি, দাঙ্গা-হাঙ্গামার জন্য যেসব জায়গা টান টান হয়েছিল। আমিয়াটার যেখানে উত্তেজনা প্রবণ বলে খ্যাত। সেইসব মানুষের সঙ্গে যেমন মিশেছি, তেমনি দেখা করেছি চাষী শ্রমিক আর সিয়েনা প্রদেশের খনি শ্রমিকদের সঙ্গেও। যখন বিরুদ্ধপক্ষ আমার পতনের জন্য প্রহর গুণছে, সীমান্তের ওপারের শত্রুরা মুখিয়ে আছে, তখন ফ্যাসিষ্টদের উদ্দেশ্য যে বক্তব্য রেখেছি, তার প্রতিটি বাক্যে শৌর্য আর জয়ের স্পন্দন ছিল।

বিরোধীপক্ষের প্রতি আমার বক্তব্য ছিল যে ব্ল্যাক সার্টদের জন্য আমরা প্রসবগৃহ তৈরি করবো।

বিরুদ্ধদলের সংবাদপত্রসমূহ প্রসবগৃহ শব্দটাকে নিয়ে ঠাট্টা তামাসা কম করে না। তবে ওদের কচকচানিকে মোটেই আমি গুরুত্ব দেই নি। সেটা ১৯২৫ সালের ৩রা জানুয়ারী আরো স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তখন রোমে বিভিন্ন প্রদেশ থেকে আসা রাজনৈতিক ভীড়ে থিক থিক করছে। ওরা এই রাজনৈতিক সংঘর্ষ আর টানাপোড়ানির ইতিও দেখতে চাইছে। সেই দিনে পার্লামেন্টে যে বক্তব্য রেখেছিলাম, তা' যথেষ্ট উল্লেখযোগ্য।

ভদ্রমহোদয়গণ,

আমার এই বক্তৃতা হয়তো বা সংসদীয় রীতিনীতি মেনে দেওয়া হচ্ছে না। হ'তে পারে বক্তৃতার শেষে অনেকেই আমার বক্তব্যর সঙ্গে সহমত হবে না। তবে ইতিমধ্যে সময় গড়িয়ে গেলেও ১৬ই নভেম্বর এই সভাগৃহে-ই আমি আমার বক্তব্য রেখেছিলাম। আমার সেই বক্তব্য জনসাধারণকে এগিয়ে নিয়ে গেলেও তা'তে ব্যালেট বাক্সে ভোট বৃদ্ধির সম্ভাবনা নেই বললেই চলে। তবে যাই হোক না কেন এই বক্তৃতার মাধ্যমে আমি ভোট চাইছি না। তা' আমার লক্ষ্যও নয়। কারণ ভোটে আমার খামতি নেই। বরং প্রয়োজনের চেয়ে বেশি-ই আছে। যাইহোক অনুচ্ছেদ সাত চল্লিশে স্পষ্ট বলা হয়েছে যে মন্ত্রী পরিষদে ক্ষমতা আছে কোন মন্ত্রীকে দোষী সাব্যস্ত করার পরে হাইকোর্টে বিচার প্রার্থী হ'তে বাধ্য করা। আমি তাই সবার সামনে প্রশ্ন রাখছি যে সংসদের ভেতরে বা বাইরে এই অনুচ্ছেদ সাত চল্লিশের ব্যবহার করতে চায় কিনা। কারণ তা'হলে ব্যাপারটা আরো পরিষ্কার হয়ে যাবে। আর আমার বক্তব্যের উদ্দেশ্যও সেটা। দীর্ঘদিন কমরেডদের সঙ্গে একসঙ্গে পথ হেঁটেছি। বর্তমানে থমকে দাঁড়িয়ে চিন্তা করছি ভবিষ্যতেও আমাকে এই একইভাবে কমরেডদের সঙ্গে পথ হাঁটতে হবে কিনা।

ভদ্রমহোদয়গণ, আমি-ই বোধহয় সর্বপ্রথম এবং একমাত্র ব্যক্তি যে নিজের বিরুদ্ধে উত্থাপিত দোষারোপ গুলোকে এই সভাগৃহে টেনে এনেছে। অনেকেই বলে যে আমি নাকি চেক্কা স্থাপন করেছি।

কিন্তু আমার প্রশ্ন, কোথায়? কখন? এবং কিভাবে? এই জিজ্ঞাসাগুলোর যথাযথ উত্তর কিন্তু কারোর কাছ থেকে পাই নি। সরকারী তথ্য থেকে দেখা যাচ্ছে রাশিয়া বিনা বিচারে এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার থেকে এক লক্ষ যাট হাজার নিরাপরাধ মানুষের প্রাণ নিয়েছে। আর রাশিয়াতে চেক্কা ক্রমাগত মধ্যবিত্ত পরিবারগুলোকে আতঙ্কগ্রস্ত করে রেখেছে। আর তথাকথিত রাশিয়ার বিপ্লবীরা এই চেক্কাকে বিপ্লবের তরবারী বলে আখ্যা দিয়েছিল। কিন্তু ইতালিতে চেক্কা দূরে থাক, তার ছায়ার অস্তিত্ব পর্যন্ত ছিল না।

কেউ কিন্তু অস্বীকার করে নি যে আমার ভেতরে তিনটে গুণ বিদ্যমান। কৃতিত্বপূর্ণ বুদ্ধিমেত্তা, অদম্য সাহস আর টাকা-পয়সার প্রতি বিন্দুমাত্র লোভ না থাকা, বরং অনীহা।

যদি চাইতাম তবে চেক্কা প্রতিষ্ঠা করার কোন অসুবিধাই ছিল না। কিন্তু নীচের কারণগুলোর জন্য হিংসাকে আমি সব সময় দূরে সরিয়ে রাখতে চেয়েছি এবং তা' ইতিহাসের পৃষ্ঠা থেকে কখনোই মুছে ফেলা যাবে না।

আমি সব সময়েই একটা কথা বলে এসেছি এবং দীর্ঘ পাঁচ বছর ধরে যারা আমার সঙ্গে থেকে কঠিন সংগ্রাম করেছে তারা জানে যে আমার মত কোন সমস্যাকে হিংসা দিয়ে যদি দমন করতে হয়, তবে তা' সুচারু, বুদ্ধিমত্তা এবং অত্যন্ত ভদ্রতার সঙ্গে সেই হিংসাকে প্রয়োগ করতে হবে।

কারোর পক্ষেই বোধহয় অনুমান করা সম্ভব নয় যে যীশুখৃষ্টের জন্মের বর্ষপূর্তি উপলক্ষ্যের দিন, যখন বাতাসে তার পবিত্র অস্তিত্ব ভেসে বেড়াচ্ছে, তখন সকাল দশটায় রোমের ভিয়া ফ্রান্সোসে ক্রিসিপেতে আমি কাউকে হত্যার আদেশ দেবো। আর তা'ও সরকার গঠনের পরে এতো সান্ত্বনাসূচক বক্তব্য রাখার পাশাপাশি।

দয়া করে আমাকে এতো বোকা ভাবাটা বোধহয় ঠিক হবে না। আমি কি মিসুরী বা ফোর্নির পেছনে ক্ষুদ্রতম হিংসা দর্শনের জন্য বুদ্ধিমত্তার অভাব দেখিয়েছি? আমার দেওয়া ৭ই জুনের বক্তৃতা নিশ্চয়ই আপনাদের মনে আছে। সেই উগ্র রাজনৈতিক দিনগুলোয় পেছিয়ে গেলে নিশ্চয়ই স্মরণে আসবে, প্রতিদিন সংখ্যালঘু এবং গুরুদের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনাপ্রবাহ। এক একজন তো বিরোধীপক্ষের তোয়াক্কা না রেখেই রাজনৈতিক এবং নাগরিক আইন অমান্য করার কথা বলতো। অগ্নিবর্ষী বক্তৃতার টুক্‌রোগুলো সভাগৃহের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে ছুটে বেড়াতো। শেষে ৬ই জুন দেলক্রয়িস্ক তার ছন্দভরা, প্রাণবন্ত কিন্তু ঝড়ের টানাপোড়ানিতে মোড়া বক্তব্য রাখে।

পরের দিন পরিস্থিতি এবং পরিবেশটাকে নির্মল করার জন্য আমি বক্তব্য রাখতে উঠি। বিরোধীদের উদ্দেশ্যে বলি,—আমি আপনাদের আদর্শকে সম্মান করি, আপনাদের শর্ত সাপেক্ষ শর্তাবলীর প্রতিও আমার কম শ্রদ্ধা নেই। আপনাদের অভিজ্ঞতা দিয়ে হয়তো বা ফ্যাসিবাদকে পাশ কাটিয়ে এগিয়ে যেতে পারেন ; বর্তমান ফ্যাসিষ্ট সরকার যে সব ব্যবস্থা নিয়েছে, সেইসব ব্যবস্থার সমালোচনায় মুখর হয়ে ওঠাটাকেও আমি নিন্দনীয় বলে মনে করি না।

তবে আমার স্মরণে শুধু নেই, চোখের সামনে ভাসছে এই সংসদের একটা ছবি। আমি যখন গভীর কথাগুলো প্রাণবন্ত করে আমার বক্তব্য রাখছিলাম, এই সংসদে উপস্থিত সবাই তখন টুঁ শব্দ না করে মনযোগ দিয়ে শুনছিল। এটা ছাড়া কিন্তু আজ একটা রাজনৈতিক জমায়েত করাও সম্ভব হয়ে উঠতো না।

এইরকম চমৎকার সাফল্যের শেষে, হ্যাঁ, বিনয় ছাড়াই বলছি আমার সেই বক্তব্যকে সংসদে বিরোধীরা সহ সবাই সপ্রশংস ভাবেই মেনে নিয়েছে। গত বুধবার সংসদ বসার সময় এই সংসদের পরিবেশও ছিল অনুকূল। সুতরাং পাগলের মতো প্রতিহিংসা-পরায়ণ হয়ে ওঠার পেছনে তো কোন কারণ ইতিমধ্যে ঘটে নি। হত্যা টত্যা দূরে থাক, সামান্য সংঘর্ষও তো হয় নি।

ঝিঁ ঝিঁ পোকার মতো মনোভাব সম্পন্ন লোকগুলোর ধারণা আমি ঘটনার দিকে বিতৃষ্ণ হয়ে মোড় ঘুরে দাঁড়িয়েছি। তবে এটা সত্য যে সহ্যের শেষ সীমায় আমি দাঁড়িয়ে ; অন্তর রক্তাক্ত হয়ে উঠেছে। তাই মনে হয় শক্তির বদলে আমারও শক্তি দেখানো উচিত।

কি শক্তি? কাদের বিরুদ্ধে তা' প্রয়োগ করবো? আর সেই শক্তি প্রয়োগের লক্ষ্যটাই বা কি হবে? যখনই এই কথাগুলো চিন্তা করি, তখনই পশ্চাদ্‌পসরণের কথা মনে পড়ে যায়। যুদ্ধের সময় ট্রেঞ্চের ভেতরে বসে যখন খাওয়া সেরেছি, ম্যাপের ওপর পিন সেঁটে পরিকল্পনা করেছি—সেই সময়গুলোকে কিছুতেই আমি ভুলতে পারি না। কিন্তু সমস্যার সমাধান কল্পে জরুরী ভিত্তিক দায়িত্ব নিয়ে যখন কিছু করার প্রয়োজন হয়ে পড়ে, তখনই ব্যাপারটা আলাদা রূপ নেয়। কিন্তু তবু এমন উদাহরণ প্রচুর রয়েছে যেখানে আমি আমার উৎসাহ হারাই নি।

তবে মোটামুটিভাবে একথা বলা চলে যে প্রায় সব ঘটনার-ই মোকাবিলা আমি করেছি।

মাত্র ছ'ঘণ্টার মধ্যে রয়াল গার্ডদের বিদ্রোহ আমি কড়া হতে দমন করেছি। বিশ্বাসঘাতকদের কপট বিদ্রোহের কোমর ক'দিনের মধ্যে ভেঙে দিয়েছি। মাত্র আটচল্লিশ ঘণ্টা সময়ের মধ্যে এক ডিভিসন পদাতিক সৈন্যবাহিনী এবং অর্ধেক ফ্লিট নৌ-বাহিনী কার্ফুতে জড়ো করেছি। আমার এই অক্লান্ত শক্তি, বিশেষ করে শেষের ঘটনাটাতে তো বন্ধুত্বপূর্ণ এক দেশের সর্বশ্রেষ্ঠ জেনারেল পর্যন্ত অবাক হয়ে গেছে। এই ঘটনা সমূহ-ই প্রমাণ করে যে প্রয়োজনে আমার শক্তির অভাব কখনো ঘটে নি।

মৃত্যুদণ্ড? ভদ্রমহোদয়গণ, এটা তো হাসির ব্যাপার। সর্বপ্রথমে বলা দরকার এটা পেনাল কোডের একটা ধারা। সরকারের প্রতিশোধ গ্রহণের রাস্তা কাউকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার মাধ্যমে নয়।

একজন নাগরিকের মৃত্যদণ্ডের আদেশ, অত্যন্ত বিচার বিশ্লেষণের পরেই বিচারকের দেওয়া উচিত। যাই হোক সেই মাসের শেষের দিকে যে বক্তব্যটা আমি রেখেছিলাম, সেটাই আমার জীবনে গভীর ভাবে দাগ কেটে গেছে। আমি বলেছিলাম যে ইতালির জনসাধারণের জন্য আমি শান্তি চাই এবং রাজনৈতিক জীবনেও অস্থিরতা পরিত্যাগ করে স্থিরতা নিয়ে আসার বিশেষ প্রয়োজন রয়েছে।

আমার এই নীতিগুলোর কী উত্তর হ'তে পারে? প্রথম হলো আভানটিনোর কাছ থেকে সরে দাঁড়ানো হলো সংবিধান বিরোধী কাজ। এবং স্পষ্টতই বিদ্রোহাত্মক। তারপরে প্রেসের তিন মাস ব্যাপি প্রচার জুন, জুলাই এবং আগস্ট। নোংরা কর্দমময় এই প্রচার আমাদের দীর্ঘ তিন মাস ধরে ক্রমাগত মানহানি করে গেছে সবচেয়ে কলঙ্কজনক মিথ্যাগুলোকে সংবাদপত্রগুলো সত্য বলে চালিয়েছে।

গোপনে ব্যাপারটা ঠিক কি ঘটেছিল তার বিস্তারিত তদন্ত হয়। তদন্ত করতে গিয়ে অপরপক্ষ মিথ্যে বললেও ঘটনার সূত্রগুলো ধরা পড়ে। এই ঝড়ের মধ্যেও আমি নিজেকে শান্ত এবং ধীর স্থির রেখেছিলাম। পরবর্তীতে যারা আসবে, তারা অবশ্যই এই ঝড়ের মধ্যে আমাকে স্থিতধী দেখে লজ্জা পারে। ১১ই সেপ্টেম্বর কেউ একজন একটা হত্যার বদলা নেয়; আমাদের একজন অতি দরিদ্র কিন্তু প্রিয় পাত্রকে গুলি করে হত্যা করে। হতভাগ্যের পকেটে ছিল মাত্র ষাট লিরে। কিন্তু তবুও পরিস্থিতিটাকে আমি আপ্রাণ চেষ্টা করি সহজ করতে। বে-আইনি কাজকর্ম দমন করি। প্রকাশ্যে সত্যটাকে খুলে বলি যে এখনো শ'য়ে শ'য়ে ফ্যাসিষ্ট জেল গরাদের পেছনে রয়েছে।

আমি যখন বলি নির্দিষ্ট দিনেই সংসদ ডাকা হয়েছিল এবং নিয়ম মতো সমস্ত বাজেটের আলোচনাও হয়েছিল। আমার এই কথা কিন্তু সবৈধ ভাবে সত্য ছিল। এতোটুকু মিথ্যার খাদ তা'তে মেশানো হয় নি।

একথা সত্য যে সব মিলিশিয়া-ই শপথ নেওয়া আর জেনারেলরাও সঠিকভাবে নির্বাচিত হয়ে যে যার অঞ্চলের দায়িত্ব ভার নিয়েছিল।

শেষমেষ ওরা এমন একটা প্রশ্ন করে যা মানসিক ভাবে আমাদের উত্তেজিত করে তোলার পক্ষে যথেষ্ট। প্রশ্নটা ছিল জুন্‌তা সরকারের পদত্যাগ দাবী করার অধিকার আমাদের আছে কিনা। সংসদ এই প্রশ্নে উত্তেজনায় উত্তাল হয়ে ওঠে। আমি কিন্তু তখন বিদ্রোহের গন্ধ

পেয়ে গেছি। যাইহোক আটচল্লিশ ঘন্টা পরে আমি আমার সম্মান আর অনুপ্রাণিত করার ক্ষমতার ব্যবহার করি। উত্তেজনায় সংসদ তখন প্রায় হাতাহাতির পর্যায়ে চলে গেছে। উত্তেজিত সেই সংসদকে উদ্দেশ্য করে বলি যে জুন্‌তা সরকারের পদত্যাগ গ্রহণ করা হোক। বলাবাহুল্য পদত্যাগ পত্র গৃহিত হয়।

কিন্তু এটাও যেন যথেষ্ট হয় না। শেষ প্রচেষ্টা হিসেবে পরিস্থিতি এবং সংসদের পরিবেশকে শান্ত করার চেষ্টা করি। যাতে নির্বাচন সংস্কার করা যায়। কিন্তু তার উত্তরটা কিরকম আসে? উত্তরে প্রচার ভঙ্গীতে চিৎকার করে বিরোধীপক্ষ বলে যে ফ্যাসিষ্ট হলো বর্বর, জাতির বুকে একদল ডাকাত আর খুনী চেপে বসেছে।

ওরা এখন নৈতিকতার প্রশ্ন তুলতে ব্যস্ত। আমরা ইতালির ইতিহাসের এই দুঃখজনক বিষাদময় অধ্যায়ের কথা সবিস্তারেই জানি।

কিন্তু শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিগণ আমরা কি তা'হলে দানবের ছদ্মবেশে প্রজাপতির মতো দেখতে? যাইহোক এই সংসদ সদস্যবর্গ তথা ইতালির আপামর জনসাধারণের সামনে আমি ঘোষণা করি যে রাজনৈতিক, নৈতিক বা ইতিহাস সম্পর্কীয় যা কিছু ঘটেছে তার সম্পূর্ণ দায়িত্ব আমার। তারজন্য যদি নাকে দড়ি বেঁধে ঝুলতে হয়, সেই ব্যাপারেও আমি প্রস্তুত। যদি ফ্যাসিবাদের জন্য ইতালির তরুণদল গর্ববোধ না করে, তার জন্য আমাকেই দোষারোপ করা যেতে পারে।

যদি ফ্যাসিবাদের সঙ্গে অপরাধ জগতের যোগসূত্র থাকতো, তবে ঐতিহাসিক, রাজনৈতিকতার দিক থেকে নৈতিকতার চরম পতন অনিবার্য ছিল। আর তার দায়িত্ব সম্পূর্ণভাবেই আমার ওপরে বর্তাতো। কারণ এই দল আমার সৃষ্টি। আমার প্রচার ব্যবস্থা যুদ্ধের সময় মাঝে মাঝে-ই সবাইকে তা' স্মরণ করিয়ে দিয়েছে।

শেষের দিনগুলোয় শুধু ফ্যাসিষ্ট নয়, অনেক নাগরিক-ই নিজেরাই নিজেকে প্রশ্ন করেছে, সত্যি কি দরকার বলে কিছু আছে? তার চেয়েও বড় কথা তাদের মধ্যে মর্যাদাবোধ সম্পন্ন মানুষ কোথায়? আমি আপ্রাণ চেষ্টা করেছি মানুষের শেষ প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে। কারণ আমার জীবনে এই শেষ ছ'মাসের অভিজ্ঞতা বিরাট। আমি ফ্যাসিষ্ট পার্টির মাধ্যমে পরীক্ষা নিরীক্ষা চালাচ্ছি। যে কোন ধাতুর পক্কতা নিরূপণে যেমন হাতুড়ীর ব্যবহার জরুরী, ঠিক সেইরকম কিছু মানুষের মেজাজ মর্জি আমি বুঝতে পেরেছি। আমি যেমন তাদের মূল্যবোধের ব্যাপারটা বুঝেছি, তেমনি বুঝতে পেরেছি হঠাৎ দমকা বাতাসে কেন ওরা একটা কোণে গুটিয়ে যায়। আমি নিজেকে নিয়েও কম পরীক্ষা-নিরীক্ষা করি নি। ওরা যদি জাতির প্রয়োজনে না লাগতো তবে কিছুতেই আমি ওদের নিয়ে এই প্রচেষ্টা চালাতাম না। যে শাসকবর্গ নিজেরাই উপহাসের পাত্র, মানুষ তাদের শ্রদ্ধা করে না। আসলে মানুষ নিজেদের আত্মমর্যাদার প্রতিফলন সরকারের মধ্যে দেখতে চায়, আর সেই কারণে আমার বলার আগেই তারা বলেছে, যথেষ্ট হয়েছে।

কিন্তু কেন এই ধিক্কার? কারণ হলো আভেনটিনোর বিপ্লবের পটভূমি ছিল প্রজাতন্ত্রের ধারক।

আভেনটিনোর রাজদ্রোহ তার কার্যকরণের ফল ভোগ করেছে। কারণ আজকের ইতালিতে ফ্যাসিষ্টদের জীবন অত্যন্ত বিপদজনক অবস্থায় দাঁড়িয়ে। নভেম্বর এবং

ডিসেম্বর—এই দু'মাসে এগারো জন ফ্যাসিষ্টকে খুন করা হয়েছে। একজনকে তো মাথা গুঁড়িয়ে দিয়ে হত্যা করা হয়। তিয়াত্তর বছরের এক বৃদ্ধকে হত্যা করে উঁচু প্রাচীরের ওপর থেকে নীচে ছুঁড়ে ফেলেছে। তিনবার রহস্যজনক গুলি চলেছে একবার রোমের রেল লাইনের ওপরে, দ্বিতীয়বার পরমাতে আর তৃতীয় ঘটনা ঘটেছিল ফ্লোরেন্সে। তারপরেই চারিদিকে গুপ্ত আন্দোলন আরম্ভ হয়।

একজন মিলিশিয়া বাহিনীর প্রধান সাংঘাতিকভাবে আহত হয় ; হ্যাঁ, গুপ্ত বাহিনী দ্বারা এই কাজ সংঘটিত হয়েছিল। গেনজানোতে কারাবিনিয়ারী আর গুপ্ত বাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষ, টারকুইনিয়াতে ফ্যাসিষ্টদের ওপরে এই বাহিনীর হঠাৎ আক্রমণ, ভেরোনাতে আরো একজন আহত; ক্রিমোনিয়াতেও একজন মিলিশিয়া আহত হয়। ফোর্লিতে এই গুপ্ত বাহিনী ফ্যাসিষ্টদের ওপরে হঠাৎ আক্রমণ চালায়। সান জিয়াজো ডি পেসোরোতে কম্যুনিষ্টদের গোপন আক্রমণও উল্লেখযোগ্য ঘটনা। গুপ্ত এই বাহিনী মুখে লাল পতাকার জয়গান করে, কিন্তু তারাই আবার মনজামবানোতে ফ্যাসিষ্টদের ওপরে আক্রমণ শানায়।

১৯২৫ সালের জানুয়ারী মাসে তিনটে ঘটনা ঘটে। একটা প্রদেশের ম্যাসট্রি, পিয়োনকা আর ভাম্মেব্রাতে। পঞ্চাশজন গুপ্ত বাহিনীর লোক মুখে লাল পতাকার জয়ধ্বনি করতে করতে রাইফেল হাতে সশস্ত্র অবস্থায় ঘুরে বেড়িয়ে ইতস্তত ছোট ছোট বোমা মারে। ভেনিসে মিলিশিয়া পাসকাই মারিয়োকে আক্রমণ করে সাংঘাতিকভাবে আহত করে। ক্যারাবিনিয়ারি প্রদেশের কেন্দ্রভূমি ক্রেসপানো আক্রমণ করে উত্তেজিত প্রায় কুড়িজন মেয়েছেলে ; মিলিশিয়ার এক প্রধানকে আক্রমণ করে জলের মধ্যে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া হয়। ফাভেরা ডি ভেনিজিয়াতে এই গুপ্তবাহিনী-ই আবার ফ্যাসিষ্টদের ওপরে আক্রমণ করে।

এই ব্যাপারগুলো সবার নজরে আনছি কারণ এইসব ঘটনাগুলো হলো রোগের উপসর্গ, লক্ষণও বলা যেতে পারে। ১৯২ নম্বর একস্‌প্রেস ট্রেনে গুপ্তবাহিনী এই সময়েই পাথর ছুঁড়ে জানালার কাঁচের সার্সিগুলোকে ভেঙে টুক্‌রো টুক্‌রো করে দেয়।

মোডুনা ডি লিভেনজাতে মিলিশিয়ার একজন প্রধানকে আক্রমণ করে প্রচণ্ডভাবে মারধোর করে। পরিস্থিতি বিচার করলে দেখা যাবে অ্যাভেনটিনোর রাজদ্রোহ সারা দেশে কী প্রচণ্ড হতাশা ডেকে এনেছিল। এর পরেই শুরু হয় সংঘর্ষ, পরস্পর বিরোধী দু'ই দলে সংঘর্ষ বাঁধলে শক্তির লড়াই হ'তে বাধ্য। ইতিহাস তন্ন তন্ন করে খুঁজলেও এর অন্যথা হবে না। কখনো তা' হয় না।

যাইহোক এখন আমি বুক ঠুকে বলতে পারি যে যথাসময়ে এই সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। উপরন্তু সরকার এবং দল উভয়েই যথেষ্ট অভিজ্ঞ। ভদ্রমহোদয়বৃন্দ, আপনারা নিজেদের নিজে প্রতারণা করেছেন। যেহেতু দলকে সংযত করে রেখেছি, তাই আপনাদের ধারণা হয়েছে ফ্যাসিবাদ শেষ হয়ে গেছে। দলকে পেছুটানে ধরে রেখেছি বলে আপনাদের মনে হচ্ছে যে দল মৃত। যে শক্তি নিয়ে ফ্যাসিষ্ট দলকে আমি সংযত রেখেছি, তার একশো ভাগের এক ভাগ শক্তিও যদি খরচ করি দলকে মুক্ত করার ব্যাপারে তবে আপনারা তার স্বরূপ দেখতে পাবেন।

অবশ্য তার প্রয়োজন পড়বে ব্লে মনে করি না। কারণ সরকার আভেনটিনোর এই রাজদ্রোহের শুধু মোকাবিলা-ই নয়, কোমর ভেঙে দেওয়ার পক্ষেও যথেষ্ট শক্তিশালী।

ইতালি চায় শান্তি, সমৃদ্ধি, পরিশ্রম এবং প্রশান্তি। আমরা যদি সম্ভব হয় ভালোবাসার সঙ্গেই এইগুলো দিতে চেষ্টা করবো। অন্যথায় প্রয়োজনে শক্তির দ্বারা এগুলো রূপায়িত করতেও আপত্তির কোন কারণ দেখি না।

আপনারা নিশ্চিত থাকুন যে এই বক্তৃতার আটচল্লিশ ঘণ্টার মধ্যে ইতালির পরিস্থিতির কালো মেঘ প্রতিটি কোণ থেকে উড়ে যাবে। মেঘমুক্ত হবে ইতালির আকাশ। এটা ব্যক্তিগত অভীপ্সা বা ইচ্ছা নয়, শাসক দলের লোলুপ কামনা বলে ভাবলে তা' ভুল হ'তে বাধ্য। এটা হলো আমার দেশের প্রতি অপরিসীম ভালোবাসা এবং শ্রদ্ধা।

বক্তৃতার রাশ আমি এখানেই টেনে ধরি। কিন্তু হঠাৎ যেন ফ্যাসিষ্ট ইতালি জেগে ওঠে। আমি যে পরিস্থিতির স্বপ্ন দেখেছিলাম, আট চল্লিশ ঘণ্টার মধ্যেই তা' রূপ নেয়। বিরোধীদলের যে সংবাদপত্রগুলো এতোদিন ঘৃণা, ঈর্ষা ইত্যাদি এক নাগাড়ে উদ্‌গীরণ করে চলছিল, তারা যেন হঠাৎ গর্তের মধ্যে মুখ লুকোয়। ক্ষমতা এবং দায়িত্ব বোধ নিয়ে নতুন পরিস্থিতি তখন ধীরে ধীরে আত্মপ্রকাশ করতে শুরু করেছে। ফ্যাসিবাদ আবার সুশাসিত ভাবে এগিয়ে চলে। হ্যাঁ, সমস্ত বাধা বিঘ্ন পেরিয়ে।

এই সময়েই লিবারেল মন্ত্রীদ্বয় সারোচি এবং কসোটি আর বোকা ফ্যাসিষ্ট মন্ত্রী অভিগলিও মন্ত্রী পরিষদের থেকে পদত্যাগের ইচ্ছা জানায়। আমি তিনজন ফ্যাসিষ্ট মন্ত্রী দিয়ে ওদের শূন্যস্থান পূরণ করি। আমরা ঘটনাবলীর প্রবল বন্যার তোড়ে ধীরে ধীরে আমাদের আন্দোলনের ঐতাহাসিক স্থানে পৌঁছে যাচ্ছিলাম—যা পরিপূর্ণ সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল।

ফ্যাসিবাদ সম্পর্কে আমার দৃঢ় বিশ্বাসে ভরা জোরালো বক্তব্য এবং যে কোন সংকটজনক পরিস্থিতির মুখোমুখি হওয়ার দুঃসাহস যেন আমাদের যোদ্ধা-আত্মাকেই ডেকে এনেছিল। সঙ্গে সঙ্গে যারা ফ্যাসিবাদ ছেড়ে চলে গিয়েছিল, তারাও এই আন্দোলনে অংশ নিতে দ্রুত ফিরে আসে। তবে পার্টির ওপরে আর চাপ না বাড়ানোর তাগিদে নতুন করে সদস্য নেওয়া বন্ধ করে দিতে হয়।

বিজয় এতোদিনে সম্পূর্ণ হয়েছে। অতীতের প্রধানমন্ত্রীদের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ এবং হাস্যাস্পদ হয়ে দাঁড়িয়েছে। তৎকালীন আরো কয়েকটা প্রচেষ্টার পরিণতিও এক জায়গার্তে গিয়ে দাঁড়ায়। ইতালিয়ান লীগের নামে এইরকম একটা আন্দোলন শুরু করেছিল বেনেলি—যাতে ফ্যাসিবাদের উত্তরাধিকারী হওয়া যায়। আর গুপ্ত ষড়যন্ত্র করেছিল গারবল্ডির লঘু মানসিকতার পৌত্ররা।

১৯২৪ সালের জানুয়ারী মাসের শেষাশেষি আভেনটিনো আমাদের সমস্ত বিরোধীদের সঙ্গে মিলে ছত্রখান হয়ে টুক্‌রো টুক্‌রো হয়ে যায়। নিজেদের মধ্যে ঝগড়াঝাঁটি আর হাজারো মত পার্থক্যের দরুণ। সমস্ত ফ্রন্টেই আমি বিজয়ী হই এবং প্রস্তুতি নেই যাতে ফ্যাসিষ্ট বিপ্লবকে একটা প্রতিষ্ঠানিক স্বীকৃতি দিয়ে সাংবিধানিক রূপ দেওয়া যায়।

ন্যাশানাল মিলিশিয়া ১৯২৪ সালের ২৮শে অক্টোবর তারিখে রাজার প্রতি বিশ্বস্ততার শপথ নেয়। বলতে আপত্তি নেই ফ্যাসিবাদের মধ্যে এই শাখাই ছিল সর্বশ্রেষ্ঠ এবং আমার প্রিয়তম সৃষ্টি। বর্তমানে অবশ্য ১৮৪৮ সালের সংবিধানটাকে সমকালীন রূপ দেওয়ার প্রয়োজন হয়ে পড়ে, যাতে নতুন প্রতিষ্ঠান হিসাবে এই সংগঠন পরিচিত হয়ে নব্য ইতালিকে সমৃদ্ধির পথে নিয়ে যেতে সক্ষম হয়।

এই লক্ষ্যে পৌঁছবার নিমিত্ত আঠারো জন রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞের একটা কমিশন গঠন করি। তাদের বলি সংসদে পেশ করার জন্য সংস্কারের কিছু প্রস্তাব তৈরি করতে।

এই কমিশন পরিচিতি লাভ করে সলোনস্ কমিশন নামে। ওরা ওদের কাজ নির্দিষ্ট সময়ের কিছু পরে সম্পূর্ণ করে। পুরনো সংবিধানকে কিছুটা উন্নত করে এবং নতুন কিছু প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলারও পরামর্শ দেয়। পরবর্তীতে আমি ওদের এই বিশেষজ্ঞ—অভিমতগুলোকে ভিত্তিভূমি হিসেবে ব্যবহার করেছিলাম। কমিশন কিন্তু নির্দিষ্ট কোন পথ বাত্‌লে দেয় নি। কিন্তু যেসব সংস্কারের কথা বলেছিল, সেই রাস্তা ধরে এগোতে এগোতে ব্যাপারটা আমার কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। পরে জাতীয় সংসদের উভয় শাখাই এই সংস্কারগুলোকে অনুমোদন করেছিল।

গুপ্ত সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলোর বিরুদ্ধে আনা আইন ভোটে পাশ হয়ে যায়। যাতে ফ্যাসিবাদ এই রাজনৈতিক মিস্ত্রীগুলোর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে পারে। আসলে ১৯২৫ সালে পুরো ব্যাপারটাই হাস্যাস্পদ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। আর জনসাধারণের মধ্যে থেকে নির্বাচিত এমন একজন প্রতিনিধিও ছিল না যে অন্তত এই গুপ্ত সামাজিক প্রতিষ্ঠান গুলোর ব্যাপারে আইনটাকে কার্যকরী করতে পারে।

এই গুপ্ত রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলোর সমকালীন জীবনে কোন গুরুত্ব-ই ছিল না। বরং ব্যাপারটা নিরর্থক পর্যায়ে চলে গিয়েছিল। বিশেষ করে মানুষ যখন এই প্রতিষ্ঠানগুলোকে ভয় পাওয়া দূরে থাক, অবহেলা-ই করতো। সুতরাং এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আমি ফরমান জারী করি যে প্রতিটি প্রতিষ্ঠানকে প্রকাশ্যে তাদের উদ্দেশ্য যেমন বলতে হবে, তেমনি কিভাবে প্রতিষ্ঠানটির সৃষ্টি হলো, সদস্য-ই বা কারা, সামাজিক কি ধরনের উন্নতি তারা ঘটাতে চায়, সেই সবেরও বিস্তারিত বিবরণ প্রকাশ্যে ঘোষণা করতে হবে।

সেই সময় অন্তর্দেশীয় মন্ত্রী ফেডারজোনী আমার পুরো সম্মতি নিয়ে জনসাধারণের নিরাপদের জন্য একটা আইন প্রণয়ন করে। তারপরেই আমরা কমিউনগুলোকে পোদেস্তার অধীনে নিয়ে আসি। কারণ পুরনো নির্বাচন পদ্ধতি দ্বারা সমকালীন ব্যবস্থার আওতায় নিয়ে আসা কখনো সম্ভব ছিল না।

রোমের শাসন ব্যবস্থা জোরদার করার পরে আমি উঠে পড়ে লাগি সিসিলির মাফিয়াদের আর সারদানার খুনী, ডাকাত ইত্যাদি এবং আরো কিছু স্বল্পখ্যাত শয়তানদের শায়েস্তা করার কাজে। যারা এতোদিন তল্লাট জুড়ে মানুষদের আতংকিত করে রাখতো।

১৯২৫ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে আমি গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়ি ; এবং সম্ভবত প্রচণ্ড উদ্বিগ্নতার জন্য আমার শারীরিক অবস্থা তখন বাইরের কাউকে জানতে দিতো না। স্বীকার করতে আপত্তি নেই যে পরিস্থিতি যথেষ্ট সংকটপূর্ণ ছিল। চল্লিশ দিন বাড়ির বাইরে বের হ'তে পারি নি। আমার শত্রুরা তখন উৎসাহে ভরপুর যে আমার শেষদিন সমাগত। এবার ওদের অতীতের ইচ্ছাগুলোকে পূর্ণ করার সমস্ত সুযোগ এসে গেছে। ফ্যাসিষ্ট দল আমার নীরবতায় এবং পরস্পর বিরোধী খবরে তখন রীতিমতো বিপদে পড়ে গেছে। ইতিপূর্বে কখনো ভাবি নি যে দল এবং ইতালির জনসাধারণের একটা বিরাট অংশের কাছে আমি এতোটা নির্ভরযোগ্য। কারণ আমার প্রাণবন্ত ইস্তাহার, একত্র ধরে থাকার ক্ষমতা এবং শুভেচ্ছা-ই ওদের আমার প্রতি এতোটা নির্ভরশীল করে তুলেছিল। কালো সার্টের দল তো পরম অসহিষ্ণুতায় আমাকে দেখার জন্য গর্জে ওঠে।

শেষপর্যন্ত মার্চ মাসের শেষে ফ্যাসিবাদ প্রতিষ্ঠার ষষ্ঠতম দিবসে আমি অসুস্থ অবস্থাতেই ব্যালকনি পালাজো চিগিতে এসে দাঁড়াই। আমার সামনে তখন বিস্তীর্ণ শহর রোম। আমাকে রুগ্ন এবং বিবর্ণ অবস্থায় দেখে জনসাধারণ গভীর আবেগে আপ্লুত হয়ে পড়ে। আমি বসন্তকে অভিবাদন জানিয়ে অন্যান্য বক্তব্যের সঙ্গে বলি যে বর্তমানে শ্রেষ্ঠ সময় সমাগত। বাক্যটা সম্পূর্ণ করার আগেই জমায়েত হওয়া হাজার হাজার নাগরিকের প্রশংসা এবং সম্মতির বন্যার তোড় যেন আমাকেই ভাসিয়ে নিয়ে যায়।

প্রফেসার বাস্তেয়ানেলী এবং প্রফেসার মার্চিয়াফাবার সুচিকিৎসার দৌলতে শীঘ্র আমি সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠি। যারা আমার অসুস্থতার দরুণ ভেবেছিল আমার দিন শেষ হয়ে এসেছে, তাদেরও মুখের ওপর একটা জবাবের মতো জবাব দেওয়া হয়। অসুখ এসে বিরোধী পক্ষের কাউকে কেড়ে নেবে এর চেয়ে ঘৃণ্য কোন চিন্তা আমার কাছে নেই। আগের চেয়ে অনেক বেশি শক্তিশালী এবং কর্মঠ বলে নিজেকে মনে হয়। অতীতে যা বলেছিলাম, সেই কথাটাই আবার পুনরাবৃত্তি করি। হ্যাঁ, হঠাৎ আমার জীবনের ওপরে আক্রমণের পরে আমার বক্তব্য ছিল,—গুলি চলে যাবে, কিন্তু মুসোলিনি থাকবে। কারণ মুসোলিনি থাকতে-ই এসেছে। হঠাৎ জীবনের রঙ্গমঞ্চ থেকে সরে যেতে নয়। আমার জীবনের ওপরে আক্রমণের ঘটনাগুলো স্বভাবতই আমার চলার পথটাকে আরো কঠিন করে তোলে।

জানিবানি এই ষড়যন্ত্রের জাল বোনার নায়ক ছিল। নোংরা সোশ্যালিষ্ট এই জানিবানি। ফ্যাসিবাদ বিরোধী কাজ করার জন্য চেকোশ্লোভাকিয়ার সোশ্যালিষ্ট পার্টি ওকে দু'টো চেক দিয়েছিল। প্রতিটি চেক এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার ফ্রা'র। স্বাভাবিকভাবেই ড্রাগে চরমভাবে আসক্ত জানিবানি এই তিন লক্ষ ফ্রা'র ব্যবহার করে আমাকে হত্যার ষড়যন্ত্রের মতো ন্যাক্কারজনক কাজে। আর এই ঘটনা ঘটানোর জন্য সে বেছে নিয়েছিল যুদ্ধ জয়ের উৎসবের দিনটাকে। পালাজো চিগির যে ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে উৎসবের এই বিশেষ দিনটাতে আমি দর্শন করি মিছিলকে, যে মিছিলে হাজার হাজার লোক অংশ নেয় অজানা শহীদের স্মৃতিস্তম্ভের পাদদেশে ফুল অর্পণ করতে— সেই ব্যালকনির ঠিক উল্টোদিকের হোটেল ড্রাগনির একটা ঘর বিশেষভাবে সংরক্ষিত করে সেই ঘরে লুকিয়ে ছিল জানিবানি।

নিখুঁত দূরবীন লাগানো অষ্ট্রিয়ান রাইফেলে ওর লক্ষ্য ভ্রষ্ট হওয়ার কথা নয়। ওর ওপরে যাতে সন্দেহের নজর না পড়ে তার জন্য জানিবানি মেজরের পোষাক পড়েছিল এবং ভোর সকালেই অপরাধ করার জন্য প্রস্তুতি নিয়ে রেখেছিল। ব্যাপারটা কিন্তু ধরা পড়ে যায়। কারণ অনেক দিন আগে থেকে ওকে নজরে নজরে রাখা হয়েছিল। সত্যি বলতে কি জেনারেল কাপেলো উদার হাতে টাকা-পয়সা দেওয়ার ক'দিন আগেই আমরা ষড়যন্ত্রের খবরটা পেয়ে যাই। কিন্তু ঘটনা ঘটানোর মাত্র একঘণ্টা আগে জানিবানি, জেনারেল কাপেলো এবং আরো বেশ কয়েকজন স্বল্পদরের পৃষ্ঠপোষকদের গ্রেপ্তার করা হয়। সঙ্গে সঙ্গে নাটকের এই অধ্যায়ের ওপরে যবনিকা নেমে আসে।

১৯২৬ সালের এপ্রিল মাসে আমি যাই ইন্টারন্যাশানাল মেডিসিন কংগ্রেসের উদ্বোধন করতে। একটা বিষাদরোগগ্রস্ত পাগলী, বলাবাহুল্য ইংল্যাণ্ডের নাগরিক, উত্তেজিত ভাবে আমার মোটর গাড়ির কাছে এসে খুব সামনে থেকে গুলি চালায় গুলিটা নাকের ঠিক সামনের বাতাস কেটে চলে যায়। এক সেন্টিমিটারের জন্য বেঁচে যাই ; নইলে গুলিটা যে মারাত্মক

হ'তো তা'তে সন্দেহ নেই। আগেই বলেছি মহিলা পাগল আর তাকে যারা উত্তেজিত করেছিল তারাও এই ঘটনার পরে সামনে আসে নি। আমি পাগল মেয়েছেলেটাকে সীমান্ত পাড় করে ছেড়ে দিতে বলি। যাতে সে তার গন্তব্যস্থলে গিয়ে ব্যর্থতার কারণগুলো চিন্তা ভাবনা করে খুঁজে বার করতে পারে।

এই ঘটনার ঠিক অব্যাহত পরেই নাকে ব্যান্ডেজ বেঁধে ইতালির সমস্ত অঞ্চলে ঘুরে ঘুরে অফিসারদের সঙ্গে মিটিং করি। বলি,—যদি আমি এগিয়ে যাই— তোমরা আমাকে অনুসরণ করবে। কিন্তু নিজেকে গুটিয়ে নিলে হত্যা করতেও দ্বিধা করো না। আর যদি মারা যাই, তবে যে শাস্তি ইচ্ছে হয় দিও।

ইতিমধ্যে আরো একটা ঘটনা ঘটে। একজন অরাজকতার সমর্থক লুসেটি ফ্যাসিবাদ এবং আমার প্রতি বুক ভরা ঘৃণা নিয়ে ফ্রান্স থেকে ফিরে আসে। পোর্তা পিয়ার নমেনতানায় আমার জন্য সাগ্রহে অপেক্ষা করছিল। লোকটার মধ্যে অদ্ভুত একটা ক্ষমতা ছিল। নিশ্চুপে অপরাধ সংগঠিত করতে পারতো। শক্তিশালী একটা বোমা সঙ্গে করে লোকটা আটদিন ধরে রোমে এসে লুকিয়ে ছিল। লুসেটি আমার গাড়ি যখন পালাজো চিগিতে যাচ্ছিলো, গাড়িটাকে চিনতে পেরে শক্তিশালী বোমা ছোঁড়ে। বোমাটা গাড়িতে এসে কোণাকুণি ভাবে ধাক্কা খেয়ে মাটিতে প্রচণ্ড শব্দে আছড়ে পড়ে। ততোক্ষণে অবশ্য আমার গাড়ি অনেক দূরে চলে গেছে। আমি আহত না হলেও বেশ কিছু নির্দোষ লোক আহত হয়ে হাসপাতালে যায়।

গ্রেপ্তার হওয়ার পরে লোকটা ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে ঘৃণা ছাড়া এই হত্যা-প্রচেষ্টার পেছনে আর কোন কারণ দর্শাতে পারে না। আমি অবশ্য এই ঘটনাকে তেমন একটা গুরুত্ব দেই নি। ইংল্যান্ডের রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে আলাপ আলোচনার পরে পালাজো চিগিতে অপেক্ষারত অন্যান্য বিদেশী রাষ্ট্রদূতদের সঙ্গেও দেখা করি। যতোক্ষণ না পর্যন্ত বিরাট এক জনতা রাস্তার মধ্যে আমার গাড়িকে থামিয়ে ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ জানতে চায়, ততোক্ষণ ব্যাপারটা কেউ জানতে বা বুঝতে পারে নি। একমাত্র ইংল্যান্ডের রাষ্ট্রদূত আমার জীবনের ওপরে এই আঘাত হানার কথা জানতে পেরে যথেষ্ট আতংকিত হয়ে পড়ে।

শেষবারের মতো আমাকে হত্যার চেষ্টা করা হয়েছিল ১৯২৬ সালের ৩১শে অক্টোবর তারিখে। বোলোনিয়াতে। সারাদিন উৎসাহ এবং গর্বে ভরপুর অবস্থায় কাটিয়ে তখন মাত্র বিশ্রাম নিতে বসেছি।

একজন সশস্ত্র বিদ্রোহী যুবক কয়েকজনের সঙ্গে মিলে মিশে ষড়যন্ত্র করেছে, সেটা আগে থেকে আঁচ করতে পারি নি। সবাই যখন দাঁড়িয়ে উঠে আমাকে অভিবাদনরত, তখন একজন সেই জনতার মধ্যে থেকে বেরিয়ে এসে আমার গাড়ি লক্ষ্য করে গুলি ছোঁড়ে। আমি তখন বোলোনিয়া আরপিনাটির পোদেস্তাতে বসে রয়েছি। গুলিটা আমার কোটের কিছুটা অংশ পুড়িয়ে দিলেও আমি নিরাপদে থাকি। জনতা ইতিমধ্যে প্রচন্ড উত্তেজিত অবস্থায় লোকটাকে ধরে ফেলে। কিছু করার আগেই জনতার আদালতে লোকটার বিচারও হয়ে যায়।

অন্যান্য ষড়যন্ত্রগুলোকেও ব্যর্থ করে দেওয়া হয়। ওদের আশা তখন সীমা ছাড়িয়ে গেছে। বুঝতে অসুবিধা হয় না যে বিরোধীদের এই চালাকি পূর্ণ ব্যবহার বন্ধ করা দরকার। গুপ্ত প্রতিষ্ঠানগুলো, বিরোধী প্রেস আর প্রবঞ্চনাপূর্ণ রাজনৈতিক অপরাধীদের একটাই লক্ষ্য ছিল। ফ্যাসিবাদের স্রষ্টাকে যেভাবে হোক আঘাত করা। তা'হলে ফ্যাসিবাদটাকেই চরম আঘাত

হানা যাবে। যেসব আন্দোলন তখন ইতালিকে দাবিয়ে রেখেছিল, সেইসব আন্দোলনের চালন কাঠির মালিক ছিল একজন-ই। হ্যাঁ, একাকী একজন মানুষ। বিরোধীপক্ষের সবার তখন একটাই নিশানা ; ফ্যাসিবাদকে ধ্বংস করতে হলে চীফকে হত্যা করার প্রয়োজন। তা'হলেই তাসের ঘরের মতো ফ্যাসিবাদ নিজের থেকেই ধসে যাবে। ইতালির জনগণকে ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলার প্রয়োজন পড়ে নি ; ওরা নিজেরাই উপলব্ধী করতে পেরেছিল। আর তারজন্য এইসব অপরাধীদের চরম দণ্ড দেওয়ার দাবী জানাতে থাকে। অন্ধকারে আড়ালে বসে বসে যারা এইসব ষড়যন্ত্র ফাঁদছে, তাদের সবাইকে নির্মূল করার জন্য জনগণ অধীর হয়ে ওঠে।

শক্ত হাতে শাসন ব্যবস্থার রাশ টানা একান্তভাবেই প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে। আমি স্বরাষ্ট্র দপ্তর হাতে নিয়ে ফ্যাসিষ্ট সরকারকে বাঁচানোর জন্য সবরকম আত্মরক্ষামূলক নীতির আশ্রয় নেই আর এমন সব আইন প্রণয়ন করা শুরু করি যাতে সমস্ত ইতালি জাতিকে একটা সূতোয় গাঁথা যায়।

গুপ্তভাবে কাজ করা সমস্ত সংবাদপত্রকে বন্ধ করে দেই যাদের একমাত্র কাজ ছিল জনগণের মনে সরকারী বিরোধীতার আগুন জ্বালানো। প্রাদেশিক শাসন কর্তারা পেশাগত নাশকতা মূলক কাজকর্মে নিযুক্ত গুপ্তবাহিনীকে ধরে ধরে জেলে ভরে। প্রতিটি মুহূর্ত এবং প্রতিদিন উপলব্ধী করি যে সরকারী তরফের এই ব্যবস্থাগুলোই জাতিকে অবমাননা, বিশৃঙ্খলা এবং বিশ্বাসঘাতকতার হাত থেকে টেনে ওপরে তুলছে।

শেষে ব্যাপারটার উপসংহার এই বলেই টানবো যে শক্ত হাতে রাশ ধরার জন্য আশাতীত ফল পাওয়া গিয়েছিল। প্রতিদিন দেশের প্রতিটি নাগরিক মন প্রাণ দিয়ে অনুভব করতো যে জাতি শুধু শক্তিশালী নয়, সম্দ্ধির পথেও এগিয়ে চলেছে। কিন্তু তারজন্য একজন ইতালিয়ান নাগরিককেও নির্বাসনে পাঠানোর প্রয়োজন পড়ে নি। সরকারী আইন পরিকাঠামোর মধ্যে প্রত্যেকেরই স্বাচ্ছন্দতার সঙ্গে বসবাস করার অধিকার ছিল। অতীতে নাশকতামূলক কাজে প্রবৃত্ত অনেকেই উপলব্ধী করতে শুরু করে যে শৃঙ্খলাপূর্ণ স্বাচ্ছন্দ জীবনযাত্রার দরুণ মানুষ কতো সুখী হ'তে পারে। একটা শ্রেণী নয়, সমস্ত শ্রেণী-ই এতে সুখ এবং সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে যেতে সক্ষম হয়। তবে জেলে যে ক'জন ছিল আর যারা ইচ্ছে করে আইন শৃঙ্খলা মানতো না, সেই ক'জন ছাড়া। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী হিসেবে ১৯২৭ সালের ৬ই জানুয়ারী সবাইকে সার্কুলার দিয়ে জানিয়ে দেই যে প্রত্যেক মন্ত্রী পরিষদের সদস্যকে ইতালির জনগণের প্রতি তাদের কর্তব্য নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করতে হবে।

আইন কানুন সম্পর্কে নতুন একটা ধ্যান-ধারণা, ছন্দবদ্ধ জীবন নিয়ে লক্ষ্যের উদ্দেশ্যে নতুন একটা জাতি যেন জেগে ওঠে। বিরক্তি বা হিংসা নয়, বরং নাগরিকদের পক্ষে ভালো কি—এই চিন্তাধারা নিয়ে নায়কোচিত ভাবভঙ্গিতে সমগ্র জাতি নিজেদের পথে এগিয়ে চলে। নাগরিকরা যেমন সরকারের বিরুদ্ধে কোন ষড়যন্ত্র আঁটে না, তেমনি সরকারও নাগরিকদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ দিতে কসুর করে না।

শেষে অনেকেই শান্ত এবং পবিত্র সত্যের এই জগতকে চোখ মেলে দেখে। ইতালিয়ানরা নিজেরাই উপলব্ধী করতে পারে যে ওদের প্রতি সরকার প্রত্যেকটি পদক্ষেপে ন্যায় বিচার করে চলেছে। কর্তব্যের প্রতি সচেতনতা, কাজের প্রতি দরদ, নাগরিক জীবনে উন্নতির আকাঙ্খা নিয়ে ইতালি এক নতুন জাতি হিসেবে জেগে ওঠে। পুরনো দলগুলো ততোদিনে

মৃত। ফ্যাসিবাদের মাধ্যমে ওরা জীবনে যেন নতুন মূল্যবোধ খুঁজে পায়। এই আত্মিক শক্তি-ই একটা জাতিকে স্মরণীয়ভাবে ইতিহাসের পথে এগিয়ে দেয়।

।। নতুন পথ।।

কেউ যখন দেখে একটা বাড়ি হাতুড়ির আঘাতে ভেঙে টুক্‌রো টুক্‌রো হয়ে পড়ছে, তখন কি কেউ বানার্ড শ'র নাটক নিয়ে আলোচনা করতে বসে, নাকি গ্রীষ্মকালের খেলাধূলার জন্য পাহাড়ের উচ্চতা অথবা সমুদ্র-তীর কোনটা ভালো তাই নিয়ে বিচার করে।

যে কাজ করেছি এবং করছি তা'র থেকে আমি আমার জীবনকে বিচ্ছিন্ন করতে পারবো, এটা চিন্তা করাও বাতুলতা। ফ্যাসিষ্ট সরকারের পেছনে সূর্য ওঠার সময় থেকে গভীর রাত পর্যন্ত প্রচন্ড ক্ষিদে পেটে নিয়ে অক্লান্ত ভাবে কাজ করে গেছি। যাতে এই পরিশ্রমে আবার একটা নতুন সূর্য জাতির জীবনে দেখা দিতে পারে—এই জীবনকে তাই আমার আমি থেকে আলাদা করা কোনরকমেই সম্ভব নয়। জীবনের এই সূতোয় আমি গাঁথা পড়ে গেছি। আমি এবং আমার সত্বা তাই সূতোয় তৈরি কাপড়ের জমিনে মিলে মিশে এক হয়ে গেছে। অন্যান্য লোকেরা হয়তো বাতাসে বড় গাছের ডাল আন্দোলিত হয়ে যখন পাতারা কানাকানি করে, রোমান্স অনুভব করে। তবে আমার জীবনের স্বপ্ন, ইচ্ছা এবং লক্ষ্য হলো এককেন্দ্রিক। চোখ কান সমস্ত চিন্তাধারা আমার নিবদ্ধ জনজীবনের গুঁড়ির ওপরে। যার ওপরে ভর দিয়ে গাছটা দাঁড়িয়ে আছে।

আমার জীবনের কবিতা হলো নতুন করে কিছু গড়ে তোলা। আর আমার প্রেম জড়িয়ে গেছে দেশের ভবিষ্যত সুখ সমৃদ্ধির সঙ্গে। এটাই আমার কাছে মনোমুগ্ধকর উত্তেজক নাটক বিশেষ।

গত ছ'বছর আমার নেতৃত্বে যেসব সমস্যার সমাধান হয়েছে—সেই সবগুলোই আমার জীবনের এক একটা অধ্যায়। কখনো ছোট আর কখনো বা সুদীর্ঘ সেই অধ্যায়গুলো। মানবত্বের ইতিহাসের সিঁড়ি বেয়ে কখনো সহজ সরল আর জটিলতার ভরা সেই উত্থান। জাতির দিশারী।

আমি অবশ্য এইসব ব্যাপার নিয়ে খুব একটা ভাবি না। কারণ জীবনের প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই আমাকে ভুল বোঝা হয়েছে। তুচ্ছ বিষয় নিয়েও ষড়যন্ত্র পাকিয়ে আমার শুধু ভুল ছবি-ই জনসাধারণের সামনে তুলে ধরা হয় নি, মানুষকে ভুল বোঝানোও হয়েছে। বিশেষ করে কি আমি করছি আর কি আমি করতে চাই। সর্বোপরি চারপাশ থেকে খালি মিথ্যার ফিসফিসানি শুনতেই আমি ব্যস্ত ছিলাম। যারা ঘাড় ফিরিয়ে দেখে কে পেছনে পড়ে রইলো আর কে মিথ্যাবাদী—তারা শুধু সময় নষ্ট-ই করছে। তার কারণ হলো আমি আমার জীবন কলমের আঁচড়ে তুলে ধরতে অক্ষম। আমার নিত্যকার দিনলিপি, কর্মজীবন, চিন্তাধারা এবং এমন কি অদ্ভুত আবেগজারিত প্রহর—এইসব গুলোর বিবরণ লিপিবদ্ধ করার পেছনে সময় নষ্ট করার চেয়ে ইতালিকে নতুন জীবন দিয়ে সভ্যতার অগ্রগতির মিছিলে ভালো একটা জায়গা করে দেওয়া। আর তারজন্য নাশকতামূলক শক্তিগুলোর সঙ্গে নিরন্তর সংঘর্ষ যেমন একদিকে করে যেতে হয়েছে, তেমনি ওদের সহজ সরল ছদ্মবেশের আড়ালের রাজনীতিকেও মোকাবিলা কম করতে হয় নি।

তবে বিশেষ করে দু'টো ক্ষেত্র, আমার ইচ্ছা এবং কর্মনিষ্ঠাকে আমি নথিভুক্ত করে যেতে চাই।

এবং সেই প্রকাশকে ব্যক্ত করেছি সহজ সরল ভাষায়। কোনরকম জটিলতার আশ্রয় নেই নি। কারণ যারা বাক্যের বন্যা ছোটায়, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাদের বক্তব্য হয় নিস্ফলা। কথাগুলো রাতের অন্ধকারে ছোঁড়া গুলি হারিয়ে যাওয়ার মতো। কিন্তু কাপুরুষ, অলস এবং অনিচ্ছুক শিবিরে বসে খোসগল্পে মেতে ওঠা শত্রুদের তা' আঘাত করতে পারে না।

ওদের মধ্যে অনেকেই আছে যারা আমাকে শুধু অতীতে নয়, বর্তমানেও পৃথিবীর শান্তি বিঘ্নকারী বলে ভাবে। তাদের প্রতি আমার একটা অনুরোধ তারা যেন যত্ন নিয়ে আমার এই আত্মজীবনীমূলক লেখাটা পড়ে। বোকাদের মিথ্যা দোষারোপের চেয়ে নথিভুক্ত সত্যের মূল্য অনেক বেশি।

প্রথম থেকেই ইতালির বৈদেশিক জাতির আগাপাস্তালার পরিবর্তন ঘটিয়ে নতুন রূপ দিতে আমি সচেষ্ট ছিলাম। এটা স্বীকার করে নেওয়া ভালো যে আমার ইতিহাস-সচেতনতা ছিল প্রচণ্ডরকমের। তা'ছাড়া পৃথিবীর সঙ্গে তুলনামূলক ভাবে আমার দেশের অর্থনৈতিক এবং অধ্যাত্মিক সম্ভাবনার কথাও মাথায় রেখেছিলাম। নীতির এই ধরনের নবরূপ দান আমাদের কাছে একেবারেই নতুন জিনিষ ছিল। সুতরাং জাতিকে এই নতুন রূপ দিতে গেলে শুধু ইতালিয়ানরাই নয়, বিশ্বের বহুদেশ আমাদের বৈদেশিক নীতি সম্পর্কে ভুল ধারণা নিয়েছে। সন্দেহের তীরও কম ছোঁড়া হয় নি।

আমি কিন্তু জানতাম নতুন শাসন ব্যবস্থায় যে গতি, কঠোরতা এবং মর্যাদার ভার চাপিয়ে দিয়েছি, তা'তে ছোট বা বড় যে কোন রকমের ব্যবস্থা নেওয়া হলেই সবাই মনে করতো যে আমি পুরনো রাজনৈতিক পরম্পরা, প্রতিষ্ঠান বা বর্তমানের মিলিজুলি শাসন ব্যবস্থাকে ভেঙে স্থিতাবস্থা আনতে চাইছি।

কী চরম ভুল ধারণা এটা। শক্তভাবে নিজেদের দাঁড়ানোর প্রচেষ্টাকে কোনরকমেই আন্তর্জাতিক ব্যবহারিক দিক থেকে বিপ্লবাত্মক পদক্ষেপ বলা চলে না। আমাদের সম্ভাবনার হিসেব নিকেশের খাতাটিকে ভালো ভাবে পরীক্ষা, নিরীক্ষার পর ইতালির জন্য যথাযোগ্য ক্ষমতা এবং মর্যাদার দাবী সনদ পেশ করা আর যাই হোক অন্যায় তো নয়।

আমার সামনে সবচেয়ে বড় সমস্য ছিল ইউরোপের বিভিন্ন সরকারের পদস্থদের চোখ খুলে দেওয়া, যাদের অন্ধ ধারণায় যুদ্ধের পরে ইতালি আজ এক চরম টালমাটাল অবস্থায় গিয়ে পৌঁছেছে।

ওদের এই বন্ধ চোখ গুলোকে খুলতে আমাকে কম পরিশ্রম করতে হয় নি। মাসের পর মাস, বছরের পরে বছর ধরে ওদের প্রাণপণে বোঝাতে চেষ্টা করেছি যে ইতালির বৈদেশিক নীতিতে চালাকি বা কূট কৌশলের কোন স্থান নেই। সোজা সরল পথে চালিত হয়েছে এই বৈদেশিক নীতি   কোন পরিস্থিতিতেই বিপথগামী হয় নি। যার জন্য এই নীতির ওপরে সদাসতর্ক নজর রাখা হয়েছে। সত্যের ওপরে প্রতিষ্ঠিত এই নীতি সবার দিকেই নজর রেখে করা ; এবং ইতালিও আশা করে যে বিদেশী সরকাররাও তাদের নীতি ইতালির মতো সত্যের ওপরে প্রতিষ্ঠিত করবে। এই বোঝাপড়ার প্রচেষ্টা কিন্তু ইতালিকে নতুন ঘটনাবলীর চিরাচরিত প্রভাত-দিগন্তের অনেকটা ওপরে স্থাপনা করেছিল।

১৯২৪ সালের বসন্তকালে সিনেটে ইতালির বৈদেশিক নীতির ওপরে যে বক্তব্য রেখেছিলাম, তা'তে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে আমাদের অবস্থানের কথা পরিষ্কার ভাবে তুলে ধরে ছিলাম। বিশেষ করে পৃথিবীর যেসব ছোট বড় ঘটনা ইতালিতে বা ইতালিকে ঘিরে সংগঠিত হয়েছে। আমার কাজকর্মেরও পরিষ্কার একটা দৃষ্টিভঙ্গীও দেই। মন্ত্রীপরিষদের সাফল্যগুলোও এতে স্পষ্ট করে তুলে ধরা হয়েছিল। আমার বক্তব্যের মাধ্যমে এই সত্যকেই প্রতিষ্ঠা করেছিলাম যে পৃথিবীর যে অংশে ইতালি অবস্থিত তার সত্য মূল্য নির্ধারণ করা হোক।

কিন্তু নিরেট স্পর্শনীয় এই ফলাফলে পৌঁছনোর আগে কেউ-ই ভাবে নি যে এতো সহজে এবং হাল্কা পদক্ষেপে এখানে পৌঁছনো সম্ভব। আমি জানতাম বেশির ভাগ লোক-ই রোমকে সমস্ত নষ্টের কেন্দ্র হিসেবে সন্দেহের চোখে দেখতো। আমাদের দেশের এবং ফ্যাসিবাদের যারা শত্রু, তারা সবরকম উপায়ে তাদের শক্তি বৃদ্ধির চেষ্টা করে যাচ্ছিলো। আমাদের বক্তব্যকে বাঁকা পথে ঘুরিয়ে, মিথ্যা খবর ছেপে এবং আমাদের বৈদেশিক নীতিতে ভুল টুল ধরে। কিন্তু যা সত্য তা' সমস্ত বাধাবিঘ্ন, অতীতের চিৎকার, সুবিধাবাদীর প্রচেষ্টা ইত্যাদি সবকিছু পেরিয়ে ভাস্বর হয়ে দেখা দেয়।

পৃথিবীতে এমন কোন দেশ নেই যেখানের বৈদেশিক নীতি দেশের জনসমর্থনে তৈরি করলেও ভেতরের শত্রুরা নিরন্তর সমালোচনা করে যায়। তাই যখন আমি আমার বৈদেশিক নীতির দ্বারা বর্হিজগতের অশান্তিময় পরিবেশটাকে কিছুটা হলেও শান্ত করতে এবং দেশের ভেতরে আর বাইরে ইতালির মূল উদ্দেশ্যগুলো তুলে ধরতে পেরেছি, তখন দেশের ভেতরের কিছু লোক আমার সেই সফল নীতির সমালোচনায় সোচ্চার হয়ে উঠেছে।

ওদের মধ্যে একজন ছিল কাউন্ট স্কোরজা। ১৯২২ সালের অক্টোবর মাসে যে প্যারিসে ইতালির প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করেছে।

লোকটা বিগত সরকারের মন্ত্রী হিসেবে বাচাল এবং দায়িত্বজ্ঞানহীন ছিল। আড্রিয়াটিক পরিস্থিতিতে নিজের নাম জড়িয়েছিল স্রেফ আমাদের জাতিকে লাঞ্ছনা গঞ্জনার মধ্যে টেনে নিয়ে যাওয়ার জন্য। এই ভূতপূর্ব মন্ত্রী মহোদয় সব ব্যাপারেই অপেশাদারী মনোভাবসম্পন্ন ছিল। বক্তব্যে এমন সব স্থবির বৈদেশিক নীতির উল্লেখ করতো যাতে বোঝা যায় প্যারিসে নিজের পদের গুরুত্ব বা মহিমা উপলব্ধীর ক্ষমতা ছিল না লোকটার। যখন ইতালি একটা ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র পেতে চলেছে, তখনই লোকটা ক্ষমতা হারানোর দুঃখে দেশের সেবা করার বদলে বাড়ি ফেরার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়ে। এমন কি শেষ পর্যন্ত ফরাসী দেশের রাজধানীতে বসে ফ্যাসিষ্ট সরকারকে যতোখানি বিপদে ফেলা যায়, তার সবরকম চেষ্টা করতেও কসুর করে নি। ইতিমধ্যে কিন্তু সেখানের রাজনৈতিক দলগুলো ইতালির একতাবদ্ধ হয়ে কাজ করার বিরোধীতা করে যাচ্ছিলো। ঈর্ষাবশত। কাউন্ট স্কোরজা তো একদা আমার অন্তর্দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক নীতির সমালোচনা মুখর হয়ে উঠেছিল। এমন কি তার সেই সমালোচনা থেকে আমার রাজনৈতিক পথ এবং ফ্যাসিষ্ট ইতালি সম্পর্কে ধ্যান-ধারণাও বাদ পড়ে নি। আমি ওকে একটা টেলিগ্রাম পাঠিয়েছিলাম। নীচের বয়ানে ঃ

আমি আপনার এই কাজকে ভলোভাবে নিতে পারি নি; বরং কদর্য একটা ব্যাপার বলেই মনে হয়েছে। বিশেষ করে বৈদেশিক নীতিসম্পর্কে আমার আদেশ যখন এখনো সংসদে রাখা হয় নি। আমার ধারণা ভুল যে এই আদেশে শুধু আবেগ বা ক্রুদ্ধতাকেই তুলে ধরা হবে।

সুতরাং আমি চাইবো যে আপনি আপনার স্থানেই থাকুন ; সরকারকে বিপন্ন করার চেষ্টা করবেন না। এই মুহূর্তে জাতীয় বিচার বিবেচনার স্থান-ই সব থেকে উঁচুতে। আমি টেলিগ্রাম মারফৎ আপনার উত্তর পেতে আগ্রহী এবং আপনার সম্পর্কে আমার মতামত অপেক্ষামান রইলো।

।। মুসোলিনি।।

এই টেলিগ্রামের প্রত্যুত্তরে কাউন্ট স্কোরজার কাছ থেকে পলায়মান একটা উত্তর পাই। স্পষ্ট করে তা'তে কিছু লেখা নেই। আমি ওকে রোমে ডেকে পাঠিয়ে কিছুক্ষণ আলোচনার পরে বলি যে মানসিক চিন্তাধারার দিক থেকে আমরা এক পথের যাত্রী নই। তারপর ওকে ওর অফিসের দায়িত্বভার থেকে মুক্তি দিয়ে কাজ থেকে বরখাস্ত করি। এই একটা সময় যখন কেন্দ্রীয় শাসকবর্গের অধস্তন কোন সরকারী কর্মচারীর সমালোচনার মুখোমুখি হওয়াটা উচিত হবে না। কারণ ইতালির রাজনৈতিক জীবনে বর্তমানে যা সবচেয়ে প্রয়োজন তা' হলো আদেশ, সংঘবদ্ধতা আর শৃঙ্খলাবোধ। বিদেশে আমাদের প্রতিনিধিদের জীবনযাত্রা যেমন একদিকে শীতল, তেমনি নিঃসঙ্গতায় ভরা। নিজেদের স্বশাসিত বলেও মনে করে। যার জন্য তারা দেশের প্রতি কর্তব্যবোধ থেকে শত যোজন দূরে থাকে।

" আমার এই প্রথম দৃঢ় মনোভাব সবার প্রতি একটা সংকেত-ই বহন করে আনে। যারা এতোদিন কূটনৈতিক সার্ভিসে থেকেও সরকারের নির্দেশ এবং প্রয়োজনের বাইরে নিজেদের সরিয়ে রেখেছে—তাদের দিনও যে শেষ হয়ে এসেছে সেই সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ নেই। কূটনৈতিকতার এই কদর্য দিকটাকে বন্ধ করে দিয়ে আমি সমস্ত শক্তি ব্যয় করি সেইসব রাজনৈতিক সমস্যাগুলোর সমাধানের প্রতি, যেগুলোর ওপরে আমাদের ভবিষ্যত নির্ভরশীল। আগেকার সরকারগুলোর ভাঙাচোরা ভুলে ভরা নীতিগুলোকে খাতিয়ে দেখতে শুরু করি। একগাদা শান্তি চুক্তি বের হয় যার অধিকাংশ ভুলে ভরা আর যে কারণে পূর্ববর্তী শাসকবর্গকে পদে পদে অসুবিধার সম্মুখীন হ'তে হয়েছে।

ইতালিতে তখন পর্যন্ত যুগোশ্লোভিয়ার সঙ্গে রাফালো চুক্তিটা দগদগে ক্ষতের মতো জ্বলজ্বল করছে। প্রকাশ্যে সবাই চুক্তিটার সমালোচনা করে চলেছে। আমি ব্যাপারটার মধ্যস্ততা করে ক্ষতটাকে শুকিয়ে দিতে চাই। ১৯২২ সালের ১৬ই নভেম্বর সংসদে বৈদেশিক নীতির মতো স্পর্শকাতর বিষয় নিয়ে বক্তব্য রাখি। আমি সর্বদা যা বলে এসেছি যে চুক্তি সে ভালো বা মন্দ যা-ই হোক না কেন তাকে মেনে চলতেই হবে। একটা শ্রদ্ধাশীল জাতির কাছে এছাড়া কোন বিকল্প নেই। তবে চুক্তিগুলো যেমন অমর বা চিরন্তন নয়, তেমনি সারানো যায় না এমনও নয়। কারণ এই চুক্তিগুলো হলো ইতিহাসের এক একটা অধ্যায় ; কিন্তু ইতিহাসের নাটকের শেষাংশ নয়। বিভিন্ন দলীয় শাসকবর্গের বৈদেশিক নীতির আলোচনা প্রসঙ্গে আমি আমার মতামতের সারাংশ নির্দিষ্ট রূপে উপস্থাপিত করি ঃ

আমরা পাগলের মতো পরার্থবাদীর নীতি নিয়ে চলবো না ; তেমনি অন্য লোকেদের স্বার্থ দূরে ঠেলে আত্মকেন্দ্রীক মনোভাব নিয়েও চলার মতো মনোবৃত্তি আমাদের থাকাটা উচিত হবে না।

আমাদের নীতি হওয়া উচিত স্ব-শাসিত। তবে এই নীতি প্রত্যয় এবং দৃঢ়তার সঙ্গে প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়োজন।

১৯২২ সালের নভেম্বর মাসে লুসার্নে ফ্রান্সের পঁকেরে এবং ইংল্যান্ডে কার্জনের সঙ্গে মিলিত হই। বলাবাহুল্য তৎক্ষণাৎ সমভাবে আমি মিত্রশক্তির সংস্পর্শে আসি। কয়েক দফায় পরিষ্কার কিন্তু নির্দিষ্ট পথে আমাদের আলোচনা চলে। কিছু আলোচনা তো প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে।

ইতালির বর্তমানে কিছুটা হলেও আত্মোৎসর্গ করার সময় এসেছে এবং ইতিহাসের সমভূমিতে ইংল্যাণ্ড আর ফ্রান্সের পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আন্তর্জাতিক চারিত্রিক দৃঢ়তা নিয়ে আলোচনায় অংশ গ্রহণের প্রয়োজন।

লুসার্নে স্বল্প সময়ের বিরতির মধ্যে রুমেনিয়ার বৈদেশিক মন্ত্রী, আমেরিকার রোমে অবস্থানরত রাষ্ট্রদূত রিচার্ড ওয়াজবার্ন চাইল্ড এবং আমেরিকার ডেলিগেটদের প্রধানের সঙ্গে আমার আলোচনা হয়। তখন আমি বাকচাতুরীর ছলগুলোর পাশ কাটিয়ে গেছি।

আমার সুইজারল্যাণ্ড পরিভ্রমণের ফলাফল সংক্ষিপ্তকারে নীচে দেওয়া হলো ঃ

প্রথমত, বিদেশী কূটনীতিদের কাছে ইতালির সম্মানের ব্যাপারটা পরিষ্কার ভাবে তুলে ধরা হয়।

দ্বিতীয়ত, উদাহরণ দিয়ে আমাদের নতুন ধরনের বৈদেশিক নীতির ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করে পৃথিবীর দায়িত্বশীল সমস্ত কূটনীতিবিদদের সঙ্গে আর আমার মধ্যে সরাসরি যোগাযোগের প্রস্তাব রাখি।

সেই বছরের ডিসেম্বর মাসে মন্ত্রী পরিষদের কাছে আমাদের বিদেশ সংক্রান্ত কার্যাবলী সম্পর্কে নতুন প্রস্তাব ঘোষণা করি। ফিউমে আর ডালমাটিয়া সমস্যার সমাধানেও এগিয়ে যাই। বিশেষ করে পরবর্তী চুক্তিগুলো করার ফলে যে সমস্যার উদ্ভব হয়েছে এবং যার পরিণতি উত্তরাধিকারী হিসেবে আমার ওপরে এসে বর্তেছে— সেইসব সমস্যাগুলোর সমাধানের বিষয় নিয়েও চিন্তা-ভাবনা করতে শুরু করি। লর্ড কার্জনের সঙ্গে আমার দ্বিতীয়বার সাক্ষাৎ হয়। তারপরে লন্ডনে ক'দিনের জন্য যাই। এবং বলাবাহুল্য আমাকে যথেষ্ট আতিথেয়তার সঙ্গে শহর লন্ডন বরণ করে নেয়। ইংল্যান্ডের রাজনৈতিক জগতও আমার বক্তব্য যথেষ্ট মনযোগ দিয়ে শোনে।

মিত্রশক্তির ঋণ নিয়েও টেবিলে আলোচনা হয়। এই বিষয়ে রোমেই আমি আমেরিকার রাষ্ট্রদূত মিষ্টার চাইল্ড আর ব্রিটিশ রাজদূতের সঙ্গে আলোচনা করেছিলাম। আমার পরিকল্পনা ছকা ছিল যে সবচেয়ে ফলোৎপাদক সমাধানটাকে খুঁজে বার করেত হবে। কিন্তু অপরপক্ষের সেই সমাধানের থেকে সরে আসার মানসিকতা এবং ঋণ শোধের ব্যাপারে ফ্রান্সের জার্মানীর রূঢ় অঞ্চল দখলের প্রস্তাব—পুরো আলোচনাটাকেই ভেস্তে দেয়। এই সমস্যার সমাধান হলেই কিন্তু পৃথিবীর অর্থনৈতিক উন্নতি সহজ সমাধানের পথ খুঁজে পেতো।

আমার কাছে আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক সমস্যা বলতে বৈদেশিক নীতি-ই বোঝাতো। যার জন্য ১৯২৩ সালে অনেক জাতির সঙ্গে রাজনৈতিক পটভূমিকায় অনেকগুলো ব্যবসায়িক চুক্তির সম্পাদনা করেছিলাম। এতোগুলো শান্তি এবং আন্তর্জাতিক ব্যবসায়িক চুক্তি সম্পন্ন করার ফলে আমার উদ্দেশ্যে যখন শান্তি বিঘ্নিত করার অপবাদ উঠতো, বলাবাহুল্য ব্যাপারটাতে আমি রাগ করা দূরে থাক, মজা-ই উপভোগ করতাম।

আমাদের অর্থনৈতিক দুরবস্থাকে দূর করতে এই ব্যবসায়িক চুক্তিগুলো যে যথেষ্ট সাহায্য

করেছিল তা'তে সন্দেহ নেই। ১৯২৩ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে আমি ইতালি আর সুইজারল্যান্ডের মধ্যে ব্যবসায়িক চুক্তি স্বাক্ষর করি। জুরিখে। নৌ-বাহিনীর অস্ত্রসজ্জায় সীমা বেঁধে দেওয়ার ব্যাপারে ওয়াশিংটন চুক্তিকে অনুমোদন করি। চেকোশ্লোভাকিয়া, পোল্যন্ড, স্পেন এবং শেষমেষ ফ্রান্সের সঙ্গেও ব্যবসায়িক চুক্তিগুলো সম্পাদনের কাজ শেষ করে ফেলি। সোভিয়েত রাশিয়ার সঙ্গেও বাণিজ্যিক সম্পর্ক গড়ে তুলি।

আমাদের হিসেব উল্টেপাল্টে দেখলো সবাই বুঝতে পারবে যে আমরা শান্তি বজায় রাখতে এবং বন্ধু তৈরির ব্যাপারে কতো বিনিদ্র রাত কাটিয়েছি। কিন্তু স্ব-শাসনের পথ থেকে এতোটুকু বিচ্যুত হয় নি বা কারোর ক্ষমতার দাপটের কাছে মাথা নত করি নি। আমরা কঠিন পরিশ্রম এবং ধৈর্যের সঙ্গে ইটের পর ইট গেঁথে, পাথরের পর পাথর সাজিয়ে তিলে তিলে শান্তির কাঠামোটা নির্মাণ করেছি। হ্যাঁ, সেই কাঠামো বাস্তবের ওপরে প্রতিষ্ঠিত ; স্বপ্ন বা দূর কল্পনার ভিতের ওপরে নয়। সবাইকে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ মানসিক শক্তিশালী হ'তে যেমন অনুপ্রাণিত করেছি, তেমনি সহৃদয় ভদ্র হ'তেও বলেছি।

দক্ষ বৈদেশিক সার্ভিস পেতে গেলে পৃথিবীর পক্ষে সবচেয়ে আগে প্রয়োজন পড়ে কিছু ঘরবাড়ি এবং রাজনৈতিক যন্ত্র পরিষ্কার করার তাগিদা। কারণ এই আমলা সর্বস্ব প্রয়োজনের থেকে অনেক বেশি লোক নিয়ে গঠিত এই সার্ভিসের লোকজন অধিকাংশ ক্ষেত্রেই হয় দুর্বল এবং কুচক্রী। বিশেষ করে জায়গা এবং উঁচু পদে ওঠার ক্ষেত্রে এরা যথেষ্ট ষড়যন্ত্রের আশ্রয় নেয়।

আমি তাই সর্বপ্রথমে আমাদের দূতাবাসগুলোকে ঢেলে সাজাতে শুরু করি। বিশেষ করে রাষ্ট্রগুলোর ব্যাপারে বাছাবাছি করে যোগ্য লোকেদের খুঁজে বার করি। কাজটা কিন্তু দীর্ঘ সময় ব্যাপ্ত এবং যথেষ্ট বিস্তৃত। কারণ পুরনো দূতাবাসগুলোকে ঢেলে সাজানো সহজ কাজ নয়। পুনর্গঠনের কাজে সমস্যা থাকলেও দৃঢ় হাতে তা সম্পন্ন করি।

বৈদেশিক নীতি এবং দূতাবাসগুলোর পুনর্গঠনের জটিল কাজে যখন জড়িয়ে পড়েছি, তখনো কিন্তু আদ্রিয়াতিক সমস্যাগুলোর সমাধানের জন্য যথেষ্ট সচেষ্ট ছিলাম। আর ঠিক তখনই খবর পাই যে আলবানিয়াতে কর্মরত ইতালির মিলিটারী মিশনের সমস্ত সদস্য সীমান্ত থেকে আসা একদল ডাকাতের হাতে হঠাৎ রাস্তার মধ্যে মারা পড়েছে। এই নৃশংস ঘটনায় সাহসী জেনারেল এনরিকো তেলেনি, সার্জেন মেজর লুইগি কোর্টে, গোলন্দাজ বাহিনীর লেফ্‌টেনান্ট মারিও বোনাসিনি এবং একজন সাধারণ সৈনিক ফারনিটিও মারা যায়। আন্তর্জাতিক চুক্তি অনুযায়ী ইতালির মিলিটারী মিশন অন্যান্য দেশের সঙ্গে হাত মিলিয়ে তাদের ওপরে দেওয়া দায়িত্ব সযত্নে পালন করেছিল। ইতালির প্রতি এই জগন্যতম অন্যায়ে সমস্ত জাতি বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে পড়ে। ইতিহাসে ইতালির প্রতি এই ঘটনা প্রথম নয়। বারবার ঘটেছে এবং ইতালি তা' বাধ্য হয়ে মুখ বুঁজে সহ্য করেছে। আমি ইতালির স্বার্থ যেখানেই ক্ষুণ্ণ হয়েছে, শ্রদ্ধায় ঘাটতি পড়েছে, সেখানেই গর্জে উঠেছি। সঙ্গে সঙ্গে গ্রীসের সরকারের কাছে চরম প্রতিবাদ জানাই।

ক্ষমা চাইতে বলি। এবং ক্ষতিপূরণ বাবদ পঞ্চাশ মিলিয়ান লিরে দাবী করি।

কিন্তু আমার এই প্রতিবাদের উত্তরে গ্রীস সরকার বধির সেজে থাকে। রকমারী বাহানা দেখায়। শুধু তাই নয় কয়েকটা মিত্র দেশকেও সঙ্গে নিয়ে আপ্রাণ-চেষ্টা করে আমার দাবী

থেকে পিছলে সরে যেতে। এই ধরনের বেসবল খেলার ব্যাপারে আমি নেই। কোনরকম দ্বিধা ছাড়াই আমি আমাদের নৌ-বাহিনীর একটা অংশ গ্রীসের দ্বীপ করফুতে পাঠিয়ে দেই। ইতালির নৌ-বাহিনী দ্বীপে নামা মাত্র আমি গ্রীসের শাসকদের কাছে চিঠি পাঠাই। লীগ অফ নেশানস্ ইতিমধ্যে এই ব্যাপারে তাদের অসহায়তার কথা প্রকাশ্যেই জানিয়ে দিয়েছে। করফু দ্বীপটাকে দখলে রেখেই আমি ঘোষণা করি যে লীগ অফ নেশানস্ যদি কার্যকরী কোন ব্যবস্থা নিতে অক্ষম হয়, তবে ইতালি লীগ অফ নেশানস্ থেকে সরে আসবে। এটা কিন্তু লীগ অফ নেশানসের প্রতি শুধু কাদা ছোঁড়ার জন্য বলিনি। ইতালির সৈন্য এবং অফিসারদের জীবনের প্রশ্ন এখানে জড়িত রয়েছে। আমলা জনোচিত মনোভাব দেখিয়ে এই সকরুণ ঘটনা— অধ্যায়ের পাতা উল্টানো কিছুতেই সম্ভব নয়।

ব্যাপারটা নিয়ে এতো ভুল বোঝাবুঝি এবং কাদা ছোঁড়াছুড়ি হয়েছে যে তার বহিঃপ্রকাশ আমাদের দাবীকে লোকের কাছে ঠিক মতো তুলে ধরা যায় নি। যার জন্য এমন সহজ ভাষায় দাবীটাকে জনসাধারণের কাছে নিয়ে যাই যাতে স্কুলের ছেলেমেয়েরাও দাবীটাকে স্পষ্ট বুঝে উঠতে পারে।

ঘটনাটাকে যখন বিচারের জন্য রাষ্ট্রদূতদের সম্মেলনে নিয়ে আসা হয়, প্রত্যাশা মতো বিচারের রায় ইতালির পক্ষেই যায়।

আমার প্রশ্নের সদুত্তরও গ্রীসের কাছ থেকে পাই। ক্ষতিপূরণের পুরো টাকাটাই গ্রীস তৎক্ষণাৎ দিয়ে দেয়। আমি এই ক্ষতিপূরণের অর্থ থেকে দশ মিলিয়ান গ্রীসের উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের জন্য দেই। তারপরে সামগ্রিক ব্যাপারটা পুরো খতিয়ে দেখে সন্তুষ্ট হয়ে করফু দ্বীপ থেকে আমাদের সেনাবাহিনীকে ফিরিয়ে আনি।

তবে সেই মাসে যে কয়েকটা দুঃখজনক ঘটনাও ঘটেছিল তা'তে সন্দেহ নেই। নতুন ফ্যাসিস্ট স্টাইলে গড়া বৈদেশিক নীতি সমস্ত অনুভূতিপ্রবণ ইতালিয়ানদের সুখী করলেও বিদেশীরা কিন্তু আমার এই নীতিকে সন্দেহের চোখে দেখে। এবং এই নীতির মাধ্যমে ওরা আর ইতালিয়ানদের ওপরে মতোব্‌রী করতে পারবে না। কোন কিছুতেই আমি নিজের পথ থেকে সরে আসিনি। সিনেটে এই ব্যাপারে আমি বক্তব্য রাখি ; গ্রীস এবং ফিউমে সমস্যাকে ঘিরে। সেই বক্তব্যে স্পষ্ট করে বলি ফিউমে সমস্যা হলো পরম্পরাগত। তাই যুগোশ্লোভাকিয়ার সঙ্গে যতো কম ক্ষতি মেনে নিয়ে সম্ভব আলোচনার মাধ্যমে সমস্যাটা সমাধানের চেষ্টা করি। আর আড্রিয়াতিক সমস্যা ঘোর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল বাফালো চুক্তির ফলে।

মন্ত্রী পরিষদ আমার নীতি এবং কার্যাবলী অনুমোদন করে।

১৯২৪ সালের জানুয়ারী মাসে শেষ পর্যন্ত মহান সার্ব রাজনৈতিক নেতা প্যাসিক এবং যুগোশ্লাভিয়ার মন্ত্রী নিন্‌কিকের সঙ্গে নতুন প্রতিবেশীর মধ্যে স্পষ্ট বোঝাপড়ার জন্য চুক্তি সম্পাদনা করি। এই চুক্তি সম্পাদনার ফলে ফিউমে ইতালির অংশ বলে গণ্য হয়। ১৯২৫ সালের সারা বছর আলাপ আলোচনার পর নেটুনো সম্মেলনে স্বাক্ষরের জন্য চুক্তিটা আনা হয়। এই চুক্তি দ্বারা দু'টো দেশের মধ্যে ভালো সম্পর্ক গড়ে তুলি। এখন শুধু যুগোশ্লাভিয়ার অনুমোদনের অপেক্ষা।

বিশাল ক্ষেত্র নিয়ে ব্যাপক কূটনৈতিক কাজকর্মের শেষেও নির্দিষ্টভাবে বলা চলে যে

ডালমাটিয়া আমরা হারিয়েছি। ইতিহাসের দ্বারা বিতাড়িত হয়েছে আমাদের বেশ কয়েকটা শহর—যা পবিত্র শহর হিসেবে অতীতে গণ্য করা হ'তো। সেই সঙ্গে শহরগুলোর বাসিন্দাদেরও আমরা হারিয়েছি। নতুন চুক্তির-ই ফলাফল এগুলো। তবে আমি যা করেছি তার চেয়ে ভালো ফলাফল পাওয়া কোনরকমেই সম্ভব ছিল না। যে শুভেচ্ছা এবং আগ্রহকে সম্বল করে প্যাসিক এবং নিন্‌কিকের সঙ্গে আলাপ আলোচনা এবং বোঝাপড়া চলিয়েছিলাম, তার জন্য-ই এতোটুকু ফল হলেও পাওয়া গেছে।

যদিও নেটুনো সম্মেলনের অনুমোদন যুগোশ্লাভিয়া সরকার করে নি, তবু আমাদের সীমান্ত সুরক্ষিত। তবে যুগোশ্লাভিয়ার উচিত শুভেচ্ছার মনোভাব দেখানো। যাইহোক আমাদের শান্ত চিত্তে সীমান্তের এই পাশে দাঁড়িয়ে বিপদগ্রস্ত ঝঞ্জাবিক্ষুব্ধ প্রতিবেশীদের দেখতে অসুবিধা নেই।

১৯২৪ সালে আমার বৈদেশিক নীতি মন্ত্রী পরিষদে তিনশো পনেরো ভোটে অনুমোদন পায়। বিপক্ষে ভোট পড়ে ছ'টা। আর অনুপস্থিত থাকে ছাব্বিশজন সদস্য। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের নতুন বিদেশ মন্ত্রী চেম্বারলিনের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয় সেই বছরের ডিসেম্বর মাসে। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বহু ঘটনার সময় চেম্বারলিন বন্ধু হিসেবে ইতালি ও ইতালিয়ানদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে।

১৯২৫ সালে আফগানিস্তানের শাসকবর্গের সঙ্গে ঝগড়া বাঁধে। সেই সুদূর দেশের রাজধানী কাবুল শহরে একজন ইতালিয়ান ইঞ্জিনীয়ার পিপার্ন চাকরী আর পড়াশোনা করতে গিয়েছিল। কয়েকটা আন্তর্জাতিক ঘটনা প্রবাহের দরুণ তাকে হত্যা করা হয়। কিন্তু আফগান সরকার সেই মৃত ইঞ্জিনীয়ার পিপার্নর পরিবারকে কোনরকম ক্ষতিপূরণ দিতে রাজী হয় না।

আমাকে বাধ্য হয়ে-ই দাবী পেশ করতে হয়। যদিও দাবী করার মতো যথেষ্ট কারণ ছিল, তবু সেই সুদূর দেশের সঙ্গে বন্ধুত্বের দরজা বন্ধ করে দিতে চাই নি। বলতে আপত্তি নেই যার জন্য আফগানিস্থানের রাজা যখন রোমে আসে, তাকে সহানুভূতির সঙ্গে যথেষ্ট উষ্ণ সম্বর্ধনা জানানো হয়।

আকাশের বুকে ভাসমান মেঘ আসে এবং যায়। আবার পুঞ্জ পুঞ্জ নতুন মেঘ এসে জমা হয়। আমাদের পূর্ব সীমান্ত বরাবর বসবাসকারী জার্মানরা ইতালির বিরুদ্ধে প্রচার চালানো শুরু করে। ১৯২৬ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে ফ্যাসিষ্ট সরকার যখন ইতালির ন্যায্য মূল্য বুঝে নিতে সচেষ্ট হয়, পুরো বোঝাটা হাই-এডিজে অঞ্চলে বসবাসকারী মিশ্র বাসিন্দাদের ওপরে গিয়ে পড়ে। ব্রেনার পাসের পেছনে যেসব জার্মান অধিবাসীরা বাস করতো, তাদের সঙ্গে আমাদের সম্পর্কের তিক্ত দিকটা স্পষ্ট ভাষায় আমি তুলে ধরি। আমার দু' দু'টো সোজাসুজি বক্তব্যে বহু কাপুরুষ ষড়যন্ত্রকারী এবং আবেগপ্রবণ মানুষের বুক থর থর করে কেঁপে ওঠে। সাহসীরা ঠিক এই ধরনের বক্তব্য শুনতে অভ্যস্ত নয়। এই ব্যাপার নিয়ে বস্‌দারী নামের রাষ্ট্রদূতকে আমি বরখাস্ত করি ; কারণ এইসব ঘটনার মূলে ছিল এই বস্‌দারী। ইতালি এবং জার্মান অধিবাসীদের মধ্যে বস্‌দারী সুসম্পর্কের ধারাটাকে অব্যহত রাখতে পারে নি। কিন্তু ইতালির মতো ক্ষমতাশালী একটা দেশের কূটনীতিকের এটা অবশ্য কর্তব্যের মধ্যে পড়ে।

এই ব্যাপারকে কেন্দ্র করে খোলাখুলি যে বক্তৃতা আমি দিয়েছিলাম, সেই বক্তৃতা কিন্তু অষ্ট্রিয়ার প্রধানমন্ত্রী সিপেলের নীতির যে বক্তব্য রেখেছিলাম— সেই কাপড়ের-ই টুক্‌রো বিশেষ। বলতে আপত্তি নেই যে এই বক্তব্যের মাধ্যমে সীমান্তের ওপাশে বসবাসকারী জার্মান অধিবাসীদের সঙ্গে আমাদের সম্পর্কের স্পষ্ট অভিভাষণ ছিল। আস্তিনের তলায় কিছু গুটিয়ে রাখতে চাই নি।

হাই এডিজের ব্যাপারটা হলো যখন অন্যান্য রাষ্ট্রের সঙ্গে সুদূরের পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের সম্পর্কের প্রশ্নটা উঠেছিল। ঠিক সেই সময় বুলগেরীয়া, পোলিশ, গ্রীস, তুর্কী এবং রুমেনিয়ার বিদেশ মন্ত্রীদের সঙ্গে দ্বি-পাক্ষিক আলাপ আলোচনায় আমি ব্যস্ত।

তখন শহর রোম রাজনৈতিক কাজকর্মের রীতিমতো আর্কষণীয় কেন্দ্রবিন্দু হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমার বৈদেশিক নীতির প্রতি বিশ্বস্ততা এবং আন্তরিকতার দরুণ সমস্ত ইতালি জাতির সমর্থন পেয়েছিল। যার জন্য অন্যান্য জাতির চেয়ে ইতালির জনসাধারণের সমর্থন এই নীতির প্রতি ছিল অনেক বেশি। দ্ব্যর্থক এবং কোন ব্যাপারে অস্পষ্টতা আমার চরিত্রে ছিল না। যার জন্য আমার কোন নীতিকেই এই দ্ব্যর্থকতা বা অস্পষ্টতার স্থান হয় নি। আর সেইজন্য দৃঢ়তা এবং মর্যাদার সঙ্গে আমি আমার বক্তব্য রাখতাম। কারণ আমার পেছনে ছিল ইতালির জনসাধারণ, যারা তাদের কর্তব্য কর্ম সুচারুরূপে সম্পন্ন করেছে। সুতরাং বর্তমানে তাদের পৃথিবীর সব জাতির কাছেই মর্যাদার দাবী জানানোর অধিকারও রয়েছে।

সীমান্তের অপর পাড়ে বসবাসকারী ইতালিয়ানদের ভ্রাতৃত্ববোধ এবং বিশ্বস্ততার জন্য অভিনন্দন জানাই। আমি কখনো ওদের অভিবাসী বলে সম্বোধন করি নি। কারণ অতীতে এই শব্দটার সঙ্গে যেন লাঞ্ছনা গঞ্জনার আভাস জড়িয়ে রয়েছে। বিশেষ করে এক ধরনের অনুন্নত স্ত্রীলোক এবং পুরুষের কথা শব্দটা উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে মানসক্ষেত্রে ভেসে ওঠে। বলতে গর্বে বুক ভরে উঠে যে অন্যের অনুভূতির ওপরে আঘাত না করেও আমি আমার দেশবাসীকে রক্ষা করতে পেরেছি। এবং এই সংরক্ষণ সম্ভব হয়েছে আন্তর্জাতিক আইন এবং জাতির মধ্যে শুভেচ্ছা বিনিময়ের মাধ্যমে।

যারা ব্যবসা বা ধর্মীয় বিশ্বাসে অথবা নিছক পর্যটক হিসেবে ইতালিতে আসতো, তাদের ইতালির জনগণ যথেষ্ট আতিথ্যের সঙ্গে বরণ করে নিতো। এমন কি ইতালি সম্পর্কে কৌতূহলী ট্যুরিস্ট এই আতিথ্যের বাতাবরণের বাইরে থাকতো না। কারণ আমি ইতালিয়ানদের এই শিক্ষা-ই দিয়েছিলাম যে বিদেশী অতিথিদের যথাযথ সম্মান যেন দেখানো হয়। কারণ কূটনৈতিক তর্ক-বির্তকের দরুণ বিদেশী দূতাবাসের সামনে অমর্যাদাকর বিক্ষোভ প্রদর্শনকে আমি কখনই মেনে নিতে পারি নি। এটা অতি প্রাচীন গণতান্ত্রিক একটা বদভ্যাস। যা ফ্যাসিবাদ পরিষ্কারভাবে বাতিল করে দিয়েছিল। এমন অনেক সময় গেছে যে অন্যান্য দেশের সঙ্গে সম্পর্কের টানাপোড়ানির সময় ইচ্ছে করলেই ইতালি তা' করতে পারতো। কিন্তু আমি এই ধরনের প্রতিবাদ বিক্ষোভকে সব সময় ফ্যাসিষ্ট মর্যাদার সীমানার মধ্যে রেখেছি। যদিও বিদেশী পত্র-পত্রিকাগুলো এইসব বিক্ষোভ প্রতিবাদকে রঙ চড়িয়ে অনেক বেশি অতিরঞ্জিত করে প্রচার করেছে। ইতালির জনসাধারণের ওপরে আদেশ দেওয়া এবং শৃঙ্খলা রক্ষার ভার যে হাতে তুলে নিয়েছে, তার পক্ষে এই সীমা মেনে চলা যে যথেষ্ট কষ্টকর তা'তে সন্দেহ নেই।

আমার নির্দেশিত বৈদেশিক নীতি ছিল সহজ এবং সরল। সহজেই লোকে যাতে বুঝতে পারে। শুধু কথা, ব্যবহার অথবা কাগজের কূট চালাচালির জন্য নয়। কিন্তু এই নীতি রচনা করা হয়েছিল যাতে জাতীয় সম্মান উঁচুতে তুলে ধরা যায় এবং চুক্তি আর শর্তগুলোকে সার্থক রূপায়ণের মাধ্যমে বিদেশী এবং ইতালির জনসাধারণের মধ্যের সম্পর্কটাকে সুদৃঢ় ভিতের ওপরে দাঁড় করানো যায়।

দ্বিতীয়ত, আমি বৃহৎ শক্তিগুলোর সঙ্গে বিশেষ কোন মৈত্রী চুক্তি করি নি। পরিবর্তে আমি মিত্র শক্তি গুলোর সঙ্গে বেশ কিছু সন্ধি চুক্তি সম্পাদনা করি, যাতে ইতালির জনগণ এইসব জাতির সঙ্গে সুন্দর সম্পর্ক বজায় রেখে উন্নতি করতে পারে। বিশেষ করে যেসব জাতি এবং দেশের ঐতিহাসিক গুরুত্ব অপরিসীম। যেমন ইংল্যান্ড।

সেইসব সন্ধি চুক্তি করতে গিয়ে দুর্বল জাতিদেরও কিন্তু অবহেলা বা অবজ্ঞা করি নি। যাতে ইতালির জনগণের প্রভাব সেইসব জাতির ওপরেও পড়তে পারে। যেমন আলবানিয়া। হাঙ্গেরী এবং তুর্কীকেও এই তালিকা থেকে বাদ দেই নি। ভূমধ্যসাগরের বুকের ওপর দিয়ে যাতে শান্তিতে ব্যবসা-বাণিজ্য করা যায়, তার জন্য স্পেনের সঙ্গেও শান্তি চুক্তিতে আবদ্ধ হই। আর শিল্প বাণিজ্য দ্রুত অগ্রসর হওয়ার জন্য রাশিয়ার সঙ্গে ব্যবসায়িক সম্পর্ক স্থাপন করি।

বোকারা বুঝতে পারে নি যে এইসব চুক্তির ক্ষেত্রে আমার বিনয় এবং অপর জাতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল মনোভাব থাকতে পারে, কিন্তু কারোর কাছে মাথা নীচু করি নি। লীগ অফ নেশানস্ এবং আরো কিছু কূটনৈতিক কার্যকলাপ লোকার্ন চুক্তির-ই ফলবিশেষ। নিজেকে সতর্ক রেখে আলোচনা চালাতাম, কিন্তু মনের ভেতরে বিশ্বাস রাখতাম নিরস্ত্রীকরণের। তবে কিছু অবাস্তব ব্যাপার যে নজরে আসে নি, তা' নয়।

ইতিমধ্যে দূতাবাসগুলোর অবস্থা যেমন ভালো করেছি, তেমনি শৃঙ্খলার মধ্যেও নিয়ে এসেছি। এবং রাষ্ট্রদূত আর কর্মচারীদের মধ্যে বেশির ভাগ-ই ফ্যাসিবাদের গন্ডীতে জন্ম নিয়েছে। বড় হয়েছে। যুদ্ধের অবর্ণনীয় কষ্টের মধ্যে দিয়ে যেমন বড় হয়েছে, তেমনি এই কষ্ট ভাবাবেগের ভেতর দিয়েই এরা নতুন জন্মও লাভ করেছে। আমাদের উপনিবেশগুলোতেও ফ্যাসিবাদ্ ছড়িয়ে দিয়েছি। কারণ ইতালির উপনিবেশগুলোতেও আমি শৃঙ্খলা চেয়েছি। আর চেয়েছি ইতালির নাগরিকদের জন্য ছন্দবদ্ধ এক উন্নতিকামী জীবনধারা। আমাদের নীতি সার্থকভাবে রূপায়ণ করার জন্য প্রতিনিধিদেরও যোগ্য করে তোলার প্রয়োজন।

ইতালিতে বসবাসকারী শুধু ইতালির নাগরিকরা নয়, পৃথিবীর সর্বত্র ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা ইতালিয়ানরাই নতুন এক জীবনের স্বাদ পায় এবং রীতিমতো গর্ব অনুভব করে। পৃথিবীতে যেসব দেশ এবং জাতি আন্তর্জাতিক রাজনীতির নিয়ামক, তারাও ইতালিকে শ্রদ্ধার চোখে দেখতে শুরু করে।

আমার উপনিবেশবাদের সঙ্গে বৈদেশিক নীতি যথেষ্ট সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল। যুদ্ধের আগে এবং পরে আফ্রিকায় এবং আমেরিকাতে আমাদের উপনিবেশগুলোর উন্নতির জন্য যথেষ্ট কাজ আমরা করেছি ; তবে উপনিবেশগুলোর মাধ্যমে ইতালির কী প্রচণ্ড উন্নতি হ'তে পারে সেটা কখনো ভেবে দেখি নি। আসলে উপনিবেশগুলোতে আমরা যেমন প্রাণসঞ্চার করতে পারি নি, তেমনি ফলপ্রসূত হয় নি উপনিবেশগুলোর মাধ্যমে ইতালির জীবনধারা। কিন্তু একথা বললে বোধহয় অন্যায় হবে না যে যুদ্ধের আগে এবং পরে উপনিবেশগুলোর জন্য

যে পরিশ্রম আমরা করেছি, তার বদলে আইনত যেটুকু সন্তুষ্টি অন্তত পাওয়া উচিত, তা'ও উপনিবেশগুলোর থেকে আমরা পাই নি।

ইতালির বিপুল ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার সমাধান করার জন্য শুধু নয়, অর্থনৈতিক উন্নতির জন্যও উপনিবেশগুলোয় আমাদের মনোযোগ দেওয়া উচিত ছিল। এমন কি যুদ্ধের দীর্ঘ দশ বছর পরেও এই সমস্যার সমাধান হয় নি ; আমাদের মাত্র কয়েকটা এবং এই ক'টা উপনিবেশের সবগুলোতেও উন্নতি করার অবকাশ নেই। ইরিট্রিয়া আমাদের প্রথম উপনিবেশ, যার এতোটুকুও পরিবর্তন হয় নি। কূটনৈতিক বোঝাপড়ার মাধ্যমে সোমালিল্যাণ্ডকে ব্রিটিশ জিয়োবাল্যান্ডের সঙ্গে একত্র করে শুধুমাত্র বর্ধিত-ই করা হয়েছিল। সীমানার দিক থেকে।

শেষে গভর্নর ডি ভিচিকে ধন্যবাদ জানাতেই হয়। তারই জন্য সোমালিল্যাণ্ডে শান্তি স্থাপন করে রাজধানীকে আমাদের উপনিবেশগুলোর দিকে কিছুটা হলেও টেনে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়। উপনিবেশগুলোকে নির্দিষ্ট কিছু কাজে লাগানো যেমন সম্ভব হয়, তেমনি ইতালির শ্রমিকদেরও কাজের জোগান দেওয়া যায়। লিবিয়ার উপনিবেশ যার মধ্যে সিরেনেসিয়া এবং ত্রিপোলিটানিয়াও ছিল, যুদ্ধের সময় সীমানা কমতে কমতে সমুদ্রের তীরে এসে দাঁড়ায়। অবশ্য কয়েকটা প্রধান শহর সেই উপনিবেশের মধ্যে ছিল। ফ্যাসিষ্টরা ক্ষমতা দখলের পর এই উপনিবেশের শোচনীয় অবস্থার মুখোমুখি হয়। এটাকেও যথাসময়ে পরিষ্কার করে আমাদের নীতি অনুযায়ী সামরিক বাহিনীর দখল নিয়ে অর্থনৈতিক ব্যাপার স্যাপারে সমস্যার গভীরে ঢোকে। সামরিক বাহিনীর দৌলতে এককম বিনা বাধায় জিয়ারাবাব পর্যন্ত বিস্তৃত সিরেনেসিয়া এবং ত্রিপোলিটানিয়ার সীমান্ত আন্তর্জাতিক চুক্তি অনুযায়ী যতোটা সম্ভব আমাদের সামরিক বাহিনী ততোদূর পর্যন্ত নিজেদের অধিকার বিস্তারে দ্বিধা করে নি।

দু'টো উপনিবেশেরই যেন পুনর্জন্ম হয়। ত্রিপোলী তো ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের শহরগুলোর মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর শহর বলে পরিগণিত। কয়েকজন চিকিৎসকের মতে ত্রিপোলী হলো হৃত স্বাস্থ্য উদ্ধারের সবচেয়ে আদর্শ কেন্দ্র। আমরা শহরের জন্য প্রয়োজনীয় জল যেমন খুঁজে বার করেছি, তেমনি পাহাড়ে সেচের জন্যও জলের বন্দোবস্ত করতে দ্বিধা করি নি। আমি ত্রিপোলীর কিছু অঞ্চল পরিদর্শন করার পরে যতোদূর সম্ভব সমগ্র উপনিবেশের উন্নতির জন্য সচেষ্ট থেকেছি। গারিয়ানের অঞ্চলগুলো তো উৎপাদন এবং উর্বরতার দিক থেকে দক্ষিণ ইতালির উর্বর অঞ্চলের সঙ্গে তুলনা করা যায়। সিরেনেসিয়ার উঁচু সমতলভূমি সম্পর্কেও একই কথা বলা যায়। আমাদের পূর্ববর্তী সরকারের দুর্বলতায় সংসদে যে ত্রিভঙ্গ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল, সেটা দূর করার পর গভর্নরদের জাতির এবং ইতালির নাগরিকদের প্রতি উন্নতির দায়িত্ববোধ অনেক বেশি পরিমাণে বেড়ে যায়। অঞ্চলগুলোর অধিবাসীরাও যথেষ্ট আশাবাদী হয়ে পড়ে। অভিবাসীদের ঢল নামে; রাজধানীও সরে আসে। আর শ্রমিকরা আসতে শুরু করে।

এটা সত্যি যে এই উপনিবেশ দু'টো আমাদের ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার সমস্যার সমাধান করতে পারবে না। তবে শুভেচ্ছা এবং টিপিক্যাল ইতালিয়ানদের প্রচেষ্টায় যে উপনিবেশগুলোর সমৃদ্ধি ঘটানো সম্ভব, রোমের অতীতের সঙ্গে তা' খাপ খেয়ে যায়। এবং আমাদের অর্থনৈতিক উন্নতিও এতে যথেষ্ট ত্বরান্বিত করা সম্ভব হয়ে ওঠে।

যুদ্ধের আগে শান্তিপূর্ণ পরিবেশ এবং পরিস্থিতিতে যে শ্রমিকের দল ইতালিকে পুনর্গঠন করেছিল, তারাই আবার কর্তব্যের ডাকে উপনিবেশগুলোর শ্রীবৃদ্ধি ঘটিয়ে জনসংখ্যা সমস্যার সমাধান করবে। বেশ কয়েকদিন যেমন এই ব্যাপার নিয়ে আমি পরিশ্রম করেছি, তেমনি উপনিবেশগুলোর উন্নতির চিন্তা-ভাবনায় বেশ কয়েকটা রাতও বিনিদ্র কাটিয়েছি।

কিন্তু আন্তর্জাতিক এবং উপনিবেশবাদের প্রশ্নে জীবন সরলরেখা গতিতে এগোবে, এটা চিন্তায় আনা যে নিছক-ই বোকামী তা'তে সন্দেহ নেই।

যাইহোক এবার অর্থনৈতিক অবস্থার শোচনীয় এবং নাটকীয় দিকটার দিকে নজর ফেরানো যাক।

আমাদের রাজধানী শহর রোম দখলের ছ'মাস আগে লিবারেল পার্টির এক নেতা সংসদে প্রকাশ্যে বলেছিল যে আমাদের বাজেট ঘাটতির পরিমাণ ছ'বিলিয়ান লিরের ওপরে।

বিরোধী পক্ষ অতিরঞ্জিত করলেও ব্যাপারটা যে শোচনীয় হয়ে উঠেছিল তা'তে সন্দেহ নেই। আমি কিন্তু জানতাম পূর্ববর্তীদের কাছ থেকে উত্তরাধিকার হিসেবে কী সংকট পেয়েছি। আগের শাসকবর্গের ভুল এবং দুর্বলতার মাশুল আমাকেই গুণতে হবে। আর এটা আমি ভালো করেই জানতাম যে এতো বড় ফুটো সর্বস্ব জাহাজ নিয়ে দূরের সমুদ্রে পাড়ী দেওয়া অসম্ভব ব্যাপার। তাই অর্থনৈতিক সমস্যার যতো সত্বর সম্ভব মোকাবিলা করে সমাধান করাটা জরুরী হয়ে পড়ে। বিশেষ করে আমি যখন বিদেশে স্বদেশে ধার নেওয়ার ক্ষমতাকে টেনে ওপরে তুলতে চাই।

তবে অনেক দাবী-ই লাইন ধরে অপেক্ষা করছিল। বাকী পূরণের জন্যও দাবীর সংখ্যা কম ছিল না। প্রেসে লিরে ছেপে ছেপে অবস্থা ইতিমধ্যে এমন এক অবস্থায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে যে লিরের মূল্য-ই অনেক নীচে নেমে গেছে। দায়িত্বজ্ঞানহীন ক্ষতিকারক নীতির জন্যই অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে এই জটিলতার সৃষ্টি হয়েছে। আর এই কারণে শুধু বাজেট ঘাটতি-ই বাড়ে নি, আমাদের জাতির জীবনে যেমন অর্থনৈতিক বিপর্যয় ডেকে এনেছে, তেমনি রাষ্ট্রের প্রশাসনিক ক্ষমতাও কমিয়ে দিয়েছে।

আমার কাছে দাওয়াই বলতে তখন অকারণ ব্যয় ভার কঠোর হাতে রোখা আর যারা ট্রেজারীর দাক্ষিণ্য পেতে অভ্যস্ত তাদের প্রতি কঠিন হওয়া। ট্যাক্স ফাঁকি দেওয়া নাগরিকদের জালে জড়ানো আর প্রশাসনিক ব্যবস্থার প্রতিটি শাখায় সুদৃঢ় হাতে অর্থনীতির লাগাম ধরা ছাড়া আমার সামনে আর কোন পথ খোলা ছিল না। যতো ইচ্ছে মাহিনা বাড়িয়ে যাওয়া চাকরীজীবিদের ক্ষেত্রে লাগাম পরানোও অবশ্য কর্তব্য ছিল। উপরন্তু বিদেশীদের কাছ থেকে নেওয়া ধারের অংকটা যেন সব সময় আমার দিকে জ্বল জ্বল করে তাকিয়ে থাকতো। যদিও আমাদের সম্পদের পরিমাণে সীমাবদ্ধতা ছিল, তবু জ্ঞানবুদ্ধি এবং সততার সঙ্গে চলাটা একান্ত প্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছিল।

তর্ক ছাড়াই বলা চলতে পারে যে ধারের চুক্তি পত্রে একবার যখন স্বাক্ষর করা হয়েছে, তখন রাষ্ট্র বা নাগরিক প্রত্যেকেরই সেই ধার শোধ করা কর্তব্যের মধ্যে পড়ে। যাতে বিদেশী শক্তির কাছে বিশ্বাস ভঙ্গ না হয়।

এই কাজের জন্য আমি একজন যোগ্য লোককে বেছে নেই। ডি ষ্টেফানিকে অর্থমন্ত্রী করি। ডি ষ্টেফানি একজন ফ্যাসিষ্ট এবং রাজনৈতিক অর্থনীতি ব্যবস্থায় ডক্টোরেট্ ছিল।

সে খরচকে লাগামের মধ্যে রাখে, বে-হিসেবী খরচ বন্ধ করে নতুন পথে রাজস্ব আর কর আদায়ের ব্যবস্থা করে। দু'বছরের মধ্যে ঘাটতি পুরিয়ে বাজেটে প্রায় ভারসাম্যতা ফিরিয়ে আনা হয়।

যুদ্ধের সময় থেকে যেসব অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান কাজ করছিল, সেগুলোকে উঠিয়ে দেই। নতুন প্রদেশগুলোর লাল সুতোর বাঁধন দূর করার জন্য আমলাতান্ত্রিক ব্যবস্থার সমাপ্তি রেখা টেনে দেই। কারণ প্রদেশগুলো তখনো পর্যন্ত ঋণের ভারে নুয়ে রয়েছে আর তার ওপর বোঝার মতো এসে চেপেছে যুদ্ধের ক্ষতিপূরণের বিশাল দাবী। আমি বাজারে বণ্ড ছেড়ে যতো সত্বর সম্ভব এই সমস্যার সমাধান করি।

তবে সুকঠিন অর্থনৈতিক ব্যবস্থা নেওয়ার আগে যুদ্ধে আহত হয়ে বিকলাঙ্গ হওয়া মানুষগুলোর প্রতি যথাযথ ব্যবস্থা করি। ওদের জন্য রাষ্ট্রের তরফ থেকেও বিশেষ ব্যবস্থা করি। ওদের জন্য রাষ্ট্রের যে বিশেষ একটা কর্তব্য রয়েছে যুদ্ধে মারা যাওয়া সৈনিকদের স্ত্রী এবং তাদের অনাথ ছেলেমেয়েদের প্রতি, সেটাও আমার স্মরণে ছিল। তাই তাদের ভরণপোষণ ইত্যাদির জন্যও রাষ্ট্র যাতে তাদের প্রতি কর্তব্য পালন করে, সেদিকটাতে ও আমাকে নজর দিতে হয়। যাইহোক নির্দয় ভুলটাকে এইভাবে সংশোধন করে এবং দেশের জন্য যারা রক্ত এবং জীবন উৎসর্গ করেছে, তাদের প্রতি যথাযথ কর্তব্য করার পর যুদ্ধের দরুণ হঠাৎ যারা ফুলে ফেঁপে ধনী হয়েছে, তাদের দিকে নজর দেই। সন্দেহ নেই যে এই ব্যাপারে আমি যথেষ্ট-ই কঠোর ছিলাম। কিন্তু কেন কঠোর হবো না? কারণ যুদ্ধের দৌলতে হঠাৎ ধনী হওয়া লোকগুলোর জন্যই শুধু যুদ্ধে এতোগুলো লোক মারা যায় নি, আহত হয়ে বিকলাঙ্গও কম হয় নি। উপরন্তু অনেকে টাকা-পয়সা সম্পত্তি হারিয়ে যুদ্ধের কারণেই রাস্তার ভিখারী হয়েছিল।

একদিকে যেমন রাষ্ট্রের ওপরে অর্থনীতির স্থবির বোঝাটা কমাতে চেষ্টা করেছি, অপরদিকে তেমনি ব্যক্তিগত উৎপাদন যাতে বাড়ে, সেদিকেও তীক্ষ্ণ নজর রেখেছিলাম। যারা সৎ পথে থেকে পরিশ্রম লভ্য সম্পদ গড়ে তুলেছিল—তাদের প্রতি যেমন সম্মান দেখিয়েছি, তেমনি জীবনের মূল্যবোধটাকেও সবাইকে বোঝাতে চেষ্টা করছি। কারণ এই মূল্যবোধের ক্ষেত্রে টাকাটাই সব নয়, নৈতিকতা এবং বংশ পরম্পরারও একটা স্থান আছে। আর এই ব্যাপারটাকেই দৃঢ় ভিতের ওপরে প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে একদিকে আমাকে কর ব্যবস্থার সংস্কার যেমন করতে হয়েছে, তেমনি উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত সম্পদের ওপর অধিকারও মেনে নিয়েছি।

আমি সবাইকে একটা জিনিষ স্পষ্ট বোঝাতে পেরেছি যে সোশ্যালিষ্ট ধাঁচের কর ব্যবস্থাকে মেনে নেবো না। যৌথ পরিবারের সম্পত্তির ওপরেও কম আঘাত হানি। প্রথমে ব্যাপারটা নিয়ে ভুল বোঝাবুঝি হলেও পরে ইতালির জনগণ তা' মেনে নেয়।

ইতালির জনগণকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করার জন্য সারা পৃথিবী জুড়ে আমাকে যে উৎসাহ এবং শ্রদ্ধা জানানো হয়েছে, সে খবর আমার চেয়ে বেশি বোধহয় কেউ জানে না। প্রাকৃতিক সম্পদ বলতে ইতালির প্রায় কিছুই নেই বললেই হয়। কিন্তু আমাদের দেশের জনসাধারণকে কর ব্যবস্থা বিন্যস্ত করার পর এমনভাবে কর আদায় করা হয়েছে যারজন্য ১৯২৪ সালের শেষে অর্থমন্ত্রী ডি ষ্টেফানি সংসদে বাজেট পেশ করে, যাতে ঘাটতি

হওয়া দূরে থাক ১৯২৫-২৬ সালের শেষে একশো সত্তর মিলিয়ান লিরে উদবৃত্ত দেখানো হয়।

আমার ধারণায় দেশের হাল হকিকৎ ফেরাতে গেলে প্রত্যেক সরকারের উচিত বিবেচনা প্রসূত শক্তিশালী অর্থনৈতিক নীতির প্রণয়ন করা। সুতরাং বর্তমানে বাজেট শক্তিশালী ভিতের ওপর দাঁড়ানোয় ইতালির জনগণের জন্য কর ব্যবস্থাকে আরো সুবিন্যস্ত করা সম্ভব হয়, যাতে যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব অর্থনৈতিক দায়িত্বভার চুকিয়ে ফেলা যায়। ১৯২৫ এবং ১৯২৬ সালে ওয়াশিংটন আর লন্ডনের সঙ্গে যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ সম্পর্কে আলাপ আলোচনা শুরু করি।

এতোদিনে আমরা যেন গর্ত ছেড়ে বেরিয়ে আসি। তবু সরকারের কাজকর্মে কিন্তু এতোটুকুও ঢিলে দেওয়া হয় নি। রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজানোর পর কম্যুউন এবং প্রদেশগুলোর অর্থনৈতিক অবস্থাও পর্যালোচনা করি। বিশেষ করে যেসব শিল্প সংস্থার শেয়ার ষ্টক একস্চেঞ্জের অনুমোদিত ছিল।

জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে যে কোম্পানিগুলোর শেয়ার আমাদের আধুনিক জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে গিয়েছিল, কিন্তু যাদের মূল্যের সঙ্গে বর্তমান লিরের মূল্য মানের কোন সমতা ছিল না বা সোনার মূল্যের অনুপাতে ক্রয় ক্ষমতা ছিল না, সেগুলোকে সঠিক মূল্যমানে নিয়ে আসি।

ইতালির মতো সুধী এবং সৎ দেশে যেখানে অতিরিক্ত ফট্কা হঠাৎ যেমন দ্রুত বেড়ে ওঠে না, তেমনি ষ্টক একস্চেঞ্জের প্রতি কখনো কোন বিশেষ শ্রেণীর পক্ষপাতিত্বও লক্ষ্য করা যায় না। হঠাৎ সেই ষ্টক একস্চেঞ্জে-ই যেন জুয়া খেলার ঝড় বয়ে যায়। স্বাভাবিক ভাবেই বহু লোক ষ্টক একস্চেঞ্জের দেওয়ালে মাথা খুঁড়ে মরে। পৈতৃক সম্পত্তি বিক্রী বাট্টা করে ষ্টক একস্চেঞ্জে জুয়া খেলতে শুরু করে। ফলে একদিকে যেমন স্ক্যাণ্ডাল আরম্ভ হয়, অপরদিকে মানুষ দেউলিয়া হ'তে শুরু করে। কিন্তু তা'তে এই হঠাৎ জুয়ার বন্যায় ভাঁটা পড়ে না। অর্থমন্ত্রী তখন এই ষ্টক একস্চেঞ্জের ক্রিয়া কর্মের একটা সীমা বেঁধে দেয়। কারণ ততোদিনে বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়ার প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। হ্যাঁ, পুরনো দিনের ব্যবস্থা পদ্ধতির বিপরীত স্রোতে-ই হয়তো বা তার দ্বারা হাঁটা হয়েছে। সম্ভবত হঠাৎ-ই এই ব্যবস্থাগুলো নেওয়া হয়েছে, যা কেউ আশা করতে পারে নি। এর দ্বারা মধ্যবিত্ত এবং ধনী সম্প্রদায়ের বিরোধীতার মুখোমুখি হ'তে হয়, যাতে বাজারে অশান্তির আগুন দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়ে।

আমি কিন্তু এই ঘটনা প্রবাহগুলোকে সতর্কভাবে নজরে রেখেছিলাম। হঠাৎ ওঠা এই বিরুদ্ধতার ঢেউয়ের পেছনের কারণগুলো ছিল অর্থনৈতিক; রাজনৈতিক নয়। ব্যাপারটা বিপদজনক হয়ে উঠলেও সবচেয়ে জরুরী ক্ষেত্রে আমাকে অনেক অভিজ্ঞতা এনে দেয়। অর্থনৈতিক এই দিকটার চুলচেরা বিশ্লেষণে বসি আমি। যারা এই অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে আক্রমণ করেছিল, তাদের প্রতি আক্রমণ করে বাগে আনি। আরো বিবেচনা প্রসূত নীতির রূপ দিতে শুরু করি। তবে সেইসব নীতির মাধ্যমে জুয়ারীরা যাতে এতোটুকু সুযোগ সুবিধা না পায়, সেদিকটাতেও তীক্ষ্ণ নজর রাখি। কিছুদিন পরে ডি ষ্টেফানি পদত্যাগ করে।

ভোলপি অর্থমন্ত্রী হয়। ইতিমধ্যে প্রথম অসুবিধাগুলোকে দূরে সরিয়ে দিয়ে যুদ্ধের ক্ষতিপূরণের দিকে আমি মনযোগ দেই। যুদ্ধের ক্ষতিপূরণের অংকটাকে যতোটা নীচে টেনে নামানো যায় তা' নিয়ে ইংল্যাণ্ড এবং আমেরিকার সঙ্গে চুক্তি করার প্রয়োজন হয়ে পড়ে। এই ব্যাপার নিয়ে আলোচনার জন্য ওয়াশিংটনে একটা প্রতিনিধি দল পাঠাই; এই প্রতিনিধি দলের নেতা হিসেবে নির্বাচিত করি কাউন্ট ভোলপি এবং বিদেশ মন্ত্রকের আণ্ডার সেক্রেটারি গ্র্যানডিকে। প্রতিনিধি দল যে যথেষ্ট বিচক্ষণতার সঙ্গে ব্যাপারটার মোকাবিলা করে তা'তে সন্দেহ নেই। আমরা চুক্তিটাকে এমন একটা জায়গায় নিয়ে আসি যাতে আমেরিকার জনসাধারণও খুশী হয় এবং ইতালির নাগরিকদেরও সম্পূর্ণ স্বার্থ রক্ষা করা যায়।

১৯২৬ সালের ২৭শে জানুয়ারী প্রায় একই ধরনের চুক্তিপত্রকে সামান্য অদল বদল করে ইংল্যাণ্ডের সঙ্গে ক্ষতিপূরণের ব্যাপারে একটা বোঝাপড়ায় আসি। চুক্তিপত্রে বদলের প্রয়োজন পড়ে কারণ ইংল্যাণ্ডের সঙ্গে আমাদের সম্পর্কটা ঠিক আমেরিকার মতো ছিল না। আমেরিকা এবং ইংল্যাণ্ড সেই কিছুটা রদ বদল করা চুক্তি অনুমোদন করে। বলাবাহুল্য আমাদের অনুমোদনেও সময় লাগে না। ব্যাপারটাতে আমরা গর্ববোধও করি; কারণ ব্যক্তিগত এবং সমষ্টিগত ভাবে দেওয়া বিশ্বাস রক্ষা করাটা একদিকে যেমন জাতীয় কর্তব্য, তেমনি দায়িত্বও বটে।

তারপরেই জনসাধারণ যেন দেশপ্রেমের জাতীয় বন্যায় স্বতঃস্ফূর্তভাবে মাতোয়ারা হয়ে পড়ে। রাষ্ট্রের সাহায্য ছাড়াই জনসাধারণের বদান্যতায় আমেরিকাকে যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ বাবদ আমরা প্রথম কিস্তি শোধ করি।

আমার বিশ্বাস ছিল যে বাজেটের ঘাটতি পূরণ করতে পারলে আর ইংল্যাণ্ড আমেরিকার সঙ্গে চুক্তি বদ্ধ হলে আমাদের শিল্প এবং ব্যাংক ব্যবসায়ে যে মন্দা চলছে, তা'তে জোয়ার আসবে। আর তার ফলে ইতালির মুদ্রার অবমূল্যায়ন কেটে গিয়ে মূল্যমানও উঁচুতে উঠবে। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক বাজারে ঋণ পাওয়ার সুবিধা তা'তে অনেক পরিমাণে বেড়ে যাবে।

দুর্ভাগ্যবশত যেগুলোকে আমি সঠিক কার্যকারণের পন্থা বলে ভেবেছিলাম সেগুলো ঠিক কার্যকরী হয় না। ১৯২৬ সালের প্রথম ছ'মাস পাউণ্ডের মূল্যমানে গড় পড়তা দশ পয়েন্ট হারিয়ে ছিলাম। পাউণ্ড স্টারলিং এমন ভাবে উঁচুমানের বৈদেশিক মুদ্রা গুলোর আশেপাশে ঘোরাফেরা করছিল যে আমি যখন ভেবেছি ইতালির মুদ্রার মান ওপরের দিকে উঠবে, বাস্তবে কিন্তু দ্রুতগতিতে তখন ইতালির মুদ্রার অবমূল্যায়ন ঘটে চলেছে। ব্যক্তিগত অর্থনৈতিক জীবন তাই তখন বিপর্যস্ত। মুদ্রামান তখন শুধু অস্থির-ই নয়, ক্রমাগত ওঠা নামাও চলেছে। মুদ্রাস্ফীতির ধাক্কা উত্তর ইতালির শিল্পাঞ্চল গুলোতেও এসে লাগে। কিছু শিল্পের অর্থনৈতিক অবস্থা তো সঙ্গীন হয়ে ওঠে। ফলে মধ্যবিত্ত জনগণ যারা মোটা টাকা সঞ্চয় করেছিল, তাদের মধ্যেও যথেষ্ট অসন্তোষ দেখা দেয়।

এই মর্জিমাফিক চলা অর্থনীতিকে কিছুটা সাহায্য দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করি। শৃঙ্খলা-পরায়ণ, শান্তরাষ্ট্র—যেখানে জনসাধারণের প্রতিবাদের কণ্ঠস্বর শোনা যায় না,

কাজও করে চলেছে প্রচণ্ড ধৈর্যের সঙ্গে পুরো দায়িত্ব নিজেদের কাঁধে তুলে নিয়ে, সেই পরিস্থিতিতে অর্থনীতির এই টাল মাটাল অবস্থাটাকে ঠিক মেনে নেওয়া যায় না। লিরের অবমূল্যায়নের সুযোগ নিয়ে কতোগুলো কুমীর আর পরগাছা টাকার পাহাড় গড়ে তুলবে, তাকে যে করেই হোক রোধ করা দরকার। তাতে যদি দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা দেউলিয়াতে গিয়ে দাঁড়ায়, দাঁড়াক। কারণ এই টাকার কুমীরদের চেষ্টা হলো ব্যক্তিগত ভাবে যে ঋণ তারা নিয়েছে, তা' ফেরত না দেওয়া। অর্থাৎ ব্যাংকে যারা টাকা জমা রেখেছে তাদের প্রতি এতোটুকুও কৃতজ্ঞতা নেই ওদের। নাগরিক হওয়ার যোগ্য নয় যেসব লোক, তারাই আজ ইতালির জনগণের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করছে। ব্যাপারটা যে সাংঘাতিক তা'তে সন্দেহ নেই। নৈতিকতা বিরোধীও বটে। কারণ ধ্বংস হয়ে যাওয়া লোকগুলো কি আবার ঋণগ্রস্ত একটা রাজ্যে জন্মগ্রহণ করবে!

আমি দীর্ঘসময় ধরে রাষ্ট্রের, সমাজের এবং ব্যক্তিগত জীবনের এই অর্থনৈতিক জটিলতা নিয়ে চিন্তা ভাবনা করেছি। নিজেদের এবং বিচক্ষণ দেশের অর্থনীতির তুলনাও কম করি নি। বাণিজ্যিক হিসেব নিকেশের অংকগুলোও খতিয়ে দেখেছি। ইতিবাচক বিচার করার জন্য যা যা দরকার, সবই আমার হাতে ছিল। সুতরাং ইতালির অর্থনীতি সম্পর্কে স্বচ্ছ ভাষায় চূড়ান্ত মতামত প্রকাশ করতে তখন তার বাধা কোথায়।

যাইহোক ১৯২৬ সালের আগস্ট মাসে মধ্য ইতালির ছবির মতো সুন্দর শহর পেসারোর স্কোয়ারে আমি ইতালির বর্তমান অর্থনীতি সম্পর্কে আমার বক্তব্য রাখি। যে বক্তৃতা পরে বিখ্যাত হয়। আর এই বক্তৃতার পর থেকে ইতালির লিরে মূল্যমানের দিক থেকে ওপরে উঠতে থাকে। আমরা সোনাকে মুদ্রামান সূচক হিসেবে বেছে নেই।

আমি বেশ কিছুদিন ধরেই ভাবছিলাম যে ইতালির জনসাধারণকে অকপটে সবকিছু বলা উচিত। আমাদের বৈদেশিক ঋণের ব্যাপারে বিদেশী মুদ্রার ঘাটতি-ই হলো সবচেয়ে বড় দুর্বলতা। প্রতিদিনের অস্থিরতা, লোভী একদলের অধীনে থাকার জন্য অর্থনৈতিক অবস্থা এতো বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। এরাই আড়ালে বসে সমস্ত ব্যাপারটার কলকাঠি নাড়ছে। শেষে বাধ্য হয়ে আমাকে এই ফটকাবাজদের দেওয়ালে চেপে ধরতে হয়। সমাজের যে অংশটা সমস্ত জাতিকে দেউলিয়ার দিকে নিয়ে চলেছে, তাদের শুধু মুখোমুখি-ই হই না, পরাজিতও করি। সমাজের সেই বিশেষ অংশের কার্যকলাপকে কোনরকমেই সরকার উপেক্ষা করতে পারে না। কারণ এই ঘটনা প্রবাহগুলো শুধু ইতালি জাতির ভবিষ্যত-ই অন্ধকারাচ্ছন্ন করবে না, জাতীয় পতাকাকেও টেনে নামিয়ে লাঞ্ছিত করবে। এমন কি বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে নিজেদের মুদ্রার সবল অবস্থা জাতীয় পতাকার মর্যাদা অনেক উঁচুতে তুলে ধরে। যে কারণে সমস্ত শক্তি দিয়ে জাতীয় মুদ্রার এই অবমূল্যায়ন রোধ করার প্রয়োজন। যখন জাতির দেশপ্রেম, সম্মান ইত্যাদি ধুলোয় লুটিয়ে পড়ার সম্ভাবনা, তখন আর অজ্ঞতার দোহাই দেওয়া চলে না।

ফ্যাসিবাদ যা নাকি জাতির জীবনে শৃঙ্খলাবোধ নিয়ে এসেছিল, তাদের আবার এইসব ফটকাবাজদের বিরুদ্ধে দৃঢ় হাতে হাল ধরতে হয়। কারণ এইসব ফটকাবাজদের কার্যকলাপের দরুণ-ই আমাদের মুদ্রামানের ক্রমাগত অবমূল্যায়ন হয়ে চলেছে। রাজনৈতিক

ক্ষেত্রে ফ্যাসিবাদের জয় লাভ হলেও এই অর্থনৈতিক ব্যাপারগুলোর দৃঢ় হাতে মোকাবিলা করতে না পারলে যে পরাজয় অবশ্যম্ভাবী তা'তে সন্দেহ নেই।

ইতালির বিরুদ্ধে এই ষড়যন্ত্রে শুধু আন্তর্জাতিক ফ্যাসিবাদ বিরোধীরাই যোগ দেয় নি, দেশের ভেতরের শত্রুরাও এই ব্যাপারে যথেষ্ট সক্রিয় ছিল। এই সমস্যার গভীরে শুধু অসততা নয়, সৎ ইচ্ছাও ছিল না। সুতরাং এই ব্যাপারটার ওপরেও আমাকে আবার বক্তব্য রাখতে হয়। সেই বক্তব্যের কিছুটা অংশ হলো ঃ

আমি যদি রাজনৈতিক ব্যাপারটাকে খোলসা করে বলি, তবে বোধহয় আশ্চর্যের হবে না। এটাই কিন্তু প্রথমবার নয়, যখন জনসাধারণের কাছে সোজাসুজি বক্তব্য রেখেছি। কোনরকম সরকারী তকমার আড়ালে ঢেকে নেয়। সহজ সাধারণ একজন নাগরিক হিসেবে আমার বক্তব্যকে পেশ করেছি। আমাকে সবারই বিশ্বাস করা উচিত, বিশেষ করে আমার নজরের ওপর নজর রেখে, আমার হৃদস্পন্দন শুনে। তোমাদের সামনা-সামনি কথা বললেও সমগ্র ইতালি জাতির উদ্দেশ্যে কিন্তু আমার এই ভাষণ। এবং বিশ্বাস করি যে আল্পস্ এবং মহাসমুদ্র পেরিয়ে আমার এই বক্তব্য দূর দিগন্তে ছড়িয়ে পড়বে। আমি স্পষ্ট করে তোমাদের সামনে বলতে চাই যে শেষ নিঃশ্বাস নেওয়া পর্যন্ত লিরের এই অবমূল্যায়ন বোধের প্রচেষ্টা আমি চালিয়ে যাবো। চমৎকার ইতালির জাতি গত চার বছর ধরে পরম শৃঙ্খলতার সঙ্গে আমার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে, যারা আরো সুকঠোর আত্মোত্যাগের জন্য প্রস্তুত, তাদের কিছুতেই মর্যাদা হারিয়ে দেউলিয়া অবস্থার মধ্যে ছুঁড়ে ফেলে দিতে দেবো না।

অর্থনৈতিক বিরোধী গোষ্ঠী ইতালিকে দমবন্ধ করে মারার যে গোপন ষড়যন্ত্র করেছে, যে কোন মূল্যে ফ্যাসিষ্ট সরকার সেই ষড়যন্ত্রকে ব্যর্থ করে দেবে। দেশের মধ্যে যখন এই ষড়যন্ত্রীদের প্রকাশ্যে চেনা যাবে, তখন তাদের পুরোপুরি ধ্বংস করে দেবো। লিরে হলো আমাদের অর্থনৈতিক জীবনের প্রতীক; আমাদের সুদীর্ঘ জীবনধারা এবং উন্নতির জন্য ধরা ধৈর্যের চিহ্ন—সুতরাং যে কোন মূল্যে আমাদের তা' রক্ষা করতেই হবে। যখন কর্মক্লান্ত লোকগুলোর মাঝে গিয়ে দাঁড়াই, তখন তাদের আবেগকে উপলব্ধী করি, আশাকে ছুঁই আর জীবনের কঠিন ধাপ বেয়ে ওপরে ওঠার ইচ্ছেটাকেই যেন প্রত্যক্ষ করি।

ইতালির জনগণ এবং কালো সার্টের দল—আমি আমার বক্তব্যের সবচেয়ে প্রয়োজনীয় অংশ ইতিমধ্যে তোমাদের সামনে রেখেছি—যা অনিশ্চয়তার কুয়াসাকে ছিন্ন ভিন্ন করে দেবে এবং আমাদের পরাজিত করার প্রচেষ্টার কালো মেঘের টুক্‌রোটাকে উড়িয়ে দেবে।

আমার বলা কথাগুলো নিশ্চয়ই বিদেশী টাকার বাজারের ফটকাবাজদের কাছে চাবুকের আঘাত হানবে। বড় বড় অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলো বুঝেছে যে সরকারের অজ্ঞতসারে কোনরকম নিজেদের ব্যক্তিগত অর্থনৈতিক নীতি চালিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। ফটকাবাজরা বুঝতে পেরেছে যে তারা ফাঁদে আটকা পড়েছে।

অপরদিকে আমি শুধু নিজেকে কতোগুলো কথার জালে নিবদ্ধ রাখতে চাই নি। ১লা সেপ্টেম্বরের মন্ত্রী পরিষদে এমন কতোগুলো ব্যবস্থা গ্রহণ করি যাতে আমার অর্থনৈতিক নীতিকে সফল রূপায়ণ করা সম্ভব হয়। ব্যবস্থাগুলো হল ঃ নব্বই মিলিয়িান ডলার মর্গান

ঋণকে ব্যাংক অফ ইতালিতে জমা দেওয়া; ব্যাংক অফ ইতালির সঙ্গে রাষ্ট্রের হিসেব নিকেশ চূড়ান্ত করা। সরকারী খাতে প্রচলিত মুদ্রা থেকে দুই বিলিয়ান এবং পাঁচশো মিলিয়ান লিরে প্রচলন থেকে সরিয়ে দিয়ে বন্ধ করে দেওয়া। কনজারজিয়ো ভালোরীর স্বায়ত্ত শাসন বিভাগকে চিরতরে বন্ধ করে দেওয়ার ব্যবস্থা করা।

এইসব ব্যবস্থা নেওয়া ছাড়াও কিছু কর মুকুব করে দিয়ে পুরো কর ব্যবস্থাকে সহজ সরল করে দেই। কিন্তু মিতব্যয়িতা এবং ব্যাকিং সার্ভিসের উন্নতির জন্য কিছু রক্ষা কবচের ব্যবস্থাও নিতে হয়।

নভেম্বরে সরকারী ঋণপত্র বাজারে ছাড়া হয়। এই ঋণপত্রের নাম ছিল লিটোরিও। এই ঋণপত্র বাজারে ছাড়ার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল নগদ টাকার আমদানির দরুণ বাজেটে যেন কিছুটা আল্‌গা দেওয়া যায়। যেহেতু ভাসমান ঋণের বোঝা বাজারে ভারী হয়েছে, বিশেষ করে ট্রেজারী বণ্ডের দৌলতে, তাই বণ্ডগুলোকে ক্রয় করে ঋণটাকে নথিভুক্ত করে রাখার আদেশ দেই। ব্যবস্থাটায় ঋণের দায় থেকে রাষ্ট্র অব্যহতি পেলেও লোকের পক্ষে যে কঠিন ছিল তা'তে সন্দেহ নেই। তবে জনগণ কিন্তু নিজেদের স্বার্থে এই ব্যবস্থাকে হাসিমুখেই মেনে নিয়েছিল।

তবে দুর্দিন কেটে গেলে আমরা অত্যন্ত বিচার বিবেচনার সঙ্গে সম্পূর্ণ ব্যবস্থাটাকে খতিয়ে দেখি। লিরের অর্থনৈতিক মূল্য লন্ডন এবং ওয়াশিংটনের বাজারে ক্রমে ক্রমে চড়তে শুরু করে; আর সারা পৃথিবীতে আমাদের ঋণ নেওয়ার ক্ষমতা অনেক বেড়ে যায়।

টলমলে অর্থনৈতিক অবস্থা থেকে সুকঠোর এই ব্যবস্থায় পৌঁছতে, যা আমি পেসারেতে আমার বক্তব্যে রেখেছিলাম, কম কষ্ট হয় নি। অনেক সময়েই ব্যর্থ হয়েছি; ভীষণ ক্ষতিও স্বীকার করে নিতে হয়েছে। পুরো ব্যবস্থাটা নিতে যখন শুরু করেছিলাম, তখন একশো তিরিশ লিরেতে এক পাউণ্ড হ'তো। পরে তা' নব্বই লিরেতে দাঁড়ায়। তবে পুরো ব্যবস্থাটায় সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয় টাকার দিক থেকে যারা দুর্বল এবং অর্থনৈতিক ভাবে যাদের কোমরের জোর নেই।

যে পাথর ছড়ানো রাস্তায় অর্থনৈতিক মর্যাদা ফিরে পেতে এবং সহজ পথে পৌঁছতে হয়েছে, তা' স্মরণে রাখার যোগ্য। মুদ্রাস্ফীতি খুব সোজা ব্যাপার; কিন্তু অর্থনৈতিক পুনর্গঠন অত্যন্ত কষ্টকর। তারজন্য বাজেটে ধরা অংকটাকে যেমন কমাতে হয়, তেমনি রাষ্ট্রের তরফ থেকে বণ্ড ছাড়ার ব্যবস্থাটাকে সহজ সরল করতে হয়েছে। ঋণের বোঝাটাকে সম্যক বোঝার জন্য একদিকে যেমন ঋণের অংকটাকে বিকেন্দ্রীকরণ করেছি, তেমনি সঠিক হিসেবের মাধ্যমে কতো সুদ প্রতি বছর শোধ দিতে হবে—সেটাকেও জানতে হয়েছে।

এইসব ব্যবস্থা নেওয়ার ফলে ইতালির অর্থনৈতিক অবস্থা অনেক স্বচ্ছ এবং সহজ হয়ে আসে। যারফলে প্রাণবন্ত একটা অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা যায়। যাদের কাগজের নোটের মাধ্যমে লেনদেন, সেই সব প্রতিষ্ঠানগুলোকে একত্রিকরণের ব্যবস্থা করি। একমাত্র ব্যাংক অফ ইতালির কাগজের নোটের লেনদেনের ক্ষমতা ছিল। ব্যাংক অফ নেপেলস্

আর ব্যাংক অফ সিসিলিকে বলা হয় দক্ষিণ ইতালির কৃষি কাজের অর্থনৈতিক দায়িত্ব নিতে। যাতে চাষের কাজ আগের চেয়ে অনেক বেশি তেজীতে বাড়তে পারে।

একবছর কষ্ট করার পর ইতালির অর্থনৈতিক অবস্থা ভালো হয়ে বাজেটের ভারসাম্য ফিরে এলে ১৯২৭ সালে লিরের মূল্যমান সোনার নিরিখে ঠিক করা হয়। সেই বছরের ডিসেম্বর মাসে মন্ত্রী পরিষদকে জানাই যে লিরের মূল্যমান সোনার নিরিখে করা সম্ভব হয়েছে, যা অর্থনৈতিক পণ্ডিতদের অভিমতে যথেষ্ট শক্ত ভিতের ওপর এসে দাঁড়িয়েছে।

বিজয়ী হওয়ার গর্ব অনুভব করি। কালো সার্ট আর রাজনৈতিক শক্তিকেই শুধু নেতৃত্ব দেই নি, অর্থনীতির মতো কঠিন এবং জটিল ব্যবস্থাকে তার যোগ্য জায়গায় এনে দাঁড় করিয়ে অনেকের মুখ বন্ধের ব্যবস্থাও করতে পেরেছি। একমাত্র নিটোল অর্থনৈতিক জ্ঞানের দ্বারাই বেশি সংখ্যক লোকের উপকার করা সম্ভব হয়েছে।

আজ ইতালির বাজেট তার ভারসাম্য ফিরে পেয়েছে, কলকারখানা আর কমিউনগুলোও প্রদেশে প্রদেশে আয়ব্যয়ের সমতা ফিরিয়ে এনেছে। আমদানী-রপ্তানি ব্যবসা তার হারিয়ে যাওয়া ছন্দ ফিরে পেয়েছে; লিরের মূল্যমান এক জায়গায় এসে স্থির হয়ে দাঁড়িয়েছে। নিশ্চয়তা এবং পরস্পরের সহযোগীতার দ্বারা ফ্যাসিষ্ট সরকার নতুন এক ইতালি গড়ে তোলার পথে অনেক দূর এগিয়ে গেছে। সুতরাং সাধারণ নীতিগুলো এবং রাষ্ট্রের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানগুলো পরস্পরের সহযোগীতার দ্বারা এগিয়ে যেতে পেরেছে।

।। ফ্যাসিষ্ট রাষ্ট্র এবং ভবিষ্যত্ ।।

নতুন প্রথা এবং বিচার ব্যবস্থার মাধ্যমে এক বিশেষ ধরনের ফ্যাসিষ্ট সভ্যতার আরম্ভ হয়। সারা পৃথিবী এই ফ্যাসিষ্ট সভ্যতার দিকে আগ্রহ নিয়ে তাকিয়ে থাকে। বিশেষ করে পরস্পর বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানগুলোর সহযোগীতায় গড়া এই রাষ্ট্রকে নিয়ে পৃথিবীর অন্যান্য দেশের কৌতূহলের সীমা পরিসীমা ছিল না।

এই ধরনের রাষ্ট্র গড়ার আলোচনার আগে দীর্ঘদিনের প্রতীক্ষা, চুলচেরা গবেষণা, বিচার বিশ্লেষণ ইত্যাদির ব্যাপারে কিছু বলাটা সঙ্গত হবে। কারণ এই অভিজ্ঞতায় পৌছতে গিয়ে যে সব শিক্ষার স্তর পেরোতে হয়েছে, তার মূল্য অসীম।

বাস্তব অবস্থাই ছিল এই রাষ্ট্রকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার নাবিক; প্রথমত মনে রাখা উচিত যে সমবায় রাষ্ট্র শুধু প্রতিষ্ঠানগুলোকে সীমাবদ্ধ করে রাখার জন্য সৃষ্টি হয় নি। আমার মতে ইতালির প্রয়োজনেই এই রাষ্ট্র ব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল। বিশেষ করে যেখানে অর্থনৈতিক সীমাবদ্ধতা রয়েছে; কাজ আর উৎপাদনশীলতা, অভিজ্ঞতা আর সময়ের সঙ্গে তাল রেখে যেখানে এগোতে পারে নি, সেখানে সমবায় রাষ্ট্র গড়াটাই উচিত কাজ। বর্তমান শতাব্দীর অর্ধ ভাগ জুড়ে ইতালি শাসিত হয়েছে রাজনৈতিক দলগুলোর একত্রিত রেঁনেসার মাধ্যমে, যার মধ্যে শ্রেণী বিভাগ থাকায় একদল আরেক দলের শাসন-প্রভুত্বকে খর্ব করার

চেষ্টায় সব সময় মেতে থাকতো; তার ওপরে মাটির নীচের সম্পদের অপ্রতুলতা ইত্যাদি কারণগুলোও ইতালিকে অভিজ্ঞতা সমৃদ্ধ এবং সময়ের সঙ্গে তাল রেখে এগিয়ে যেতে দেয় নি।

মধ্যবিত্ত শ্রেণী ছাড়াও আর একটা শ্রেণী বর্তমান ছিল; বোঝার সুবিধার জন্য তাদের প্রলেতেরিয়ান-ই বলবো। ওরা সোশ্যালিষ্ট এবং অ্যানার্কিষ্টদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে শেষ-না-হওয়া সংগ্রাম চালিয়ে গেছে। হ্যাঁ, মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বিরুদ্ধে।

প্রত্যেক বছর পালা করে সর্বাত্মক ধর্মঘট, প্রতি বছর উর্বর ভূমি পো উপত্যকায় নিয়মিত বিক্ষোভ ইত্যাদির জন্য ফসল এবং কারখানার উৎপাদনশীলতা প্রচণ্ডভাবে মার খেতো।

ছন্দবদ্ধ জীবন বলতে যা বোঝায়, যেটা পিতৃভূমির প্রতিটি নাগরিকের কর্তব্য হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু তা' না হয়ে পরস্পর দুরারোগ্য ব্যাধির মতো সংগ্রাম লেগেই থাকতো। বিশেষ করে এই বিক্ষোভ আন্দোলনের ডিম পেশাদারী সোশ্যালিষ্টরাই প্রসব করতো। আর এই পেশাদার সোশ্যালিষ্ট এবং সিণ্ডিক্যালিষ্ট অর্গানাইজরা সদা সর্বদা মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে কব্‌জা করার জন্য সংগ্রামে লিপ্ত থাকতো। নাগরিক জীবন উন্নততর জীবনযাত্রার দিকে ধাবিত করার জন্য একটা পদক্ষেপও নিতে পারতো না।

আমাদের মতো দেশ, যার মাটির তলায় সম্পদ বলতে তেমন কিছু নেই, অর্ধেক দেশ জুড়ে শুধু দাঁড়িয়ে আছে পাহাড়-পর্বত—সেই দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা কিছুতেই ভালো হ'তে পারে না। যারজন্য নাগরিকরা একমুঠো সুযোগ সুবিধার নিমিত্ত নিজেদের মধ্যে ঝগড়াঝাঁটি শুরু করে দেয়। পরস্পরকে টেনে নীচে নামিয়ে লাঞ্ছিত বঞ্চিত করার এই প্রচেষ্টার দরুণ আধুনিক জীবনে প্রবেশের যে ছন্দবদ্ধতার প্রয়োজন, তা'ও ওদের মধ্য থাকে না। প্রতি বছর এবং প্রত্যেক ঋতুতে উদারপন্থী গণতান্ত্রিক দেশ যদি নিজেদের মধ্যে রেষারেষি করে চলে, শ্লোগান তোলে ঃ প্রতিক্রিয়া বা প্রতি বিপ্লব নয়—তবে স্বীকার করে নেওয়া ভালো যে এই শ্লোগানের বাক্যটার কোন অর্থ নেই।

ইতর প্রাণীদের মতো প্রতিদ্বন্দ্বী শ্রেণীর পরস্পরের প্রতি ঘৃণা এবং বিদ্বেষের ভাব ছাড়িয়ে ওপরে ওঠার প্রয়োজন। বিশেষ করে যুদ্ধের পরে লেলিনের দৌলতে গুপ্ত প্রচারের জন্য এই নোংরা ব্যাপারটা চরমে গিয়ে পৌঁছেছে। সাধারণত বিক্ষোভ এবং ধর্মঘট গিয়ে শেষ হয় মারামারিতে; ফলাফল হলো কিছু সংখ্যক আহত আর নিহত মানুষ। লোকেরা মালিকের প্রতি বুক ভরা ঘৃণা নিয়ে কাজে যায়। ভালো বা খারাপ বিচার বোধটাই তখন হারিয়ে ফেলে। পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মধ্যবিত্তিক সমাজের ঠিক এই ধরনের দুরাবস্থা ছিল না।

কৃষক এবং শিল্পের মধ্যে সব সময় একটা টানা পোড়ানির সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল। ফাঁপা অসার রাজনৈতিক বক্তৃতা—সর্বস্ব ছিল আমাদের জীবন। ধৈর্য বলতে কারোর কিছু ছিল না। কিন্তু ভাবসাব দেখাতো সব বোদ্ধার—যা জনতার মধ্যে শুধু হিংসা-ই ছড়াতো। কিন্তু হিংসাশ্রয়ী ঘটনার পরে নতুন পরিস্থিতির উৎপত্তি হ'তো, তা'তে পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষ এবং সংঘর্ষ আগের চেয়ে অনেক বেশি বেড়ে যেতো।

আমার মতে এমন একটা রাজনৈতিক বাতাবরণ তৈরি করার প্রয়োজন যাতে সরকার নির্ভয়ে কাজ করতে পারে; সত্য অপ্রিয় হলেও বলার সাহস রাখে এবং সত্যটাকে স্বীকার করে নিতে পারে। তবে এসব-ই সম্ভব যদি সেই সরকার নিষ্ঠার সঙ্গে তাদের কর্তব্য পালন করে থাকে। উদারপন্থী এবং গণতন্ত্র ব্যাপারটা হলো দুধ আর জলের মধ্যে বিপরীত মতবাদ। তারা তাদের সমস্ত উৎসাহ সংসদ ভবনেই তর্ক-বিতর্কের মাঝে উজাড় করে দেয়। আর রাষ্ট্রের কর্মচারী, রেল এবং পোষ্ট অফিসের কর্মী আর সমাজবিরোধী কিছুলোকের মধ্যে এই তর্ক-বিতর্ক বিক্ষোভের ঢেউয়ের সৃষ্টি করে। রাষ্ট্রের কাজ ছিল শুধু মরা বেড়াল ছানার মতো মৃতদেহ গুলোর সৎকার করা। এই পরিস্থিতিতে দয়া বা ধৈর্য দেখানো যে অপরাধ তা'তে সন্দেহ নেই। উদারপন্থা এবং গণতন্ত্র ইতালির জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে তাদের কর্তব্য পালনে ব্যর্থ হয়েছে। হ্যাঁ, ফ্যাসিজিম পেরেছে সেই কর্তব্যের ধ্বজা উঁচুতে তুলে ধরে রাখতে।

সত্যি বলতে কি পাঁচ বছরের ছন্দোময় শৃঙ্খলাবদ্ধ কার্যকলাপ অর্থনৈতিক জীবনে যেন নতুন প্রাণের সঞ্চয় করেছে এবং তারফলে ইতালির রাজনৈতিক আর নৈতিক জীবনযাত্রায়ও অনেক পরিবর্তন এসেছে। প্রসঙ্গত একথা বলা বোধহয় অসঙ্গত হবে না যে এই শৃঙ্খলা জোর করে ওপর থেকে চাপিয়ে দেওয়া হয় নি অথবা এটা আগে থেকে চিন্তাভাবনার ফসলও নয়। কোন বিশেষ শ্রেণীর স্বার্থ রক্ষার জন্যও এই ব্যবস্থা নেওয়া হয় নি। আমাদের শৃঙ্খলাবোধের একটাই দূরদৃষ্টি ছিল, যার সমাপ্তিও একটা বিন্দুতে—তা' হলো ইতালি জাতির সর্বাঙ্গীন মঙ্গল এবং সুনাম বৃদ্ধি।

যে সুশৃঙ্খলবোধ আমি ইতালির জনগণের ওপরে চাপিয়ে দিয়েছিলাম, সেই শৃঙ্খলা ছিল আলোয় উদ্‌ভাসিত। ভদ্র এবং বিনয়ী শ্রেণী সম্ভবত সংখ্যার দিক থেকে তারাই সবচেয়ে বেশি ছিল, অত্যন্ত উদ্বিগ্নতার সঙ্গে জীবনের দিনগুলো পাড়ী দিচ্ছিলো। ওরাই কিন্তু দায়িত্ব সচেতন আমার মতো নেতার হৃদয়ের হৃদয়ের কাছাকাছি এসে দাঁড়িয়েছিল। আমি গ্রামাঞ্চলের লোকেদের ট্রেঞ্চে বসে যুদ্ধ করতে দেখেছি আর ভেবেছি মূর্খদের হাতে পড়ে মানসিক এবং দৈহিক স্বাস্থ্যবান লোকগুলোর কি দুর্দশা হ'তে পারে। অপরদিকে শিল্পাঞ্চলের শ্রমিকরা এতো ভদ্র, সজীব এবং প্রতিরোধ প্রবণ যে ওদের কথা ভাবতে গেলেও গর্বে বুক ফুলে ওঠে। আর এই গর্বিত মানুষটারই তাদের শাসন করা এবং নেতৃত্ব দেওয়া উচিত। শহর ছাড়াও গ্রামাঞ্চলের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকেরা তাদের সুনামের চেয়েও অনেক বেশি উঁচুদরের মানুষ। শুধু অর্থনৈতিক বৈষম্য-ই আমাদের সমস্ত সমস্যার মূল কারণ। যারজন্য জাতীয় স্তরেও জাতির উন্নতি পায়ে পায়ে হোঁচট খায়। তবে বলাবাহুল্য ইতালির জনগণের কোন শ্রেণী-ই রক্তচোষা শয়তান শ্রেণীর মধ্যে পড়ে না। তথাকথিত সোশ্যালিষ্ট জননায়করাই মিথ্যে ওদের নামে রক্তচোষা শয়তান বলে প্রচার করতো।

যখন এই বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে সত্য এবং স্বার্থের সংঘাত বাঁধে, রাষ্ট্র কখনো সেইসময় অজ্ঞেয়বাদী হিসেবে নিশ্চুপে দর্শকের ভূমিকা পালন করতে পারে না। তারফলে শুধুমাত্র সংঘর্ষ-ই যে বন্ধ হয় তা' নয়, সংঘর্ষের উৎপত্তিস্থল এবং কারণগুলোও জানা যেতে পারে।

সংখ্যাতত্ত্বের এবং বিজ্ঞ ব্যক্তিদের সাহায্যে এখন সহজেই বোঝা যায় আগামী কালের অশান্তির পেছনে কি কি কারণ থাকতে পারে। ইতিমধ্যে সরকার এবং স্থানীয় শিক্ষিত ব্যক্তিগোষ্ঠীর সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে ভবিষ্যতের উৎপাদনমুখী নিখুঁত পরিকল্পনা রচনার কাজও অনেক সহজ সরল হয়ে গেছে।

আমি সব সময় মনপ্রাণ দিয়ে চেয়েছি যে ফ্যাসিষ্ট সরকার সামাজিক অনুশাসনগুলো এমন ভাবে সতর্কতার সঙ্গে পালন করুক যাতে আন্তর্জাতিক পরিকল্পনা অনুযায়ী দেশের বর্তমান শিল্পের অবস্থার যেমন উন্নতি করা যায়, ভবিষ্যত শিল্পেরও তেমনি সুষ্ঠ পরিকল্পনা ছকা সম্ভব হয়। আমার নিজস্ব ধারণা ইউরোপের সমস্ত জাতিদের মধ্যে ইতালি সবচেয়ে অগ্রবর্তী দেশ। সত্যি বলতে কি আট ঘন্টা পরিশ্রম, সবার জন্য বীমাকরণ, মেয়েছেলে এবং বালক-বালিকাদের কাজকর্ম সম্পর্কে আইন প্রণয়ন, কাজের পরে অবসর বিনোদনের পরিকল্পনা, প্রাপ্তবয়স্কদের শিক্ষা এবং সর্বোপরি যক্ষ্মা রোগীদের অবশ্য বীমাকরণ ইত্যাদি আইনগুলোকে ইতালি সরকার ইতিমধ্যে অনুমোদন করেছে। এগুলোই কিন্তু প্রমাণ করে যে শ্রম জগতে ইতালির শ্রমিক শ্রেণীর পাশে আমি কতো দৃঢ়ভাবে দাঁড়িয়েছিলাম। এই ব্যবস্থাগুলো নিতে গিয়ে কিন্তু আমাদের উন্নতিশীল অর্থনীতি এতোটুকুও ক্ষতিগ্রস্ত হয় নি; আমি সর্বনিম্ন মজুরী ব্যবস্থা, কর্ম যোজনা, দুর্ঘটনায় আহত বা ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য বীমা ব্যবস্থা, অসুস্থদের ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা, বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের জন্য আর্থিক অনুদান এবং সামরিক বিভাগে চাকরীর আইন কানুন ইত্যাদি চালু করি।

সামাজিক মঙ্গল অথবা কি ভাবে মানুষ সুখী হ'তে পারে সেইসব বিষয় নিয়ে খুব বেশি একটা লেখা বা চর্চা হয় নি। কিন্তু বলতে আপত্তি নেই যে ব্যাপারটার গভীর আমি ঢুকেছিলাম। আমি প্রতিটি পুরুষ এবং মহিলাকে এমন সুযোগ সুবিধা দিতে চাই যাতে জীবনটা তাদের কাছে ক্লান্তিকর না হয়ে উঠে তারা যেন জীবনটাকে রীতিমতো আনন্দের সঙ্গে উপভোগ করতে পারে। কিন্তু এই জটিল পরিকল্পনাগুলোর সঙ্গে সমিতি গড়ার কোন সম্পর্ক নেই। আর আইনে ঘেরা সমিতির পক্ষে এই দূরদর্শিতা সম্ভবও নয়। এই আইন দ্বারা গঠিত সমিতি বা রাষ্ট্রের শ্রম ব্যবস্থা ইত্যাদি ছাড়িয়ে হলো ফ্যাসিবাদ। যা ইতালির জনগণের জীবনযাত্রার ছন্দময় পথ প্রদর্শক, অনুপ্রেরণার উৎসস্থল।

১৯২৩ সালে রোম দখল করার কয়েক মাস পরেই দিনে আট ঘন্টা পরিশ্রমের আইনটাকে অনুমোদন করি; ফ্যাসিষ্ট সরকারের আনা এই আইনকে আইন পরিষদের সবাই সানন্দে অনুমোদন করে। জনগণও বুঝতে পারে যে ফ্যাসিষ্ট সরকার তাদের বন্ধু সরকার। পুরনো পেশাদারী সমিতিগুলোর পরিবর্তে ফ্যাসিষ্ট সমিতি গঠন করা হয়। ১৯২৩ সালের ১৯শে ডিসেম্বর তারিখে আমি একটা জমায়েতে সবাইকে উদ্দেশ্য করে বলি যে সরকারের প্রধান কাজ হলো শান্তি স্থাপন। যারজন্য সরকারের পরিষ্কার এবং স্বচ্ছ একটা চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য বর্তমান। রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত এমন কোন আদেশ দেওয়া সরকারের পক্ষে উচিত হবে না যা জনগণের মধ্যে অশান্তি বা অসন্তোষের সৃষ্টি করতে পারে। অবশ্য অর্থনৈতিক দিকটাতেও নজর রাখা প্রয়োজন। পরস্পরের সহযোগীতার দ্বারাই এটা হ'তে পারে। তবে অন্যান্য সমস্যাও আছে; যার মধ্যে মূল হলো

রপ্তানীকরণ। আর এই বিষয়গুলোই আমি ইতালির শিল্প অধিকর্তাদের স্মরণ করিয়ে দেই। কারণ এতোদিন পর্যন্ত ব্যাপারটা ব্যক্তিগত পর্যায়ে ছিল। পুরনো প্রথা এবং পদ্ধতির অবলুপ্তিকরণের অবশ্যই প্রয়োজন।

ব্যাপারটাকেই আরো একটু এগিয়ে নিয়ে গিয়ে বলি,—মানুষে মানুষের এই দ্বন্দ্ব এবং বৈধ স্বার্থরক্ষার বিষয়ে সরকার-ই হলো সর্বোচ্চ বিচারক। সরকার এমন এক জায়গায় অধিষ্ঠিত থাকে যে বেশির ভাগ সাধারণ মানুষের স্বার্থ সরকারের পক্ষেই দেখা সম্ভব। বর্তমান সরকার এই মানুষ অথবা সেই মানুষ—কোন একক মানুষের স্বার্থরক্ষার জন্য শাসন করছে না। এই সরকার সবার স্বার্থরক্ষায় সর্বদা তৎপর। হ্যাঁ, শুধু জাতির বর্তমান নয়, ভবিষ্যতে যারা জাতির প্রতিনিধিত্ব করবে, তাদের সর্বাঙ্গীন স্বার্থরক্ষার দায়িত্বও বর্তমান সরকারের ওপরে ন্যস্ত। ইতিমধ্যেই সরকার জাতিকে তার সর্বোচ্চ উৎপাদন ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত করেছে। যে সরকার এমন নিষ্ঠার সঙ্গে জাতির আদর্শগুলোকে মেনে চলে, তার কথা সবাই যে শুনবে এটাই তো আশা করা সঙ্গত। তবে নির্দিষ্ট কাজগুলোর বাকী কোটা তাকে পূরণ করতে হবে। আর সে তা' করবেও। জাতির নৈতিক এবং বস্তুতান্ত্রিক স্বার্থরক্ষার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করে যাবে বর্তমান সরকার।

ছোট ছোট অসংখ্য পুরনো শ্রমিক সংঘ এদিকে ওদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল। আমরা যতোগুলো সম্ভব সেই ছড়িয়ে থাকা সংঘগুলোকে রাষ্ট্রের মধ্যে আইনিবদ্ধ সমিতির রূপ দিতে চেষ্টা করেছি। আমি শ্রমিকদের কাছ থেকে একটা ছুটির দিনও কেড়ে নিতে চাই নি। ১লা মে'র পরিবর্তে ২১ শে এপ্রিল শ্রমিকদের ছুটির দিন বলে বর্তমান সরকার ঘোষণা করেছে। কারণ ১লা মের উৎপত্তি বিদেশে। সোশ্যালিষ্ট আন্তর্জাতিকতার গন্ধ গায়ে লেগে রয়েছে। কিন্তু ২১ শে এপ্রিল শহর রোমের প্রতিষ্ঠা দিবস। রোম এমন একটা শহর, যে শহর পৃথিবীকে আইন কানুনের বৈধতা শিখিয়েছে। আজও নাগরিক জীবনের পরস্পরের সম্পর্ক রোমান আইন মেনেই চলে। এই শ্রমিক দিবস হিসেবে এরচেয়ে ভালো এবং উল্লেখযোগ্য দিন আর কোনটা হ'তে পারে।

পরস্পরের মধ্যের এই সহযোগীতা আনতে আমি এবং ফ্যাসিবাদ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানিক জটিলতা দূর করতে সচেষ্ট হই। মহাপরিষদে একটা দলিল এই মর্মে পাশ করিয়ে নেই। এটাকে ঐতিহাসিক চরিত্র বলতেও আমার আপত্তি নেই। তথাকথিত চরিত্রটা হলো শ্রমিকদের চার্টার বা দলিল।

তিরিশটা অনুচ্ছেদে ভাগ করা এই দলিল; আর প্রতিটি অনুচ্ছেদ লেখা হয়েছে মৌল সত্যের ওপরে ভিত্তি করে। উৎপাদন শুরু থেকে উৎপাদন শেষ পর্যন্ত, যা নাকি সবচেয়ে প্রয়োজনীয়। ট্রাইবুনালের বিচার ব্যবস্থা, বিশেষ করে শ্রমিকের স্বার্থ যখন সেই ট্রাইবুনালে প্রত্যাখাত হয়। সর্বোপরি শ্রমিক-স্বার্থ রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় আইন কানুন।

ইতালির সমস্ত শ্রেণীর লোক শ্রমিক-স্বার্থ রক্ষাকারী এই দলিলকে মুক্তমনে সমর্থন জানায়। শ্রমিক স্বার্থরক্ষাকারী ম্যাজিষ্ট্রেটকে পরিষ্কারভাবে কর্তব্যের নির্দেশ এই দলিলের মাধ্যমে দেওয়া হয়েছে। যা একমাত্র উন্নত দেশের পক্ষেই সম্ভব। উদারপন্থী, গণতান্ত্রিক বা কম্যুনিষ্টদের মতো রঙীন মোড়কে কুয়াশার এবং রহস্যের জালে ঘেরা নয়। আইন

তৈরি করা এবং সেই আইনকে বাস্তবে রূপ দেওয়াই ছিল ফ্যাসিবাদের কাজ। নতুন এই সংস্কারের জনপ্রিয়তা দেখে প্রাচীন সোশ্যালিস্টরা তো হতবাক। আর একটা রূপকথার পতন ঘটে। ফ্যাসিবাদ শুধু সমাজের বিশেষ শ্রেণীকে রক্ষার জন্য নয়, রাষ্ট্রের সমস্ত নাগরিকবৃন্দের উন্নতি ঘটানোই হচ্ছে ফ্যাসিবাদের মূল লক্ষ্য।

এই শ্রমিক স্বার্থরক্ষাকারী দলিল বুদ্ধিজীবিদের মধ্যে যথেষ্ট জনপ্রিয়তা অর্জন করে এবং পৃথিবীর প্রতিটি প্রান্তে এর সুখ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। এটা অদূর ভবিষ্যতে ফ্যাসিষ্ট রাষ্ট্রের নতুন সংবিধানের অন্যতম জোরদার স্তম্ভ হিসেবে বিবেচিত হয়।

যুক্তির পথ ধরে শ্রমিক-দলিল, বিভিন্ন সামাজিক আইন কানুন আর শ্রমিক বিচার পদ্ধতি অনুযায়ী সংগঠিত সমিতিগুলোর সংবিধান পরিবর্তনের প্রয়োজন হয়ে পড়ে। এই সমিতিগুলোই কিন্তু উৎপাদনের উৎস। উৎপাদন-ই হলো মুখ্য ব্যাপার। এবং এই উৎপাদনমুখীতা আনতে হলে বুদ্ধি এবং শ্রমশক্তির সমন্বয় ঘটানো দরকার। তারজন্য সমভাবে সংরক্ষণ এবং উর্বরতার প্রয়োজন আছে। ফ্যাসিষ্ট রাষ্ট্রের নাগরিকরা কেউ ব্যক্তিগত স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য ব্যাগ্র ছিল না। যারজন্য সমাজবিরোধীদের মতো আইন ভাঙার খেলাতেও তারা মেতে উঠতো না। ফ্যাসিষ্ট রাষ্ট্রের মূল লক্ষ্য-ই ছিল সংঘবদ্ধ সমাজব্যবস্থা, যাতে উৎপাদন ব্যবস্থা বাড়ানো যায় এবং প্রত্যেকের কর্তব্য তারা নিষ্ঠার সঙ্গে সম্পাদন করতে পারে।

নতুন ধ্যান-ধারণায় প্রত্যেকটি মানুষকে তার প্রতিনিধিত্বের অধিকার দেওয়া হয়েছে। প্রতিটি নাগরিক তার উৎপাদনশীলতা, কাজকর্ম এবং চিন্তাধারা ইত্যাদির জন্য সমাজ ব্যবস্থায় যথেষ্ট মূল্যবান। শুধু একুশ বছর বয়েস হওয়া ভোট দেওয়ার অধিকার পাওয়াটাই সমাজ ব্যবস্থার শেষ কথা নয়।

সমিতিবদ্ধ রাষ্ট্র ব্যবস্থায় জাতীয় কার্যকলাপের স্পষ্ট ছবি ফুটে ওঠে। এই প্রতিনিধিমূলক সমিতিগুলোই সমাজকে এগিয়ে নিয়ে যায়। নতুন এই রাজনৈতিক এবং সমাজিক উন্মেষ জাতীয় রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্বের-ই ফল। এই নতুন রাজনৈতিক চিন্তাধারার মাধ্যমে যারা জনপ্রতিনিধিত্ব করার জন্য নির্বাচিত হয়, তাদের উৎকর্ষতা সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ থাকে না বললেই চলে। আর ফ্যাসিষ্ট মহাপরিষদ সত্যিকারের জাতিকে সক্ষম ভাবে প্রতিনিধিত্ব করতে পারে এই সঠিক নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে।

কোনরকম হাঁক ডাক ছাড়াই আমরা অনেক সমস্যার সমাধান করতে পারি। বহুবর্ষজীবি যেসব বিশৃঙ্খলা, সমস্যা এবং সন্দেহ আমাদের জাতির জীবনকে কুঁড়ে কুঁড়ে খাচ্ছিলো, সেগুলোর মূল সহ উৎপাটন করা হয়। আমরা মানুষকে তার জীবনের ছন্দ, আইন এবং কাজের পরিবেশ ফিরিয়ে দেই। বিভিন্ন শ্রেণীর সমন্বয়ে আমরা খুঁজে পাই আমাদের ভবিষ্যতের সম্ভাবনা, খোঁজ পাই অসীম শক্তির। সুতরাং ঝুট ঝামেলা, ধর্মঘটের মাধ্যমে আমাদের জাতীয় আত্মাকে যেমন বিরক্ত করতে চাই না, তেমনি অর্থনৈতিক শক্তি স্তম্ভেও ধস্ নামানোর ইচ্ছে আমাদের নেই। পরস্পরের মধ্যে সংঘর্ষের ব্যাপারটা হলো ধনী ব্যক্তিদের বিলাসিতা। আমাদের নিজেদের শক্তি সঞ্চয় করা উচিত। সেই শক্তি দেশের উৎপাদনশীলতায় যাতে নিযুক্ত করা যায়। সেই কারণেই এই মতামত পোষণকারী যতো

বেশি সংখ্যক লোককে আইন পরিষদে নেওয়া যায়, ইতালির জাতীয় জীবনের মুকুটটা ততোবেশি শক্তিশালী হবে।

রাশিয়ার কম্যুনিষ্টদের স্বপ্ন দেখার মতো মূলধন ইতালি থেকে পালিয়ে যায় নি। কারণ উৎপাদন ব্যবস্থায় মূলধনেরই মুখ্য ভূমিকা থাকে।

আমার এই জীবন-চরিতে আমি বারবার আমার রাজনৈতিক কাজকর্মকে পরস্পরের সহযোগীতার সূত্তোয় বুনতে চেষ্টা করেছি। ইতালির জীবন-প্রবাহকে বাইরে থেকে কাঠ দিয়ে ঢাকতে চেষ্টা করি নি। বরং তার আত্মার সুগভীর চেতনাকে জাগিয়ে তোলার চেষ্টায় মেতেছি।

বলাবাহুল্য আমার অদম্য পরিশ্রম সত্যিকারের ইতালির জীবন ধারার তল খুঁজে পেয়েছে। আর তার থেকেই আমি জীবনের মূল্যবান শিক্ষা নিয়েছি। যার ফলাফল হলো আমার দেশকে নতুন এক ভবিষ্যত উপহার দেওয়া।

সংস্কারের একটা ধারা ছিল স্কুলগুলোকে ঢেলে সাজানো; এই সংস্কারের নাম দেওয়া হয় জেন্‌টাইল রিফর্ম। রোম দখল করার পর যে মন্ত্রীকে আমি জনসাধারণের মঙ্গল দেখার জন্য নিযুক্ত করেছিলাম, তার নামেই এই সংস্করণ পদ্ধতির নামকরণ করা হয়। যেসব আধুনিক রাষ্ট্রনেতার মনে জাতিকে একটা নির্দিষ্ট গন্তব্যে নিয়ে যাওয়ার ইচ্ছা বর্তমান, স্কুল-শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা তাদের নজর এড়াতে পারে না। স্কুল বলতে কিন্তু এখানে পাবলিক স্কুল, ইন্টার মিডিয়েট স্কুল, ইউনিভার্সিটি ইত্যাদি জাতির শিক্ষা ব্যবস্থার সব পথগুলোকেই বোঝায়। কারণ এই শিক্ষা জাতির কর্ম এবং অর্থনৈতিক জীবনকে সুগভীরভাবে অনুপ্রাণিত করে। প্রথম থেকেই কিন্তু ব্যাপারটা আমার মাথায় ছিল; কারণ আমার জীবন শুরু হয়েছিল স্কুল শিক্ষক হিসেবে, তখন থেকেই যুবকদের উন্নতির পথ বলতে শিক্ষা ব্যবস্থাটাই সর্বপ্রধান বলে মনের ভেতরে গেঁথে গিয়েছিল। উঁচুমানের সভ্যতা সংস্কৃতি হলো ইতালির পরম্পরা। কিন্তু পাবলিক স্কুলগুলোর দুরবস্থার কারণ হলো টাকার অভাব আর আধ্যাত্মিক চেতনার ঘাটতি।

যদিও নিরক্ষরতা প্রায় মুছে যাওয়ার পথে, বিশেষ করে কিছু অঞ্চলে তো পূর্ণ স্বাক্ষরতা এসে গিয়েছিল। কিন্তু স্কুলগুলোর শিক্ষার ভিত্ পাকাপোক্ত না হওয়ায় দৈহিক, বুদ্ধিবৃত্তি এবং নৈতিকতা বৃদ্ধির সুযোগ ছিল সীমাবদ্ধ। মানবত্বের খামতিও সেখানে কম ছিল না। ইন্টার মিডিয়েট্ স্কুলগুলোতে তো ভীড় ভাট্টায় মেছো বাজারের অবস্থা। মেধাগত যোগ্যতা থাক বা না থাক, সবাই ইন্টার মিডিয়েট্ স্কুলে গিয়ে ভীড় জমাতো। আর পরীক্ষারও যেন শেষ ছিল না। ব্যাপারটা নিছক শেষে গিয়ে দাঁড়াতো লোক দেখানোয়। ব্যক্তিগত ছাত্রদের মেধা বিচার করে ছাত্র নির্বাচনের ব্যাপারে যে ঘাটতি ছিল তা'তে সন্দেহ নেই। এ যেন একটা কারখানা; মানুষগুলোকে গুদাম জাত করে রাখার ব্যবস্থা। আর সেই ছাত্রগুলোই পরবর্তী জীবনে আমলা হয়ে দাঁড়াতো। যে কারণে জনসাধারণের কাজকর্মে প্রাণ সঞ্চারের খামতি থাকতো। বিশ্ববিদ্যালয়গুলো আইন এবং চিকিৎসা শাস্ত্র পড়ানোর নামে কতোগুলো পুতুলের সৃষ্টি করতো।

জাতির আধ্যাত্মিক উন্মেষের স্পর্শকাতর যন্ত্রগুলোকে নিখুঁতভাবে আবার চালনা

করতে হবে। ইন্টারমিডিয়েট্ স্কুলের ভীড় ভাট্রা কমিয়ে দেওয়ার প্রয়োজন। অর্থাৎ অসফল এবং মেধাহীনদের সরিয়ে দিতে হবে। পাবলিক স্কুলের পাঠ্য তালিকা এমন হওয়া উচিত যাতে ইতালির উন্নত ইতিহাস এবং পরম্পরা ভালো করে শেখানো যেতে পারে। সর্বশেষে শিক্ষাক্ষেত্রে শৃঙ্খলাবোধ আনার প্রয়োজনীয়তা সর্বাধিক।

শিক্ষকদের বেতন অত্যন্ত কম; যাতে সুস্থ জীবন যাপন করা কোনরকমেই সম্ভব নয়। তবে বাজেটের অবস্থা ভালো হলে এই সমস্যাটার সমাধান করা জরুরী। শিক্ষার ব্যাপারে ব্যয় সংকোচ কোন কাজের কথা নয়। কৃপণতার নীতি হলো প্রাচীন এবং টিপিক্যাল উদার আর গণতান্ত্রিকপন্থী। এই ব্যয়কুণ্ঠ শিক্ষা পদ্ধতি শিক্ষকদের যেমন তাদের কর্তব্য কর্ম ঠিক মতো করতে দেয় না, তেমনি গোপন বিরোধী চিন্তাধারা রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে কাজ করে। এই ব্যবস্থা লাঞ্ছনার চরমে উঠলে পরে অনেক শিক্ষক-ই শিক্ষকতা ছেড়ে দেয়। তার অনেক উদাহরণ শুধু প্রাথমিক স্কুলে নয়, ইউনিভার্সিটিতেও ভুরি ভুরি মেলে।

ফ্যাসিবাদ এইসবের ওপরে যতি চিহ্ন দিয়ে দেয়। প্রাথমিক এবং উচ্চ ব্যবস্থায় দৃঢ় হাতে শৃঙ্খলা আনে। বিশেষ করে উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে মানুষের সেবার আদর্শকেই সবচেয়ে উঁচু স্থান দেওয়া হয়।

মন্ত্রী কাসোটির নামে স্কুলে স্কুলে একটা আইনের প্রচলন ছিল। ১৮৫৯ সাল থেকে আইনটা প্রচলিত। কোপিনো, ডেনকো, ক্রীডেরো ইত্যাদি মন্ত্রীরা নতুন নতুন আইন চালু করলেও সেই প্রাচীন আইনটা ভিত্তিভূমি হিসেবেই থেকে গেছে। আমাদের দলীয় লৌহ-ইচ্ছার ফলে আইনগুলোকে নতুন ভাবে ঢেলে সাজাই। কিছু বাতিল করে আর কিছু আইনে পরিবর্তন বা সংযোজনের মাধ্যমে। এই শিক্ষা ব্যবস্থাকে এমন ভাবে পুনর্জন্ম দেই যাতে নতুন ইতালি গড়ার পথে এই ব্যবস্থা সক্রিয় অংশ নিতে পারে। মহান চিন্তাধারা এবং বিপ্লব বড় বড় সমস্যার সমাধানের পথ খুলে দেয়। শিক্ষার সমস্যা যা যুগ যুগ ধরে টেনে হিঁচড়ে ভারবাহী জন্তুর মতো পথ চলছিল, শেষে জেন্টাইল সংস্কারের মাধ্যমে সমাধানের পথ খুঁজে পায়। বলাবাহুল্য সংস্কারের ব্যাপারগুলো নিয়ে জনসাধারণের মঙ্গলামঙ্গল দেখার দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীর সঙ্গে আলাপ আলোচনায় বসি। নীচের সারাংশটুকু সেই আলোচনারই ফলাফল। প্রথমত, সরকার সেই সব ছাত্রের স্কুলের খরচ খরচা বহন করবে যাদের মেধা শিক্ষাক্ষেত্রে এগিয়ে যাওয়ার যোগ্যতা রাখে। বাকীদের সরকারী খরচে পড়াশুনা চালিয়ে যেতে দেওয়া হবে না।

এই ব্যবস্থা কিন্তু গণতান্ত্রিক পদ্ধতির বিরোধী। কারণ গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় রাষ্ট্রের স্কুল গোয়ালঘর বিশেষ। সবাইকে গুদামজাত করা। অর্থাৎ এক বাক্সে ভালো এবং পচা দু'রকমের ফল রাখার ব্যবস্থা। মধ্যবিত্ত শ্রেণী স্কুলে পড়াশোনা করাটাকে কর্তব্য বলে ধরে নেয়। কিন্তু পড়াশোনার প্রতি শ্রদ্ধা বলতে তাদের কিছু নেই। সুতরাং তাদের কাছে ডিগ্রী পাওয়া বা উঁচু ক্লাসে ওঠাটাই মুখ্য। প্রকৃত শিক্ষাকে না দেয় তারা মর্যাদা, না সম্মান।

দ্বিতীয়ত, রাষ্ট্রের পরিচালিত স্কুল এবং ব্যক্তিগত স্কুলগুলোর পরীক্ষা এক সঙ্গে আর একই পাঠক্রমের মাধ্যমে হয়ে থাকে।

ইংল্যাণ্ডের মতো এই সরকার ব্যক্তিগত স্কুলগুলোকে উৎসাহ দেয়। তবে সরকারের একটা সুযোগ ছিল যে ক্যাথলিকদের হাতে অনেক স্কুলের মালিকানা থাকলেও স্কুলগুলোকে চালনা করা হ'তো প্রাচীন পন্থায়। এই ব্যবস্থা আমাকে পুরনো পদ্ধতির বাইরে স্কুল পরিচালনার ব্যাপারে কিছু চিন্তা ভাবনা করার সুযোগ দেয়।

তৃতীয়ত, সরকার রাষ্ট্রীয় এবং ব্যক্তিগত উদ্যোগে তৈরি স্কুলগুলোর ওপরে তীক্ষ্ণ নজর রাখে। যাতে পরস্পরের প্রতিযোগীতার মাধ্যমে উঁচুমানের সভ্যতা সংস্কৃতি এবং পরিবেশ গড়ে উঠতে পারে।

সরকার মনে করে না যে ব্যক্তিগত উদ্যোগে তৈরি স্কুলগুলো তার ক্ষমতায় থাবা বসাচ্ছে। বরং অতন্দ্র চোখে নজর রাখে। হ্যাঁ, সমস্ত স্কুলগুলোর ওপরে।

চতুর্থত, ইন্টার মিডিয়েট্ স্কুলগুলোয় ভর্তির ব্যবস্থা হয় প্রতিযোগীতামূলক পরীক্ষার মাধ্যমে। স্কুলগুলোকে আদেশ দেওয়া হয়েছিল যে মানবত্ব বিকাশের জন্য যে সংস্কৃতির প্রয়োজন, সেদিকটাতেই যাতে অধিক নজর দেওয়া যায়। তবে পড়াশোনার মান এমন হওয়া প্রয়োজন যাতে আগের বিশৃঙ্খলা আর সহজ ভাবে পুরনো গণতান্ত্রিক স্কুলে চলার দিনের সমাপ্তি ঘটে।

এইসব ব্যবস্থা গ্রহণের দরুণ এবং অন্যান্য সংস্কারের ফলে প্রাথমিক স্কুলগুলোর চরিত্রে দু'টো বিশেষত্ব প্রকট হয়ে পড়ে। একটা হলো ইন্টার মিডিয়েট্ স্কুলে ভর্তি হওয়ার জমি তৈরির আর দ্বিতীয়টা হলো উঁচুমানের শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা। এই স্কুলগুলো কিন্তু সবদিক থেকেই স্বয়ং সম্পূর্ণ ছিল।

ইন্টার মিডিয়েট্ স্কুলগুলোকে প্রসারিত করা হয় নিম্নলিখিত উপায়ে ঃ

(ক) কমপ্লিমেন্টারী স্কুল। টেক্‌নিক্যাল বিভাগগুলো তুলে দিয়ে নতুন শিক্ষা ব্যবস্থার বিস্তার করা হয় স্কুলগুলোতে।

(খ) টেক্‌নিক্যাল স্কুল। অত্যন্ত উঁচুমানের শিল্প সংক্রান্ত শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয় এখানে।

(গ) সাইন্টিফিক লিসিয়ুম। আরো উঁচুমানের বিজ্ঞান সংক্রান্ত বিদ্যাশিক্ষা দিয়ে ছাত্রদের ইউনিভার্সিটিতে পড়ার যোগ্য করে তোলা হয় এই লিসিয়ুমগুলোতে।

(ঘ) টিচার্স ইনস্টিয়ূট। মানবত্ব এবং জীবনের দার্শনিক দিকগুলো এখানে শিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে তুলে ধরা হয়।

(ঙ) উওম্যানস লিসিয়ুম। মেয়েদের জন্য সংস্কৃতি বিকাশ কেন্দ্র এবং সাধারণ জ্ঞান আহরণের জন্য পড়াশোনার জায়গা।

(চ) ক্ল্যাসিকাল লিসিয়ুম। ইউনিভার্সিটিতে পড়াশোনার জন্য শিক্ষার বিভিন্ন শাখা-প্রশাখায় তৈরি করা হয় এখানে ছাত্র-ছাত্রীদের।

তবে ক্ল্যাসিকেল এবং সাইন্টিফিক লিসিয়ুমের শেষ পরীক্ষাকে বলা হয় ম্যাচিরিটি এগ্‌জামিনেসন। এমন ভাবে এখানে শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয় যাতে আধুনিক সভ্যতা সংস্কৃতির সঙ্গে এরা নিজেদের খাপ খাইয়ে নিতে পারে। কমপ্লিমেন্টারী এবং প্রাথমিক আর ইন্টারমিডিয়েট্ স্কুলের ধর্মীয় বিভাগ ছাড়া আর সব স্কুলে ল্যাটিন ভাষা শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করা হয়।

আর এইসব ব্যবস্থা চালু করতে গিয়ে প্রতিটি স্কুলকে একক শিক্ষা কেন্দ্র হিসেবে গণ্য করা হয়।

প্রতিটি স্কুলে পরীক্ষার মাধ্যমে উঁচু স্কুলে বা ইউনিভার্সিটিতে পড়ার ব্যবস্থা রয়েছে। যারা অকৃতকার্য হয় এইসব পরীক্ষাতে, তাদের ইনডিপেনডেন্ট স্কুলে যেতে বাধ্য করা হয়।

এই সংস্কার পুরনো স্বার্থ এবং ধ্যান-ধারণাকে দূরে ঠেলে দেওয়াতে কিছু লোক স্বভাবতই ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠে। বিরোধী প্রেস, বিশেষ করে কেরিয়ারে ডেলা সেরা তো বিষয়টাকে রীতিমতো বিতর্কমূলক করে তোলে। কিন্তু তখন এই শিক্ষা সংস্কারের পেছনে আমি সর্বশক্তি নিয়োগ করে ফেলেছি। এবং বলতে দ্বিধা নেই যে এই সংস্কার ইতালির স্কুল এবং সংস্কৃতিকে নতুন এক জন্ম দেয়।

প্রাইমারী এবং ইন্টারমিডিয়েট্ স্কুলের সঙ্গে সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকেও এই সংস্কারের অধীনে নিয়ে আসা হয়। এর উদ্দেশ্য ছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাকে বিভিন্ন কার্যকরী শাখা- প্রশাখায় ভাগ করে দেওয়া। যাতে একই বিষয়বস্তু বার বার এসে হাজির না হয়। সরকারী এবং ব্যক্তিগত উদ্যোগের স্কুলগুলো থেকে ছাত্ররা যাতে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হ'তে পারে, তারজন্য পরীক্ষার ব্যবস্থাও করা হয়।

লিবেরা ডোসেনজাকেও বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভূক্ত করা হয়। কিছু অতিরিক্ত সুযোগ সুবিধা দিয়ে। তবে এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেও কিছু সংস্কার করার প্রয়োজন হয়ে পড়ে। আর সেই সংস্কারের দায়িত্ব দেওয়া হয় রোমের সেন্ট্রাল কমিটির হাতে।

ফ্যাসিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর একটা দল আমার সঙ্গে সাক্ষাত্ করতে এলে আমি বলি যে জেন্টাইল সংস্কার হলো সমস্ত সংস্কারগুলোর মধ্যে অন্যতম। কারণ ১৮৫৯ সাল থেকে যে শিক্ষা পদ্ধতি আমাদের স্কুল এবং বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে চলে আসছে, এই সংস্কারের দ্বারা তার আমূল পরিবর্তন ঘটেছে।

আমি এক স্কুল শিক্ষিকার সন্তান; নিজেও প্রাইমারী এবং সেকেণ্ডারী স্কুলে শিক্ষকতা করেছি। যারজন্য শিক্ষার সমস্যাগুলোকে সামনা সামনি থেকে দেখেছি। ইতালির স্কুলগুলো নিঃসন্দেহে আবার পৃথিবীর শিক্ষাক্ষেত্রের মানচিত্রে যে যথাযোগ্য স্থান পাবে, তা'তে সন্দেহ নেই। বিশ্ববিদ্যালিয়ের চেয়ারগুলো থেকে সত্যিকারের বৈজ্ঞানিক এবং কবি, লেখক ইতালির চিন্তার জগৎ আবার উদ্ভাসিত করবে। আর সেকেণ্ডারী স্কুল দেবে শিল্পে এবং প্রশাসনে দক্ষ অফিসার। হ্যাঁ, ইতালির জনসাধারণকে। আর পাবলিক স্কুলগুলো থেকে এমন ছাত্র বের হবে যারা নাগরিক এবং সাধারণ মানুষের সমস্যাগুলোর সমাধানে হবে পারদর্শী।

বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর বিভিন্ন বিভাগের সঙ্গে হাত মিলিয়ে ফ্যাসিষ্ট অর্থনীতি, আইন কানুন ব্যবস্থা ইত্যাদি ফলপ্রসূ হয়ে ফ্যাসিষ্ট সংস্কৃতিকেই আরো এগিয়ে নিয়ে যাবে। এই পাণ্ডিত্যপূর্ণ শিক্ষা জগতে এই ভাবেই ফ্যাসিবাদের অনুপ্রবেশ ঘটে। এবং নতুন এক সংস্কৃতির আভায় ইতালির আকাশ উজ্বল হয়ে ওঠে।

তবে ফ্যাসিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর থেকেও যে নতুন প্রতিষ্ঠানটা আমার মনপ্রাণ কেড়ে নিয়েছিল, সেটা হলো ন্যাশানাল অর্গানাইজেসন অফ বলিলা। প্রাচীন রূপকথার ছোট্ট নায়কের নামে ইতালির নতুন প্রজন্মের ছোট ছোট ছেলেমেয়ে এবং যুবকদের শিক্ষাদানের

জন্য এই প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা হয়। পুরনো দিনের মতো ছড়ানো ছিটানো খেলাধূলার মাঠ বা রাজনৈতিক কূট কাচালির স্কুল ছিল না এই প্রতিষ্ঠান। এই প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে জিমনাষ্টিক, শৃঙ্খলাবোধ ইত্যাদি শিক্ষা দিয়ে শৃঙ্খলাপরায়ণ জাতির জীবনের একটা বিশেষ অঙ্গ হিসেবে এই প্রতিষ্ঠানকে গড়ে তোলা হয়। ওদের প্রকৃতিতে বাধ্যতা বস্তুটাকে রীতিমতো জোরদার করে তোলা হয়েছিল। যাদের মাধ্যমে ইতালির জনগণ তাদের ভবিষ্যত্‍ স্পষ্ট দেখতে পায়।

শিক্ষাব্যবস্থার পুনর্মূল্যায়নের ব্যাপারে গুরুত্ব আরোপ করার জন্য পেরুজিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে একটা বক্তৃতা দিয়েছিলাম। পণ্ডিতদের মতে যুবকদের পৃথিবীর প্রতি দায়-দায়িত্বের ধ্যান- ধারণা এই বক্তৃতার মাধ্যমে অনেক বাড়িয়ে দেয়। শেষমেষ ইতালির সংস্কৃতির জগতকে অরো উঁচুতে টেনে তোলার জন্য ইতালিয়ান আকাদমীর সৃষ্টি করি। যাতে সেই আকাদমীর সদস্যরা অমর হওয়ার সুযোগ পায়।

ইতালির সশস্ত্র সেনাবাহিনী ১৯১৯, ১৯২০ এবং ১৯২১ সালে অনেক পিছিয়ে পড়েছিল। আমাদের জাতিকে শুধু পথের একটা ধারে ঠেলে-ই দেয় নি, জাতির ভাগ্যে লাঞ্ছনাও কম জোটেনি।

অবস্থা এমন একটা জায়গায় গিয়ে পৌঁছেছিল যখন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী সেই লিবারেল দিনগুলোতে আদেশ দিতে বাধ্য হয় যে সৈন্য বিভাগের অফিসাররা যাতে কোন প্রকাশ্য জায়গায় য়ুনিফর্ম পড়ে না যায় এবং সঙ্গে অস্ত্র শস্ত্র নিয়ে না ঘোরে। কারণ তা'হলে গুণ্ডা বদমাস এবং লুম্পেনের দলের হাতে হেনাস্তা হ'তে পারে। ফ্যাসিবাদ এই ব্যবস্থার মুখ ঘোরানোর জন্য অত্যন্ত তৎপর হয়ে ওঠে। এবং আজকে সৈনিকদের জাতির প্রতিরক্ষার প্রতিভূ হিসেবে যথেষ্ট সম্মান দেখানো হয়ে থাকে।

১৯২২ সালে রোম শহরের দিকে মার্চ করে যাওয়ার সময় পুরো পরিকল্পনাটা আমার পরিষ্কার করে ছকা ছিল। ১৯১৮ সালের যুদ্ধে বিজয়ী বীর জেনারেল আরমান্দো দিয়াজ্‌, যে ভিটোরিও ভেনেটা ওর পদে বসানোর পর নিশ্চুপে সরে এসেছিল। কিন্তু সেনেটে নিটি মন্ত্রী পরিষদের নীতির বিরুদ্ধে তুমুল ঝড় তোলে। সেই দিয়াজকেই আমি প্রতিরক্ষা মন্ত্রী নিযুক্ত করেছিলাম। সমুদ্র-যুদ্ধের শ্রেষ্ঠ যোদ্ধা থন ডি রেভেলকে নৌ-বাহিনীর মন্ত্রী করা হয়েছিল। ১৯২৩ সালের ৫ই জানুয়ারী জেনারেল দিয়াজ্‌ মন্ত্রী পরিষদের কাছে সৈন্যবাহিনীর সংস্কারের পরিকল্পনা পেশ করে। এই মিটিংটা ঐতিহাসিক ঘটনা বললেও সম্ভবত অত্যুক্তি করা হবে না। সশস্ত্র বাহিনীর ভিত্তিভূমি সম্পর্কে মতামতের আমূল পরিবর্তন করা হয়। আর এই সংস্কার প্রস্তাব পাশ করার পরেই আমরা ঘোষণা করি যে সৈন্যবাহিনীর ওপরে জাতির স্বার্থরক্ষার সবচেয়ে বড় দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

ইতালির জনসাধারণের প্রতি আমার প্রথম প্রতিজ্ঞা পূরণ করতে আমি তৎপর হয়ে উঠি। তারপরেই বিমান বিভাগকে ঢেলে সাজাতে উঠে পড়ে লাগি। পুরনো শাসকবর্গ এই বিভাগটাকে প্রায় ধ্বংস-ই করে দিয়েছিল। কাজটা সহজ ছিল না। বিমান বিভাগের সবকিছু-ই আবার নতুন করে গড়ে তুলতে হবে। বিমান ক্ষেত্র, বৈমানিকবৃন্দ, কর্মীগোষ্ঠী

এবং টেকনিক্যাল ষ্টাফ ইত্যাদি সবকিছুকেই আবার তৈরি করার প্রয়োজন। ইতালির বিমান বহরের শত্রুরা ইতিমধ্যে ইতালির জনগণের মধ্যে বিদ্বেষ, অবিশ্বাস ইত্যাদি বিষ দু'হাতে ছড়িয়ে দিয়েছে। নতুন ভাবে সশস্ত্র বাহিনীকে গড়ে তোলার প্রচেষ্টাকে সবাই প্রথমে একটা খেলা বলেই ধরে নিয়েছিল। এই পরিস্থিতিতে আমার সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করতে হয়।

আমি নিজে ব্যক্তিগত উদ্যোগ নেই ব্যাপারটাকে সফল করতে। মেডালেনার ডি পিনেডো, স্কোয়াড্রেন লিডারদের নিযুক্তি, বিমানগুলোর আকাশের বুকে বিচরণ ইত্যাদি দেখে সমস্ত ইতালি বুঝতে পারে সত্যই বিমান বহর তার কার্যক্ষমতার চূড়ায় গিয়ে পৌঁছেছে। আর এই সম্মান শুধু ইতালিতেই নয়, যেখানে বিমান রয়েছে সর্বত্রই এই সম্মানের অধিকারী হয় এই ইতালির বিমান বহর।

নৌ-বাহিনী সম্পর্কেও একই কথা বলা চলে। নৌ-বাহিনীকে একেবারে ঢেলে সাজানো হয়; একদিকে যেমন নতুন ভাবে প্রতিটি বিভাগকে উন্নত করা হয়, তেমনি কড়া হাতে শৃঙ্খলা বোধ আরোপিত করা হয়েছিল।

চতুর্থত, জাতির নিরাপত্তার খাতিরে স্বেচ্ছা মিলিশিয়া বাহিনী তৈরি করা হয়েছিল। একশো যাট লিজিয়ন নিয়ে। উৎসাহী ফ্যাসিষ্ট এবং সুদক্ষ অফিসারদের অধীনে এই বাহিনী শত্রুপক্ষকে হঠাৎ ধাক্কায় হতভম্ব করে দেওয়ার ক্ষমতা রাখতো।

শেষে বলা বোধহয় অত্যুক্তি হবে না যে আমাদের সৈন্যদের ব্যারাক এবং জাহাজগুলো ছিল সত্যকারের শান্তি এবং শৌর্যস্থল। অফিসাররা সব সময় অধীনস্থ সৈন্যদের শারীরিক এবং মানসিক উন্নতির জন্য সচেষ্ট ছিল। আধুনিক যুদ্ধের মহড়া হ'তো নিয়মিত। সৈন্যবিভাগকে অতীতের সরকারের মতো সাধারণ জনসাধারণের কাজে কখনো নিযুক্ত করা হ'তো না। যে কারণে জনসাধারণের হাতে তাদের লাঞ্ছনা বা নিগৃহীত হ'তেও হ'তো না। সৈন্যবাহিনী সম্পর্কে পুরনো শাসকবর্গের সমস্ত ব্যবস্থার খোল নলচে বদলে দেই আমি। গত পাঁচ বছরে মহড়া ছাড়া সৈন্যবাহিনী ব্যারাক ছেড়ে আর বের হয় নি।

কিছুদিন পরে অবশ্য জেনারেল দিয়াজকে স্বাস্থ্যের কারণে পদত্যাগ করতে হয়। অন্তর্বর্তীকালীন সৈন্যাধ্যক্ষের পদে বসে জেনারেল ডি জর্জজিও। কারণ ততোদিনে আমি বুঝে গিয়েছি যে রাষ্ট্রের সমস্ত সৈন্যদলকে একমুখী করার প্রয়োজন। আমি এরপরেই সশস্ত্র পদাতিক, নৌ এবং বিমান বাহিনীর কর্তৃত্ব নিজের হাতে তুলে নেই। যার ফলাফল হয় পরবর্তীতে কমাণ্ডার-ইন-চীফ নিয়োগের মধ্যে দিয়ে। এই কমাণ্ডার-ইন-চীফের লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য ছিল একটাই—তা'হলো যুদ্ধ জয় করা। আমাদের সামরিক বাহিনীর মানসিক দৃঢ়তা ছিল চমৎকার। আক্রমনাত্মক না হলেও শত্রুর পক্ষে হঠাৎ ফাঁদে ফেলা সম্ভব ছিল না এই সদা তৎপর বাহিনীকে। শান্ত কিন্তু বিনিদ্র।

ফ্যাসিবাদের পুনর্জাগরণের জন্য অনেকগুলো ছোট ছোট সমস্যাকেও মনে রাখার প্রয়োজন ছিল। যার মধ্য দিয়ে জাতির শৌর্য-বীর্যের প্রকাশ পায়। সেই ক্ষুদ্র সমস্যাগুলোর সমাধান করার জরুরী প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। যুদ্ধের আগে অবসরপ্রাপ্ত সরকারী কর্মচারী, যারা অত্যন্ত কম টাকা পয়সা পেনসেন হিসেবে পেতো, মুদ্রাস্ফীতির দরুণ তাদের দারুণ দুরবস্থার মুখোমুখি হ'তে হয়। টাকার মূল্যমানের দিকে নজর রেখে তাদের

পেনসেন এমন একটা জায়গায় বাড়িয়ে নিয়ে যাই যাতে তাদের দৈনন্দিন জীবন-যাপনে স্বাচ্ছল্য না হলেও স্বাচ্ছন্দ আসতে পারে। পাদরীদের অর্থনৈতিক দিকটাতেও আমাকে নজর দিতে হয়। কারণ এগুলো ছিল নিছক প্রয়োজন পূরণের তাগিদা।

ব্যাপারটা কিন্তু তথাকথিত সমাজবাদের সময় অসম্ভব ছিল; কারণ তখন সমাজের প্রতিটি স্তরে এই পাদ্রী-বিরোধীতা গড়ে তোলা হয়েছিল। সব সময় ওদের সব কাজের সমালোচনা করা হ'তো। ব্যাপারটা যেন রাষ্ট্র আর গীর্জার টানা পোড়ানিতে ঐতিহাসিক পর্যায়ে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল। পাদ্রীরা কিন্তু নিজেদের রাজনীতির কূট কাচালিতে না জড়িয়ে সমাজের ধর্মীয় দিকটাতেই আত্মনিয়োগ করতো। বিশেষ করে ফ্যাসিবাদের উত্থানের পরে তো ওরা রাজনীতির ধারে পাশেই ঘেঁষতো না। কারণ ওদের মিশনের আত্মিক দিকটাকেই ওরা যেন আরো বেশি করে জড়িয়ে ধরেছিল। তবে ভেক্ ধরা পাদ্রীদের বিরুদ্ধে যে সংগ্রাম করার প্রয়োজন ছিল তা' স্বীকার করে নেওয়াই ভালো। তা'ছাড়া পাদ্রীদের কাজ ছিল বাইবেলের সার কথা সমাজের লোকেদের সামনে তুলে ধরে তাদের আত্মিক উন্নতির পথ দেখানো। তারা মানবিকতা এবং ধ্রুব সত্যের পথে এগিয়ে যেতেও মানুষকে সাহায্য করতো। তবে অধিকাংশ পাদ্রী-ই অত্যন্ত দুরবস্থার মধ্যে দিন কাটাতো বলে আমরা চেষ্টা করেছি ওদের আর্থিক অবস্থার কিছুটা উন্নতি ঘটানোর।

ইতালিতে দীর্ঘদিন ধরে নির্বাচনের দিকে চোখ রেখে এখানে ওখানে জনকল্যাণমূলক কাজকর্ম চালানো হ'তো। হয়তো বিশেষ একটা ভোটারের দলকে সন্তুষ্ট রাখার জন্য সেইসব এলাকা বা অঞ্চলে জনকল্যাণ কাজকর্ম করতো শাসক দল। আমি কিন্তু আইন-মাফিক এই ভোটার তোষামোদ বন্ধ করে দেই। পরিবর্তে চালু করি, ব্যুরো অফ পাবলিক ওয়াকার্স। এবং এই ব্যুরোর কর্তৃত্ব এমন লোকেদের হাতে দেই যারা আঞ্চলিক চাপের কাছে মাথা নোওয়ায় না। আর এই পথ ধরেই দক্ষিণ ইতালির রাস্তাঘাটের অবস্থার উন্নতি করা হয়। আমি রেলরোড এবং বন্দরগুলোর ম্যাপ করে ছক কষি এবং ব্যুরোকে নির্দেশ দেই সেগুলোর উন্নতি ঘটানোর জন্য। সরকারী অফিসগুলোতে নতুন কাজের জোয়ার নিয়ে আসি। রাষ্ট্রের জনকল্যাণ শাখা, রেলরাস্তা, ডাকঘর, টেলিগ্রাফ এবং টেলিফোন ইত্যাদি বিভাগগুলো যেন নতুন কাজের উৎসাহে মেতে ওঠে। কিছু লোক অবশ্য এই কাজের উন্মাদনাকেও সমালোচনা করতে ছাড়ে না। এখানে মনে রাখা প্রয়োজন যে ইতালির জনসাধারণ বহু বছর ধরে শৃঙ্খলার ধার ধারতো না। কর্মক্ষেত্র আর সরকারের কাজের সমালোচনা করাটাই ছিল তাদের প্রধান কাজ। ওরা অনেকে ভাবতো পুরনো সেই অলস দিনগুলোই আবার ফিরে আসবে। ওরা এগিয়ে যাওয়া শৃঙ্খলাবদ্ধ পৃথিবীর কোন খোঁজখবরই রাখতো না। বর্তমানে সরকার কিন্তু বিমূর্ত নয়; সব জায়গাতেই সরকারের অস্তিত্ব রয়েছে। হ্যাঁ, প্রতিদিন এবং প্রতিটি ক্ষেত্রে। কাজকর্মে। সরকারী আওতায় বা আওতার বাইরে থাকা প্রতিটি ইতালির নাগরিক প্রত্যেক ক্ষেত্রে সরকারী আইন কানুনের উপস্থিতি রীতিমতো উপলব্ধী করতো। জনকল্যাণ ব্যাপারটা কিন্তু ছোট্ট গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; ব্যাপক এই কর্মযজ্ঞ দীর্ঘসূত্রতা কাটিয়ে যৌবনের ধর্মে সচল এবং অগ্রসরতা পায়।

রাজধানীর প্রতি আমার সবিশেষ মনযোগ ছিল; কারণ রোম হলো সার্বজনীন শহর।

শুধু ইতালিয়ানদের প্রিয়তম নয়, সারা পৃথিবীর লোক-ই শহর রোমকে ভালোবাসে। সেই প্রায় ভুলে যাওয়া অতীতের রোমান সাম্রাজ্য থেকে সারা পৃথিবীর বুকে যে সভ্যতা সংস্কৃতির আলোর বিচ্ছুরণ ঘটেছিল, লোকে আজও তা' স্মরণে রেখেছে। রোম শুধু ঐতিহাসিক শহর নয়, এই শহর থেকেই ক্রিশ্চিয়ানিটি সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়েছিল। ইতিহাসের সূক্ষ্ম প্রভা এখান থেকে মানুষের চোখ ধাঁধিয়ে দিয়েছিল। আইন কানুন এবং সভ্যতার পাঠ সারা পৃথিবীর মানুষ এখান থেকেই নিয়েছে। সুতরাং শহরটার সৌন্দর্য, রাজনৈতিক শৃঙ্খলাবোধ এবং সুশৃঙ্খল করা ছাড়া আমার সামনে অন্য কোন পথ-ই আর খোলা নেই। প্রাকৃতিক বন্দর ওসটিয়া এবং নতুন নতুন রাস্তা গড়ে তাই এই শহর রোমকে ইউরোপের মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর এবং শৃঙ্খলাবদ্ধ শহর হিসেবে গড়ে তুলি। প্রাচীন রোমের স্মৃতিস্তম্ভগুলাকে একপাশে আলাদা ভাবে সরিয়ে রেখে অতীত রোমানদের সঙ্গে বর্তমানের ইতালিয়ানদের সুন্দর একটা সুসম্পর্ক গড়ে তুলি। বিপ্লব এবং নতুন করে গড়ে তোলা রোম শহরের সঙ্গে ইতালির অন্যান্য শহরগুলোর কোন তুলনাই চলে না। ইতালির প্রতিটি শহর প্রাচীন বৈশিষ্ট্যের দাবী রাখে। বিশেষ করে পেরুজিয়া, মিলান, নেপেলস্, ফ্লোরেন্স, পালারমো, বোলোনিয়া, তুরিন, জেনোয়া ইত্যাদি শহরগুলোর ঐতিহাসিক মূল্যবোধ রীতিমতো সম্মানের ব্যাপার। তবে এই শহরগুলোর কোনটাই শহর রোম এবং তার অতীত গৌরবের ধারে কাছে ঘেঁষে না।

কিছু লেখক কিন্তু বারে বারে একটা প্রশ্ন তুলে ধরেছে যে ১৯২২ সালের অক্টোবর মাসের বিপ্লবে জয়ী হওয়ার পর কেন ন্যাশানাল ফ্যাসিষ্ট পার্টি দল ভেঙে দিল না?

এই প্রশ্নটার উত্তর দিতে হলে কয়েকটা জরুরী বিষয় অনুধাবন করার প্রয়োজন। ইতিহাস আমাদের শিক্ষা দিয়েছে যে কোন বিপ্লবাত্মক আন্দোলনকে আইনের পথে চালিত করতে গেলে অনেক সময় শক্তি প্রয়োগের প্রয়োজন হয়ে পড়ে। এমনকি প্রয়োজনে সেই আন্দোলনের ব্যক্তি বিশেষের ওপরেও সেই শক্তির প্রয়োগ করতে হয়। কারণ প্রতিটি আন্দোলনের একটা অদেখা এবং জটিল দিক থাকে। কোন কোন ঐতিহাসিক মুহূর্তে গতকালের স্বার্থ ত্যাগী বীরদের আগামীকালের জন্য আত্মোৎসর্গের নিতান্ত প্রয়োজন হয়ে পড়ে। তবে আমি কিন্তু কারো আত্মোৎসর্গ চাই নি। তাই আমি সর্বদা চেষ্টা করেছি যে তারা যেন ব্যক্তিগত স্বার্থের ব্যাপারে নিজেদের জড়িয়ে না ফেলে। চাপের মুখে সেই পথ থেকে ব্যক্তি বিশেষকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে ফিরিয়ে আনার ব্যাপারটাতেই তাই আমি বিশেষ করে জোর দিয়েছি।

তবে প্রয়োজনে কিন্তু আমি যে কোন ব্যবস্থা কঠোর হাতে তুলে নিয়েছি। সত্যি বলতে কি সব সময় একটা কথা মনে রেখেছি যে যখন একটা দল জাতির ভার কাঁধে তুলে নিয়েছে, তাকে নিপুণহাতে সার্জারী বা প্রয়োজনে বড় ধরনের অপারেসন করতে শেখাটাও জরুরী হয়ে পড়ে। বিশেষ করে কাউকে সমাজ থেকে অপসারণের ব্যাপারে। কারণ পার্টিটার সৃষ্টি থেকে সবকিছু আমার নিজের হাতে গড়া। অনেক সময় ব্যক্তিগত স্বার্থ চরিতার্থ করতে উন্মুখ মানুষকে তাই সমাজ থেকে অনুসরণ করাটা কর্তব্যের খাতিরে নিতান্ত প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে।

আমার এই সর্বেসর্বা নেতৃত্ব কিন্তু পার্টিকে শুধু ধরে রাখে নি, এগিয়ে যেতেও প্রভূত সাহায্য করেছে। তবে পার্টি ভেঙে না দেওয়ার পেছনে অন্য কারণও ছিল। প্রথমত, আবেগ ব্যাপারটা আমার আত্মার ওপরেও সুগভীর ভাবে ছাপ মেরে দিয়েছিল। তারও পরে ছিল জাতির প্রতি কৃতজ্ঞতাবোধ।

ফ্যাসিষ্ট পার্টি গড়ার সময় বিশেষ করে যুবকের দল অন্ধভাবে আবেগ তাড়িত হয়ে আমার পেছনে অনুসরণ করেছে। তারা ইউনির্ভাইসিটি, চাকরী বাকরী, কারখানার কাজকর্ম ইত্যাদি ছেড়ে দিয়েছে। যে কোন বিপদের মুখোমুখি হ'তে এতোটুকুও ইতস্তত করে নি। তারা জানতো যে এই কাজে নামার অর্থ হলো শুধু নিজেদের জীবনের ঝুঁকি নেওয়া নয়, আগামী দিনের সৌভাগ্যকেও অনিশ্চয়তার কাছে বন্ধক দেওয়া। এইসব মিলিশিয়া মানুষগুলোর কাছে আমার দায়বদ্ধতার ব্যাপারটা অস্বীকার করি কি করে। তাই দল ভেঙে দিলে যারা সংগ্রাম করেছে তাদের প্রতি সেটা অশেষ অকৃতজ্ঞতা হয়ে দাঁড়াতো।

সবশেষে সবচেয়ে জোরালো যুক্তি দেখানোটাই বোধহয় ঠিক। আমি মনে করি ইতালির নতুন শাসন ব্যবস্থা-ই হলো ফ্যাসিবাদের মূল আদর্শ এবং কর্তব্য। এর দ্বারা সাধারণ মানুষের পরিশ্রম করার ইচ্ছা এবং ক্ষমতা দুটোই বৃদ্ধি পাবে। হ্যাঁ, অভিজ্ঞতার আলোয় সঠিক লোক নির্বাচনও করা যাবে। আর জোর করে চালিয়ে দেওয়া, সামরিক নেতৃত্বের হাত থেকে দূরে থাকা সম্ভব হবে। পার্টির দিক থেকে আমাকে যেমন ঠিক লোককে বেছে নেওয়ার দায়িত্ব দিয়েছিল, তেমনি সরকারও নতুন প্রশাসকদের বেছে নিতে পেরেছিল। ওরা যেমন হিংস্রতার আশ্রয় নিতে অস্বীকার করেছিল, তেমনি গর্বোদ্ধত রাজনৈতিক ছদ্মবেশের আড়ালে যেতেও রাজী হয় নি। অনেক ঘটনার চুলচেরা বিচার করে বুঝি যে নতুন এবং পুরনো জগতের সঙ্গে মেল বন্ধন কিছুতেই সম্ভব নয়। সুতরাং ভবিষ্যতের জন্য কিছু তৈরি মানুষের সঞ্চয় করে রাখতেই হয় আমাকে। তাই শাসক দলের প্রধান, দলীয়পতি হতেও আপত্তি নেই। পৃথিবীর অন্যান্য দেশেও তো সরকারের মুখপাত্র তার ইচ্ছা অনুসারেই দেশকে শাসন করে।

ইতিমধ্যে ১৯২২ সালের ডিসেম্বর মাসে জনসাধারণের প্রতি কর্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে ফ্যাসিষ্টদের উদ্দেশ্যে একটা বিজ্ঞপ্তি জারী করা হয়। নিম্নলিখিত বিজ্ঞপ্তিটা হলো ঃ

প্রতিটি ফ্যাসিষ্ট তাদের আদেশের স্থানীয় অভিভাবক। প্রতিটি দাঙ্গা বা অশান্তিকারী হলো দেশের শত্রু। হ্যাঁ, তার পকেটে ফ্যাসিবাদের পরিচিতি পত্র থাকলেও।

এই ক'টা কথাতেই বোধহয় ফ্যাসিবাদকে এবং ফ্যাসিষ্টদের কাজকর্মকে বোঝা যাবে।

১৯২২ সালে আমাদের চলার পথে গর্ত এবং ফাঁদ কম পাতা ছিল না। জীবনের চরম মুহূর্তে ফ্যাসিষ্টরা কিন্তু নিজেদের স্বার্থের কথা ভুলে গিয়ে দেশের স্বার্থটাকেই বড় করে দেখেছে। যুদ্ধ ছাড়া বিপ্লব সাধারণত রক্তক্ষয়ী এবং দীর্ঘস্থায়ী হয় থাকে। হিংসার ব্যাপারটা আমার ইচ্ছেতেই দমন করা হয়েছিল।

প্রথম থেকেই বিরোধী কিছু সংবাদপত্র অদ্ভুত ধরনের ব্যবহার করতে শুরু করে দিয়েছিল। লিবারেল ডেমোক্র্যাটিক দলের মুখপাত্র কোরিয়ারে ডেলা সেরা স্যোশ্যালিষ্ট পত্রিকা আবন্তির লেখায় ফ্যাসিবাদের প্রতি তীক্ষ্ণ কর্কশ সমালোচনাই প্রকাশ পেতো। ওরা

লেখার মাধ্যমে সব সময় প্রকাশ করতো যে ফ্যাসিবাদের এই পরীক্ষা নিরীক্ষা অতি অল্পদিনের মধ্যেই শেষ হয়ে যাবে। হয় সংসদের শক্ত পাথরে ধাক্কা খেয়ে, নয়তো বা ইতালির জটিল জীবনের ঘূর্ণিপাকে পড়ে। আমরা কিন্তু তথাকথিত এই মহাপুরুষের করুণ পরিণতির প্রত্যক্ষদর্শী। তবে ফ্যাসিষ্ট দলের ফলপ্রসূ পরিণতিতে পৌঁছনোর জন্য প্রথম বারে দলের প্রতি আমাকে তীক্ষ্ণ নজর রাখতে হয়েছে। যাতে দলটার অবস্থা সঠিকভাবে থাকে, হ্যাঁ, এইসব তর্জন গর্জন, সমালোচনা ইত্যাদির ঊর্ধে উঠে গিয়ে।

পার্টি তখন একটা চরম বিপদের মুখোমুখি হয়ে পড়েছে। বন্যার স্রোতের মতো নতুন সদস্যর দল তখন পার্টিতে ভিড়তে শুরু করেছে। একমুঠো লোক নিয়ে যুদ্ধ-পদক্ষেপে যে দলের যাত্রা শুরু হয়েছিল, বর্তমানে নতুন সদস্য পদ ভর্তির বন্যায় দরজায় তালা মেরে দিতে হয়। ফ্যাসিবাদ পায়ের তলায় শক্ত জমি খুঁজে পেতেই পুরনো পৃথিবীটা যেন দরজায় এসে আঘাত করতে আরম্ভ করে। সেই বন্যার জলে ভেসে আসে পুরাতন মানসিকতা, স্বার্থপরতা এবং নোংরামী। যাতে পার্টির যে শিক্ষার মাধ্যমে বেড়ে ওঠার প্রচেষ্টা—সেটাকে যেন পথ রোধ করে দাঁড়ায়। সেই সময় দরজায় তালা না ঝোলালে পার্টির নিজস্ব সত্বটাই যে হারিয়ে যাবে। ইতালির নবজাগরণের স্রোতে যাতে কিছুতেই ভাঁটা না পরে সেই কারণে সেইদিকে তীক্ষ্ণ নজর রাখার প্রয়োজন হয়ে পড়ে।

১৯২৬ সালের কাছাকাছি আমার সমস্ত শক্তি, সতর্কতা ইত্যাদি দিয়ে যুবকদের শিক্ষিত করার কাজে নিয়োজিত করি। আভান গুরুদিয়ার সৃষ্টি করি। হ্যাঁ, অপেরা ন্যাশানালে বালিলার সঙ্গে মিলে মিশে। যে প্রতিষ্ঠানটা ছেলেমেয়েদের মেধা এবং শিক্ষাগত গুণে একটা মর্যাদাপূর্ণ জায়গায় এসে দাঁড়ায়। যারজন্য বর্তমানেও আমি এই প্রতিষ্ঠানটাকে ফ্যাসিষ্ট রাজত্বের একটা অমূল্য ছাত্র গড়ার কারিগর হিসেবে মনে করি।

এই সফল পরিকল্পনা কিন্তু অতুলনীয় ফলাফল দেয়। তারজন্য-ই পার্টিকে কখনো তেমন কোন ভারী বিপদের মুখোমুখি হতে হয় নি। আমার ব্যক্তিগতভাবে মনে হয় যে আমার ভেতরে একটা গুণ বরাবরই ছিল, তা'হলো সঠিক মুহূর্তে ঠিক জায়গা মতো আঘাত করা। হ্যাঁ, আবেগের দুর্বলতাকে সময় মতো ঝেড়ে ফেলে দিয়ে। সেখানে দুর্বলতাকে প্রশ্রয় দেওয়ার অর্থ-ই হলো লুকনো ফাঁদে পড়া।

দলীয় সংরক্ষণের প্রতি নজর রাখার কাজে আমি সব সময় পার্টির সেক্রেটারীদের আমার পাশে পেয়েছি। অন্তত এই ব্যাপারে তাদের সাহায্যের শেষ ছিল না। মিচেলে বিয়ানচি রোম দখলের আগে পর্যন্ত পার্টিকে নেতৃত্ব দিয়ে এসেছে। বিশেষ করে আন্দোলনের হিংসাগর্ভ দিকটাকে সামলে নিয়ে আন্দোলনকে রাজনৈতিক মুখী করে তুলতে ওর জোড়া মেলা ভার ছিল। কারণ যে কোন আন্দোলন বাস্তবতার প্রেক্ষাপটে প্রজ্ঞার সঙ্গে শেষ হওয়াটাই বুদ্ধিসত্তার লক্ষ্মণ। রাজনৈতিক বিচক্ষণ সেক্রেটারী হিসেবে মিচেলে বিয়ানচির তুলনা ছিল না এবং আজকেও সে সরকারের হয়ে অন্তর্দেশীয় রাজনৈতিক দিকটার ওপরে সদা সর্বদা নজর রেখে চলেছে। ওর মানসিক গড়ন যেমন রাজনৈতিক, তেমনি যে কোন ঘটনা মনে মনে তাৎক্ষণিক বিশ্লেষণ করার ক্ষমতাও অদ্ভুত। তারওপরে প্রতি মুহূর্তে বিশ্বস্ত এই মানুষটাকে ফ্যাসিষ্ট সরকার সব সময় পাশে পেয়েছে।

বিগত যুদ্ধের সাহসী যোদ্ধা সম্মানীয় সানসানেলী হলো আজকের যুদ্ধ ফেরত অবসরপ্রাপ্তদের আন্তর্জাতিক সংস্থার প্রেসিডেন্ট। মাননীয় সানসানেলী সমাজের কপট আন্দোলনগুলোর মুখোমুখি হতে কখনো ভয় পেতো না, আর ফ্যাসিষ্টদের আসার আগে রাজনৈতিক দলগুলো এই কপট আন্দোলনের মাধ্যমে-ই গদীতে চড়ে বসতো।

সেই সময় জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে একটা ফ্যাসিবাদ বিরোধীতা ফল্গুস্রোতের মতো কাজ করে চলতো। পুরনো উদারপন্থী পৃথিবীটা পরাজিত হলেও তৎকালীন শাসকবর্গ সেটাকে মানিয়ে টানিয়ে নিয়ে চলতো। কারণ ইতালির সমাজ-ব্যবস্থাকে নতুন দিশা দেখানোর ক্ষমতা তাদের ছিল না। বরং নিজেরাই দুর্নীতির পাঁকে ধীরে ধীরে ডুবছিল। এইসব শক্তির সমাজ ব্যবস্থার প্রতি চরম অবহেলার দরুণ কম্যুনিষ্টরা চোরাগুপ্তা আক্রমণ শানিয়ে মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছিল। নির্বাচনের পরে ১৯২৪ সালের সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত একটা নতুন ধরনের একনায়কতান্ত্রিক মতবাদ মাননীয় গুয়াস্তোর সভাপতিত্বে রূপ নিচ্ছিলো। আমি কিন্তু তার আগেই গুয়াস্তোর সঙ্গে ফ্যাসিবাদ নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা করেছিলাম। সেই বছরের দ্বিতীয়ার্ধে সমাজের প্রায় সব স্তরেই ফ্যাসিবাদ বিরোধীতা শুরু হয়ে যায়। ১৯২৫ সালের ৩রা জানুয়ারী আমার বক্তৃতা সেই ফ্যাসিবাদ বিরোধীতার নাকে ঝামা ঘষে দেয়। যাইহোক ব্যাপারটা পুরো বুঝতে পেরে আমি কঠোরভাবে আপোষহীন মনোভাব গ্রহণ করি। আর সেই কারণে আমার কর্তব্যটাকে মনে রেখে ১৯২৫ সালের ১২ই ফেব্রুয়ারী শ্রদ্ধেয় বরার্তো ফারিনাচিকে দলের সম্পাদক পদে বসাই।

ফারিনাচির ওপরে যে দায়িত্ব আমি তুলে দিয়েছিলাম, তাই কি করে সম্পন্ন করতে হয় সেটাও ভালোভাবেই জানতো। যে কোন ভালো কর্মসচিব বা সম্পাদকের মতো। আভান্তিনিজিমোর ক্ষতিকারক তলানীগুলো যা দেশের এখানে ওখানে ছড়িয়ে ছিল ফারিনাচি রাজনৈতিকভাবে শুধু নয়, নৈতিকতার দ্বারাও সেগুলোকে ছেঁকে ফেলে দেওয়ার ব্যবস্থা করে। পার্টির মধ্যে নৈতিকতার আদর্শবাদ নিয়ে আসে। পর পর চারবার আততায়ীর আক্রমণের হাত থেকে বাঁচার পর যে আইন আমি জারী করেছিলাম, কঠোর হাতে সেই আইন প্রয়োজনের ব্যবস্থাও করেছিল ফারিনাচি। বিশেষ করে যারা ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে অপরাধমূলক ষড়যন্ত্রের অংশীদার ছিল। পার্টির ষড়যন্ত্রকারীদের এই দমনমূলক ব্যবস্থার গুণে বলাবাহুল্য আমি প্রতিটি স্তরে নজর রাখতাম। প্রয়োজনে একটু আধটু শুধরেও দিতাম। মাননীয় ফারনাচি ইতালির ফ্যাসিবাদের একজন অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা এবং ১৯১৪ সাল থেকে আমার বিশ্বস্ত অনুসরণকারী।

ওর ওপরে প্রদত্ত দায়িত্ব শেষ করে সম্পাদকের পদ ছেড়ে দেয় ফারিনাচি। কাঁধে তুলে নেয় দায়িত্বের এই জোয়ালটা আগুস্টো তুরাতির। শ্রদ্ধেয় তুরাতি মহা যুদ্ধ-ফেরত অভিজ্ঞ যোদ্ধা; পরিষ্কার মন, মার্জিত আভিজাত্যপূর্ণ মেজাজ। দলকে একটা নতুন পথের দিশারী করে তোলে। বিশেষ করে ফ্যাসিষ্ট জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষার ব্যাপারটা ছড়িয়ে দেয়। আজকের এই দায়িত্বপূর্ণ মানুষগুলো ছাড়াও মাননীয় রেনেতো রিচি বালিলা প্রতিষ্ঠানটাকে গড়ে তোলে। মিলিশিয়া নামে যে প্রতিষ্ঠানটা তার কর্তব্য কাজ করে চলেছে। তা ছাড়া প্রশাসনের সাহসী কর্মসচিব মারিনেলি, ষ্টারেস এবং আরপিনাটি বিশ্বস্ত এই কালো সার্টের

দল ১৯১৯ সালের মার্চ মাস থেকে দলের প্রতি তাদের অটুট বিশ্বাস বজায় রেখে চলেছে এবং ওরা বোলোনিয়া ফ্যাসিস্ট পার্টির প্রতিষ্ঠাতাও বটে।

পার্টি আমাকে ফ্যাসিস্ট ইতালির সর্বোচ্চ পদে বসিয়েছে।

শ্রমিকতন্ত্রবাদ প্রতিষ্ঠানের অনেক ব্যক্তি এবং ডেপুটিদের মন্ত্রীত্বে বসিয়েছি। ধীরে ধীরে তারাই সরকার পরিচালনার ভার নিজেদের হাতে তুলে নেবে। সরকারের সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ পদেই ফ্যাসিবাদে বিশ্বাসীদের বসানো হয়েছে। তাই শাসন ক্ষমতা দখলের চার বছর পরে নিঃসংকোচে বলতে পারি যে ফ্যাসিবাদের হাতে সমস্ত ক্ষমতা তুলে দেওয়া হয়েছে। হ্যাঁ, এই উপলক্ষে ১৯২৫ সালের জুন মাসে রোমে সম্মেলন ডাকা হয়েছিল।

আমার অসহিষ্ণুতাকে আমি সীমাবদ্ধ রেখেছি। অন্ধকারের মাঝে ঝাঁপ দেওয়ার থেকে বিরত থেকেছি। নিজের মতো কোন ব্যাপারের উপসংহারও টানি নি। আজকের চাহিদার সঙ্গে ভবিষ্যতের প্রয়োজনকে মিলিয়েছি। স্বভাবতই রাষ্ট্রকে ফ্যাসিবাদের চারিত্রিক গঠনে ঢেলে সাজাতে চেষ্টা করেছি; ব্ল্যাক সার্টের দল জাতির শিরায়-উপশিরায় নতুন শক্তি এবং সাহসের বন্যা বইয়ে দিয়েছে। আমি পার্টিকে সরকার থেকে কখনো বিচ্ছিন্ন করতে চাই নি, বরং ন্যাশানাল ফ্যাসিস্ট পার্টি সরকারের একটা শক্তি হিসেবেই কাজ করেছে। রাজনৈতিক একটা প্রতিষ্ঠানকে সরকারের চিরস্থায়ী অংশ করে গড়ে তোলায় সেই সরকারের ভিত্তিভূমি-ই মজবুত হয়েছে। গ্র্যান্ড ফ্যাসিস্ট কাউন্সিল হয়েছে সরকারের সাংবিধানিক অংশবিশেষ। এইভাবে ফ্যাসিস্ট পার্টি স্বাধীন থেকেও নতুন ফ্যাসিস্ট রাষ্ট্রকে ইস্পাত-সূতোয় জড়িয়ে রেখেছে।

বিশেষ একটা চিন্তাধারা বিদেশী এবং ইতালিয়ানদের কাছে কৌতূহলোদ্দীপক হলেও ব্যাপারটা বোঝাপড়ায় সব সময় একটা ভুল থেকে গেছে। তা'হলো রাষ্ট্র এবং চার্চের মধ্যের সম্পর্কটাকে ঘিরে। ১৮৭০ সালের ল'অফ গ্যারান্টি দ্বারা মনে হয়েছিল ব্যাপারটার নিষ্পত্তি ঘটেছে। আর ফ্যাসিবাদের সঙ্গে এই নিয়ে কোন সংঘর্ষত হয় নি চার্চের। বরং চার্চের সঙ্গে বরাবর একটা বোঝাপড়ার সম্পর্ক বজায় ছিল।

আর এই সম্পর্কটাই হলো ফ্যাসিস্ট সরকারের প্রতি চার্চের শ্রদ্ধা বিশেষ। অতীতে পাতিজানদের প্রতি ঘৃণার একটা চাদর ইচ্ছে করেই ছুঁড়ে দেওয়া হয়েছিল। চার্চের বিরুদ্ধে অপপ্রচারও কম চলে নি। বিশেষ করে তথাকথিত মুক্ত-চিন্তা নামক দলের তরফ থেকে। এই মুক্ত-চিন্তা দলের শাসক গোষ্ঠীর ওপরে প্রভাবও কিছু কম ছিল না।

ধর্মটা হলো ব্যক্তিগত ব্যাপার—এই চিন্তা ধারণায় ছেদ পড়ে। স্বীকার করা হয় ধর্ম জনসাধারণের কোন অবশ্য কৃতকর্মের মধ্যে পড়ে না।

যদি ধরে নেওয়া হয় যে চার্চের প্রতি অনীহা ব্যাপারটা ছিল ওপর ওপরের, তবু সামাজিক ব্যবস্থার ক্ষেত্রে বিরোধীদের যে চার্চের প্রতি উত্তেজনা মেশানো ক্রোধ দিনের পর দিন বেড়ে চলছিল তা'তে সন্দেহ নেই। চার্চ বিরোধিতার ব্যাপারটা এমন একটা জায়গায় গিয়ে পৌছেছিল যে ক্যাথলিক ধর্মীয় প্রতীককে নিষিদ্ধ করে দিয়ে স্কুলে পাঠ্য বইয়ের যে অংশে খৃষ্টান ধর্ম সম্পর্কে শিক্ষা দেওয়া হতো, সেই অংশকেও সম্পূর্ণরূপে বর্জন করা হয়। সোশ্যলিষ্টদের দ্বারাই দিকটাকে পরিষ্কার এবং স্বচ্ছভাবে তুলে ধরার প্রয়োজনও

ছিল। আমরা চার্চের রাজনৈতিক এবং ধর্মীয় দিক দুটোকে আলাদাভাবে জনসাধারণের সামনে তুলে ধরি।

ইতালিতে সমগ্র ব্যাপারটা এমন একটা জায়গায় গিয়ে দাঁড়ায় যে ১৮৭০ থেকে ১৯০০ সাল পর্যন্ত জনপ্রিয় দলগুলোর জনপ্রিয়তা ধীরে ধীরে কমতে থাকে। ১৯২৫ সালে চার্চ বলশেভিজিমে পরিণত হয়, যা আমি পরবর্তী কালে মুছে দেই এবং রাজনৈতিক আর বুদ্ধিমত্তার দিক থেকে দলগুলো দেউলিয়া হয়ে পড়ে।

এইসব ব্যবস্থা গ্রহণের ফলে ঘুলিয়ে ওটা ভুল বোঝাবুঝির আবহাওয়াটাকে ফ্যাসিবাদ আয়ত্তের মধ্যে নিয়ে আসে। চার্চ আর রাষ্ট্রের মধ্যেই এই টানা পোড়ানির সম্পর্কটার গভীরতাকে কখনোই আমি এড়িয়ে যাই নি। বোকার মতো ভাবি নি যে আমার পক্ষে এমন দাওয়াই খুঁজে বার করা সম্ভব যাতে এই আদর্শগত সর্বোচ্চ পর্যায়ের ভুল বোঝাবুঝি সহজেই প্রশমিত হতে পারে। তবে গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করেছি এই সমস্যাটাকে, যাতে মানুষ আবার তাদের ধর্মীয় বিশ্বাস অনুশাসনে ফিরে যেতে পারে। রাজনৈতিক মত পার্থক্য থেকে ধর্মীয় দিকটাকে সম্পূর্ণ আলাদা করে দিয়েছিলাম। আসলে তখন মানুষের মধ্যে নৈতিকতা এবং নাগরিক বোধ ফিরে আসাতে ধীরে ধীরে জাতির আত্মোন্নতি হতেও শুরু করেছে।

একথা অস্বীকার করে লাভ নেই যে ভ্যাটিকানের উচ্চপদস্থ যাজকবৃন্দ আমার কাজ সম্পর্কে প্রশংসা করা দূরে থাক, নীরব-ই থেকেছে। হয়তো বা রাজনৈতিক কারণে। আর সবচেয়ে বড় কথা আমার অন্তত এই বিষয়ে এগিয়ে যাওয়ার পথে একটা ধাপ পার হতেও সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয় নি। অবশ্য তা করলে ভ্যাটিকানের বিজ্ঞতার-ই পরিচায়ক হ'তো সেটা। আমার কাজ কিন্তু সহজ সাধ্য ছিল না। বরং যথেষ্ট পরিশ্রম করতে হয়েছে আমাকে। কারণ এতোদিনের বিরোধী পক্ষ চার্চের বিরুদ্ধে যে ধর্মীয় বিরোধীতার জাল বুনেছিল, তা মানুষের বর্তমান চিন্তাজগৎ, পুস্তক প্রকাশ-ঘর, শিক্ষা ব্যবস্থা, বিচার বিভাগ এমন কি সৈন্য বাহিনীর কিছু অংশেও তা ছড়িয়ে পড়েছিল।

ব্যাপার যে কতোদূর গড়িয়েছে তা বোঝাতে একটা উদাহরণ-ই যথেষ্ট। ফ্যাসিষ্ট বিপ্লবের ঠিক অব্যাহিত পরে ১৯২২ সালের ১৬ই নভেম্বর সংসদে যখন আমি আমার প্রথম বক্তব্য রাখি, সেই বক্তব্যের শেষে বলি যে এই সুকঠিন দায়িত্ব পালনে ঈশ্বরের সাহায্য আমি প্রার্থনা করছি। তবে স্বীকার করে নেওয়া ভালো যে বাক্যটা কিন্তু ঠিক জায়গা মতো প্রয়োগ করা হয়নি। ইতালির সংসদে ঈশ্বরের নাম উচ্চারণ বহুদিন থেকেই নিষিদ্ধ ছিল। এমন কি জনপ্রিয় ক্যাথলিক পার্টিও ঈশ্বরের নাম উচ্চারণের ব্যাপারটা ভাবনা চিন্তাতেও আনতো না। ইতালিতে কোন রাজনৈতিক মানুষের চিন্তার জগতে ঈশ্বরের স্থান ছিল না। অবশ্য মনে মনে ভাবলেও কাপুরুষতার জন্য মুখে প্রকাশ করতে ভয় পেতো। বিশেষ করে আইন সভাতে। কিন্তু আমি বুক ঠুকে আবার ব্যাপারটার শুরু করি। বিশেষ করে মনে রাখা প্রয়োজন তখনো বিপ্লবের পূর্ণ রেশ আকাশে বাতাসে ছড়ানো রয়েছে। নইলে সত্যটা কি? এটা হলো বিশ্বাস যা খোলাখুলি স্বীকার করে নিলে আত্মশক্তি বাড়ে।

চোখের ওপরে দেখতে পাই যে ধর্মীয় শক্তি আবার জাগতে শুরু করেছে। গীর্জায় গীর্জায় লোক জমছে; পাদ্রীরা নতুন করে সম্মান পাচ্ছে। ফ্যাসিবাদ তার কর্তব্য কর্ম করেছে এবং করছে।

তবে কিছু যাজকীয় বৃত্ত কিন্তু ব্যাপারটাতে গুরুত্ব দেয় নি। আসলে তারা রাজনৈতিক এবং নৈতিক ইতালির এই নবজাগরণকে বুঝতেই পারেনি।

ফ্যাসিষ্ট শাসনের প্রথম পর্বে-ই তার কিছু লক্ষ্মণ ফুটে ওঠে। প্রথমদিকে ক্যাথলিক পার্টি সরকারের সহযোগীতা চায়, যাতে ওদের দলের কয়েকজন সদস্য নতুন সরকারে আসতে পারে। কিন্তু এই সহযোগীতা প্রচুর ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি করলে মাস ছ'য়েক পরে সেই দলের মন্ত্রীদের দরজা দেখিয়ে দিতে একরকম বাধ্য হই।

আমি জনপ্রিয় পার্টিগুলোর শাসনের সময়ও লক্ষ্য করেছি যে রাষ্ট্র এবং গীর্জার মধ্যে সম্পর্কের টানা পোড়ানিটা রীতিমতো আন্তর্জাতিক রাজনীতির ওপরে ছায়া ফেলতো। সম্ভবত দু' ধরনের ভিন্ন মানসিকতার দুই পৃথিবী একে অপরকে বোঝার চেষ্টা করা দূরে থাক, শতাব্দীব্যাপি আলাদা প্রেক্ষাপটে বেড়ে ওঠা পরস্পর পরস্পরকে কখনোই বুঝে উঠতে চেষ্টা করি নি। কারণ একজনে ধর্মীয় জগৎ থেকে শক্তি আহরণের চেষ্টা করেছে, অপরে পৃথিবীর মানুষের সাম্যের মাধ্যমে মুক্তি খুঁজেছে।

বর্তমানে অত্যন্ত বিশ্বস্ততার সঙ্গে ফ্যাসিবাদ চার্চের শক্তির উৎসের দিকটাকে বুঝতে চেষ্টা করেছে। আর প্রতিটি ক্যাথলিক নাগরিকেরই কিন্তু একটাই কর্তব্য। তাই ফ্যাসিবাদ ধর্মীয় দিকটাকে অক্ষয় অমর বলেই ভেবে এসেছে। চার্চ যতো ভুল-ই করে থাক না কেন, তার আন্তর্জাতিক চরিত্রটা কোনরকমেই ছিনিয়ে নেওয়া উচিত নয়। তবে চার্চের চারিত্রিক কয়েকটা দিক সম্পর্কে মানুষের অসন্তোষ থাকতেই পারে, যা ইউরোপের মধ্যবিত্ত সমাজে রাজনৈতিক ভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে দেওয়া হয়েছে। যাইহোক ইতালিতে বিশ্বাসের গোড়াটা মজবুত হয়েছে। ফ্যাসিবাদ ইতালির ধর্মীয় জগতে নতুন করে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করতে সমর্থ হয়েছে। তবে তা' কিন্তু রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব এবং শাসন ব্যবস্থার অঙ্গ নয়।

।। চরৈবেতি চরৈবেতি।।

কিছু সংখ্যক পাঠক-পাঠিকা হয় তো এই জীবনরেখার মধ্যে আমার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য খুঁজে পেলেও পেতে পারে। তবে তারা যদি মনে করে যে জীবন রেখার যবনিকাপাত এখানেই ঘটে গেছে, তবে সেটা কিন্তু চরম ভুল হবে। কারণ পঁয়তাল্লিশ বছর বয়েসে জীবন যুদ্ধ কখনোই শেষ হ'তে পারে না।

বিস্তারিত স্মৃতিকথা সাধারণত লোকে বৃদ্ধ বয়েসে-ই লেখে, যখন জীবনটা ঠেলতে ঠেলতে ঘরের এক কোণে এসে হাজির হয়। এই ধরনের স্মৃতি কথা লেখার স্পৃহা আমার নেই। কারণ তা'হলো চেতনার মাধ্যমে জীবনের বৃত্তচক্রে ঘোরা। এবং সেই বৃত্তচক্রে এমন মানুষের ঠাঁই নেই যে আমার মতো আবেগের সঙ্গে তার কর্মগুলোকে ঘিরে থাকে।

বিপ্লবের নায়ক এবং সরকারী শাসন ব্যবস্থার চূড়োয় যখন আমি আরোহন করেছিলাম, তখন আমার বয়েস ছিল ঊনচল্লিশ বছর। আমার কর্মের জগত শেষ হওয়া দূরে থাক, অনেক সময় মনে হতো কাজ-ই শুরু করি নি।

জীবনের কাজের ফলপ্রসূতা মাত্র আসতে শুরু করেছে; এই মুহূর্তে আমি সেদিকেই এগিয়ে চলেছি। তবে ফ্যাসিবাদকে যে শক্ত ভিতের ওপরে দাঁড় করাতে পেরেছি—সেটা ভেবে নিশ্চয়ই আমি গর্ব অনুভব করি। অনেকেই আমাকে এই প্রশ্ন করে থাকেন যে আমার নীতির ভবিষ্যত কি এবং পথের শেষের কোন্ লক্ষ্যে আমি পৌছতে চাই।

আমার উত্তর হলো, আমি আমার নিজের জন্য জীবনে কিছু-ই চাই নি। পার্থিব কোন বস্তু, সম্মান, মানপত্র, স্বীকৃতি—কিছুই নয়—যা আমাকে ইতিহাসের গর্ভে ঠাঁই দেবে। আমার উদ্দেশ্য হলো সহজ এবং সরল। আমি ইতালিকে শুধু মহান তৈরি করতে চাই না। এমন এক ইতালিকে গড়ে তুলতে চাই, যাকে পৃথিবীর সব জাতি শুধু সম্মান-ই দেখাবে না, ভয়ও পাবে। তার সুপ্রাচীন পরম্পরাকে বৈশিষ্ট্যের যোগ্য করে তুলতে চাই। পরস্পরের সহযোগিতার হাত যাতে আরো সুদূরপ্রসারী হতে পারে। তারজন্য যে সামাজিক বিবর্তনের প্রয়োজন—তা'করতে আমি এতোটুকু দ্বিধা করবো না। সামগ্রিক সমৃদ্ধি এবং উন্নতির জন্য আমি দায়বদ্ধ। আর সেই সমৃদ্ধি, উন্নতিকে ধরে রাখা এবং ত্বরান্বিত করার জন্য-ই রাজনৈতিক একটা দলের প্রয়োজন। নতুন এবং পুনর্জন্ম হওয়া ইতালির মুখোমুখি হওয়ার জন্য আমার এই অক্লান্ত পরিশ্রম। আমার অবিরাম প্রচেষ্টা, শক্তি, উদ্যোগ ইত্যাদির বিনিময়ে ইতালি সমৃদ্ধশালী হয়ে উঠুক। বলাবাহুল্য অন্যান্য মানুষদের অভিজ্ঞতার দিকে আমি পেছন ফিরি নি, তবে চাই ইতালি তার নিজস্ব ক্ষমতা এবং শক্তিতে বলীয়ান হয়ে নিজেদের উন্নতি করুক। আমাদের জাতির ক্ষমতা, ইচ্ছা এবং সম্ভাবনার ব্যাপারটা নিয়ে আমি অনেক ভেবেছি। আমি তাদের জীবনের উন্নতির দিকে সতত চেষ্টা করেছি ঠেলে দিতে। আমি তাদের যেমন একদিকে সম্মান দেই, অপরদিকে পথও দেখাই। গত শতাব্দীতে হারিয়ে যাওয়া ইতিহাসকে ফ্যাসিবাদের দৃঢ় ভিতের ওপরে দাঁড়িয়ে তারা আবার জয় করে নিয়ে আসুক—এটাই আমি কামনা করি। আমাদের সেনাবাহিনী হলো আমার দলের কর্মিবৃন্দ। তাদের শ্রেষ্ঠ স্থান কখনো কেউ ছিনিয়ে নিতে পারবে না। যুবকদের ওপর আমার গভীর বিশ্বাস এবং আস্থা রয়েছে। স্থির প্রতিজ্ঞ হৃদয়ে তারা সঠিক স্থান ঠিক খুঁজে নেবে। যারা দেশকে টেনে নীচে নামিয়েছে, জাতিকে ছুঁড়ে দিয়েছে আর্বজনার মধ্যে, জাতির ঐক্য বিনিষ্ট করেছে—তাদের ক্ষমা করার কোন প্রশ্ন-ই ওঠে না। হাওয়ার স্রোতে যারা ভেসে চলে তারা তো পরাজিতের দল। বাড়ি ধসে গিয়েও যারা বেঁচে আছে, তাদের মতোই একদল বিশ্বাসঘাতক দেশ এবং জাতিকে আর্বজনার মধ্যে দিয়ে টেনে নিয়ে যাচ্ছিলো—এমন কি নীরবতার যে গৌরব আছে, তা' থেকেও ওরা জাতিকে বঞ্চিত করেছে।

আমি আমার প্রতি বিশ্বস্ত অনুগামীদের প্রতি তীক্ষ্ণ নজর রাখি। তারা প্রয়োজনের অতিরিক্ত কিছু করলেই আমি তাদের থামিয়ে দেই। জনতার হৃদয়ের স্পন্দন আমি অনুভব করি। কারণ আমি তাদের অতি নিকটজন। তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে আমি উপলব্ধি করি। একটা জাতির নৈতিক উৎকর্ষতা আমি বুঝি। আমি তার পবিত্রতা এবং গভীরতাকে

প্রমাণিত করে দেবো। তথাকথিত উদারপন্থীরা মুখোস পরে জাতিকে তার সর্বোচ্চ সিংহাসন থেকে টেনে নীচে নামিয়েছে। আদর্শের নামে স্রেফ ধোঁকা দিয়ে। কিন্তু ফ্যাসিবাদের শেকড় রয়েছে বাস্তবের জমিতে।

ইতালির অসীম আকাশে আলো বাতাস খেলা করবে, শৌর্যবীর্য উজ্জ্বল হয়ে উঠবে। সেই আকাশের দিকে দৃষ্টি রেখে জাতিকে তার নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছে দেবে এই ফ্যাসিবাদ। যাতে ইতালি এক নববসন্তের দেখা পায়। এরজন্যই আমার এই প্রাণপাত পরিশ্রম। পঁয়তাল্লিশ বছরের এই জীবনে আমার কাজ এবং চিন্তার প্রতি যথেষ্ট আস্থা রাখি। যে কোন রকমের জেদ থেকে আমি নিজেকে মুক্ত করতে পেরেছি এবং আমার হৃদয়ের প্রতিটি স্পন্দন জাতির সেবায় নিবেদিত। আমি নিজেকে তাদের সেবাদাস বলেই মনে করি। আমি নিশ্চিত যে সমস্ত ইতালির অধিবাসীরা আমাকে বুঝতে পারে এবং ভালোবাসে। আমি জানি যে দুর্বলতাকে ঝেড়ে ফেলে দিয়ে অকুণ্ঠ চিত্তে নিঃস্বার্থভাবে পূর্ণ বিশ্বাসের সঙ্গে এগিয়ে যেতে পারে—তাকেই জাতি আপন করে নেয়।

সুতরাং যে ফ্যাসিবাদ আমি গড়ে তুলেছি, তা' ইতালি জাতির প্রেরণায় সৃষ্টি। নিজস্ব ফসল। যা জাতির ঐতিহাসিক প্রয়োজন যেমন আজ মিটিয়ে চলেছে—ভবিষ্যতেও তাই চলবে এবং বিংশ শতাব্দীর ইতিহাসে তার উজ্জ্বল অনড় স্থান করে নেবে।

———